শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীরানী চন্দ

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

082.8:927

Ab 117 R

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ

রাণী চন্দ

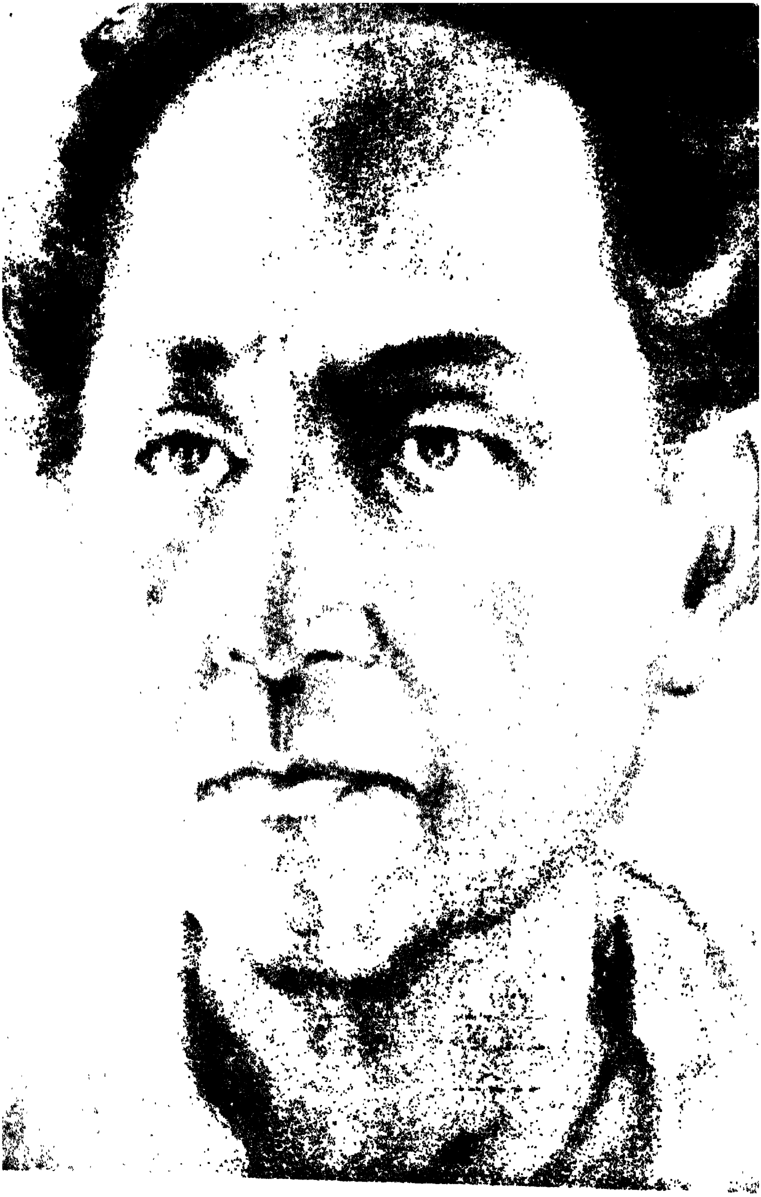

আত্মপ্রতিকৃতি

প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭৯ : ১৮৯৪ শক

© বিশ্বভারতী ১৯৭২

প্রকাশক রণজিৎ রায়
বিশ্বভারতী। ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ১৩

২'১

উৎসর্গ

অভিজিৎ ও শিপ্রাকে

জন্মাষ্টমী

১৩৭৮

অবনীন্দ্রনাথকে খুব ভয় পেতাম আমি। শুধু আমি কেন, সকলেই তাঁকে ভয় পায় দেখতাম।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এ ছবির একজিবিশন, তিন ভাই আসতেন; তিন ভাই— এতেই যেন একটি পূর্ণ জলুস। লম্বা রঙিন জোব্বা গায়ে, আগে আগে আসতেন গগনেন্দ্রনাথ, মাঝখানে সমরেন্দ্রনাথ, পিছনে অবনীন্দ্রনাথ। পর পর চেয়ারে বসতেন— আগে বড়ো ভাই, পরে মেজো ভাই, তার পরে ছোটো ভাই। কখনো দেখি নি গগনেন্দ্রনাথের আগেই অবনীন্দ্রনাথ বসে পড়েছেন কৌচে। এমনিই ছিল তাঁদের রীতি বা শিষ্টাচার।

সেই ছবির একজিবিশনে আসতেন তখনকার দিনের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত যত লোক। দেখতাম সবাই কেমন সন্ত্রস্ত অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। এমন দেখি নি— তাঁরা অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে বসে হাসি গল্প করছেন। প্রণাম নমস্কার সেরে দু-চারটে কথা বলে গগনেন্দ্রনাথের কাছে গিয়েই আলাপ-সালাপ করতেন বেশির ভাগ সকলে।

আমাদের বড়দা তখন কলকাতার আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল, চৌরঙ্গিতে আর্ট স্কুলের বাড়িতেই তাঁর ফ্ল্যাট। তাঁরা তিন ভাই আসতেন, বসতেন; ভয়ে ভয়ে যেন নিজেকে চেপেচুপে রাখতাম। কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই হবে, গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথকে প্রণাম করতাম, আর অবনীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে কোনোমতে প্রণাম করেই গগনেন্দ্রনাথের কৌচ ঘেঁষে মেঝেতে বসে পড়তাম। যেন তাঁর আশ্রয়ের আড়াল নিতাম।

বড়দা দেয়ালজোড়া ছবি এঁকেছেন, আমরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। সেই ছবি দেখাতে অনেক সাধ্য-সাধনা করে অবনীন্দ্রনাথকে বড়দা বাড়িতে এনেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ছবি দেখে একটা হুংকার দিতেন, বলতেন, এ কী এঁকেছ? এ কি ছবি হয়েছে? নয়তো হাতের লাঠি দিয়ে একটা খোঁচাই মারলেন ছবিতে। বড়দা তেজি মানুষ বলে খ্যাত, সেই আমাদের তেজি বড়দা কাঁচুমাচু হয়ে পাশে সরে যেতেন। সামনাসামনি দাঁড়াবার সাহস থাকত না।

এমন মানুষকে ভয় পাব না সে কি হয়? খুবই ভয় পেতাম। আমার

বিয়ের পরেও যখন উৎসব অভিনয় উপলক্ষে গুরুদেবের সঙ্গে জোড়াসাঁকোয় আসতাম তখনো সর্বদা সতর্ক হয়ে চলতাম, যেন সামনে না পড়ে যাই অবনীন্দ্রনাথের। তফাত হতে দেখতে পেলেই সরে পড়তাম, পালিয়ে থাকতাম।

তার পর একদিন অবনীন্দ্রনাথই আমাকে কাছে টেনে নিলেন। সে এক পুণ্য মুহূর্ত আমার জীবনে। আমি তখন মা, আমার অভিজিতের বয়স তখন বছর চারেক, সেই যেবারে গুরুদেব কালিম্পঙ থেকে অসুস্থ হয়ে ফিরলেন, ষ্ট্রেচারে করে তাঁকে ট্রেনের জানালা গলিয়ে হাওড়া স্টেশনে নামানো হল। অচৈতন্য যেন, কী আতঙ্ক, কী উদ্‌বেগ, কী উৎকণ্ঠা দিবারাত্রি তখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে।

অবনীন্দ্রনাথ ও-বাড়ি থেকে এ-বাড়ির নীচতলা অবধি বারে বারে আসেন, আর ফিরে ফিরে যান। উপরে ওঠেন না। বলেন, সাহস পাই নে। ফিরে গিয়েও শান্তি পান না। পাঁচ নম্বর থেকে ছয় নম্বর বাড়ির মাঝখানের প্রাঙ্গণটুকু যেন ছুটতে ছুটতেই আসেন, সেই অবস্থায়ই দোতলার লম্বা বারান্দায় দ্রুত খানিকটা এগিয়ে গিয়েই লাঠিতে ভর দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন, বলেন, এখান হতেই বলো তোমরা, কেমন আছেন রবিকা। না না, ভিতরে যাব না, ও আমি দেখতে পারব না, কানে যে শুনি এই-ই কত মর্মান্তিক। ব'লে, তাঁর হাতের লম্বা আঙ্‌লগুলিতে 'না, না' ভাষা তুলে আবার তেমনি করে চলে যান। দু বেলা চলত তাঁর এমনিতরো যাওয়া-আসা।

ধীরে ধীরে গুরুদেবের অবস্থা ভালোর দিকে ফিরতে লাগল। কিছুকাল বাদে আরো ভালো হলেন। যদিও পূর্ণ নিরাময় হন নি, তবু অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ রবিকার খবর শুনে শুনে আনন্দে খুশিতে ভরপুর হয়ে ওঠেন। এখনো রবিকার ঘরে ঢোকেন না, তবে তাঁর ঘর হতে একটু তফাতে দোতলার লম্বা বারান্দায় একটা কৌচে বসে দুবেলা কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে যান, কাছে যাদের পান তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

আড়াল থেকেই তাঁকে দেখি রোজ।

গুরুদেবের শুশ্রূষার ভার ছিল আমাদের কয়েকজনার উপর। ঘণ্টা ধরে পালা বদল হত আমাদের। যে যার সময়মত স্নানাহার সেরে তৈরি হয়ে থাকতাম।

অবনীন্দ্রনাথ নিয়মিত আসেন, সেদিনও এসেছেন। রবিকার খবরাখবর নেবার পর যথারীতি কৌচে বসেছেন। মন আরো খুশি, খবর পেয়েছেন রবিকা শুয়ে শুয়েই কবিতা লিখছেন। তাই একে-ওকে ডেকে তিনি গল্প করছেন।

লম্বা বারান্দায় পর পর ঘর। আমি সেই সময়ে স্নান সেরে বারান্দা পেরিয়ে বোঠানের ঘরে চলেছি। মন ছিল আমার খানিক অন্যমনস্ক। যেতে যেতে আচমকা মুখ তুলে দেখি, মাত্র হাতকয়েক দূরে অবনীন্দ্রনাথ বসে।

তিনি বসেছিলেন বারান্দায় রেলিং ঘেঁষে বাইরের দিকে মুখ করে। আমি আছি তাঁর পিছন দিকে। তাঁকে দেখতে পেয়ে আমি থেমে গেছি, চলতে চলতে চলার যে শব্দ উঠছিল তাও থেমে গেল। অবনীন্দ্রনাথ টের পেলেন। তেমনিভাবে বসেই হাঁক দিলেন— কে ?

কৃষ্ণ কৃপালনি ছিলেন কাছে। বললেন, রানী।

অবনীন্দ্রনাথ যেন গুম্‌রে-ওঠা হুংকার ছাড়লেন— হুঁ, পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে ?

আমার তখন যা অবস্থা! ফিরেও যেতে পারি না, এগোতেও ভয়। কী করি। অবনীন্দ্রনাথ আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম, প্রণাম করেই উঠে আসব— বললেন, বোসো।

কৃষ্ণ কৃপালনি ততক্ষণ সরে পড়েছেন সেখান থেকে। আমি নিরুপায়, অসহায়। দুরদুর করছে বুক। ভয়ে ত্রাসে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইলাম সেইভাবেই, প্রণাম করবার কালে যেমন বসেছিলাম দু-হাঁটু মুড়ে। কয়েক মুহূর্ত কাটল এইভাবে।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, আজ একটি বলাকা ধরেছি।

চোখে যেন তাঁর হাসি হাসি ভাব। বললেন, কী সুন্দর বলাকা।

তাঁর মুখেও হাসির রেখা ফুটল। বললেন, দুদিকে দুই ডানা মেলে সে চলেছে— চলেইছে।

অবনীন্দ্রনাথ একবার করে থামেন, আর বলেন। বললেন, নীল আকাশে সে উড়ে চলেছে। রোদ-ঝলমল ধান-খেতের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। একা একা উড়ে চলেছে।

তাঁর মুখ-চোখ আবার হাসিতে ভরে উঠল। বললেন, দেখবে ?

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর কোলের উপর রাখা ডান হাতখানি তুলতে গিয়ে নামিয়ে

রাখলেন। আবার তুললেন— আবার নামালেন। ওই হাত তোলার মধ্যে যেন বলাকা দেখাবার জাদু লুকোনো আছে এমনিই ভাব।

আমি কখন সরে আসতে আসতে একেবারে তাঁর হাঁটু ঘেঁষে এসে বসেছি। অবনীন্দ্রনাথের হাত একটু একটু নড়ছে আর আমি উৎসুক হয়ে উঠছি।

অবনীন্দ্রনাথ এক ফাঁকে তাঁর পাঞ্জাবির বুক-পকেটের দিকে একটু আড়চোখে চেয়ে নিয়ে গম্ভীরভাবে মুখখানা তুলে আকাশের গায়ে দৃষ্টি ফেললেন। যেন কিছুই হয় নি, কিছুই জানেন না তিনি। কিন্তু আমি যে স্পষ্ট বুঝে নিলাম ওই বুক-পকেটেই আছে সেই আশ্চর্য বলাকা, যে নাকি নীল আকাশে উড়ে চলেছে— চলেইছে।

কৌতূহলে অস্থির হয়ে পড়ছি।

অবনীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বুক-পকেটে হাত ঢোকাবার ভঙ্গি করে বললেন, দেখবে? দেখবে? আচ্ছা দেখাই— বলেই আবার হাত গুটিয়ে নিলেন। বললেন, না বাবা, থাক্।

দুই চোখে মুগ্ধভাব ফুটিয়ে বললেন, সকালের রোদ্দুরে ধানশিষের সে কী বাহার! আর কী সুন্দর সে ডাকতে ডাকতে চলেছে যে—

ততক্ষণে আমি আরো খানিকটা এগিয়ে এসেছি। আমার মুখ তাঁর কোল ছুঁয়েছে। দেখার আগ্রহ আর ধরে রাখা দায়।

অবনীন্দ্রনাথ 'এই দেখাই, দেখাই— দেখাব?'— করতে করতে এক সময়ে সত্যি সত্যিই হাত দিয়ে পকেট থেকে একটি বাক্স বের করলেন।

সে আমলের 'ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট' সিগারেটের পাতলা চৌকো চ্যাপ্টা এক বাক্স, এক সারি গোটাদশেক সিগারেট শোয়ানো থাকে তাতে, গায়ে কালো কালো ডোরাটানা নকশা।

বাক্সটি হাতে নিয়ে তিনি হাসতে লাগলেন। বললেন, খুলব? যদি পালিয়ে যায়? আচ্ছা খুলি। সাবধান, কথা কোয়ো না। লোকের সাড়া পেলে ভড়কে যাবে। দেখো— আর কেউ নেই তো কাছাকাছি? এ জিনিস বাবা সবাইকে দেখাবার নয়। বলে— বাঁ হাতের তেলোয় বাক্সটি রেখে বললেন, আচ্ছা, খুলি তা হলে? বেশ? কিন্তু, হুঁশিয়ার— দেখো, যেন উড়ে না পালায়। দেখো— দেখো, ব'লে ডান হাত দিয়ে অতি সন্তর্পণে ডালাটি খুলে দিলেন। বললেন— এই দেখ।

ছোট্ট একটি কাঠের টুকরোর বলাকা। মিহি তারে গাঁথা বলাকা, তারের দুপ্রান্ত বাক্সের দু দিকে আটকানো। মধ্যিখানে ছোট্ট বলাকা চকচকে টিনের পাতখানার উপরে, মনে হয় যেন অসীম আকাশে উড়ে চলেছে একাকী দুখানি ডানা দুপাশে মেলে দিয়ে।

অবনীন্দ্রনাথের বাঁ হাতে বলাকাসমেত বাক্সখানি ধরা, হাতটি একটু তুলে ধরলেন। বললেন, শোনো কেমন ডাকতে ডাকতে চলেছে— ব'লে হাতখানি খুব ধীরে ধীরে নাড়তে লাগলেন। তারের গিঁট সেই দোলায় বাক্সের টিনের গায়ে লেগে মৃদুস্বরে ধ্বনি তুলল—কঁ—কঁ—।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, শুনলে? আর, এই দেখো ধানখেত রোদ্দুরে কেমন ঝিলমিল করছে, ধানের শিষ হাওয়ায় দুলছে।

চকচকে টিনের পাতে আলোছায়া পড়ে ধানখেত দিক-দিগন্ত সব কিছু ফুটে উঠেছে। ওই একটুখানি ছোট্ট 'ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট'-এর বাক্সের ভিতরে সীমায়-অসীমে বলাকা উড়িয়ে অবনীন্দ্রনাথ হাসছেন, আমি হাসছি। সেদিন ওই হেসে হেসে খেলা দিয়ে ভুলিয়ে আমাকে তিনি কাছে টেনে নিলেন।

পরে একদিন দক্ষিণের বারান্দায় তিনি বসে 'কুটুম-কাটাম' গড়ছেন, আমি কাছে বসে দেখছি, দেখতে দেখতে পরম বিস্ময়ে এই কথাই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, এই-আপনাকে কেন এত ভয় পেতাম আগে।

তিনি মুখের চুরুটটি হাতের আঙুলে তুলে নিলেন। বললেন, গুটিপোকার মুখোশ দেখেছ? প্রজাপতি হবার আগে 'গুটি' যখন বাঁধে— পাতার নীচে ঘাসের গায়ে ঝুলতে থাকে সেই গুটিপোকা। বেশ কিছুদিন তাদের থাকতে হয় ওই অবস্থায়। তাদের মুখের দিকটা থাকে উপরের দিকে, লেজের দিকে থাকে রঙ-বেরঙের মুখোশ আঁকা। পাখিরা খেতে এলে গুটিপোকাটা নড়েচড়ে ওঠে, মুখোশও নড়ে। ওই মুখোশ দেখেই পাখিরা ভয়ে পালিয়ে যায়।

আমারও তেমনি। মুখোশ পরে থাকি। সেই মুখোশ পেরিয়ে কেউ এসে গেল তো এসেই গেল।

সেই তখনি একদিন বলেছিলেন গল্প— সেদিনও স্নান করতে যাচ্ছি লালবাড়ির স্নানঘরে, 'বিচিত্রা' হল্ পেরিয়ে যেতে হত স্নানের ঘরে। দেখি হলের

মাঝখানে বসে অবনীন্দ্রনাথ কথা বলছেন কলা-ভবনের দুটি অবাঙালি মেয়ের সঙ্গে। একটি ছিল বিহারী মেয়ে, নাম বিন্ধ্যা, অন্যটি ছিল সিন্ধুদেশের— তার নাম মনে নেই।

অবনীন্দ্রনাথ কথা বলছেন, পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে কী মনে হল, দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিছু পরে এগিয়ে এলাম। তার পর একসময় কাছে গিয়ে বসে পড়লাম।

কথা হতে হতে কখন কথার মোড় ফিরে গেছে, অবনীন্দ্রনাথ কথা বলছিলেন মেয়েদুটির সঙ্গে— সে মুখ ঘুরে গেছে আমার দিকে। মেয়েদুটি কখন যেন উঠে চলে গেছে সেখান থেকে। 'হলে' আর কেউ নেই, শুধু তিনি আর আমি। তিনি বলছেন, আমি শুনছি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে আছি।

বলছেন— কী করে তিনি ছবি আঁকা শিখলেন। কী করে লিখতে শুরু করলেন। কী করে শিক্ষক হলেন। সময়ের হিসাব ছিল না সেদিন আমাদের। স্তব্ধ 'হলে' শুধু ছিল তাঁর কথার ধ্বনি।

এক সময়ে খেয়াল হল, অবনীন্দ্রনাথ থামলেন। বললেন, অনেক দেরি হয়ে গেল, স্নানের বেলা হল, এবারে উঠি।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে তিনি নামছেন, ধাপে ধাপে পা ফেলছেন ; আমি সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছি। কয়েকটা ধাপ নেমে পিছন ফিরলেন, বললেন, রানী, অনেকে আমায় জিজ্ঞেস করেছে, কাউকে আমি বলতে পারি নি কিছু। আজ কেমন এসে গেল আপনা হতে। এগুলি মূল্যবান কথা, নষ্ট কোরো না, ধরে রেখো। বলে, নেমে ও-বাড়ি চলে গেলেন।

'নষ্ট কোরো না, ধরে রেখো'— কথা কয়টি সারাক্ষণ মনের মধ্যে জেগে রইল, মস্ত একটা দায়িত্ব মনে হল। কিন্তু কী করে রাখব? কেমন করে ধরব? রাতে অসুস্থ গুরুদেবের ঘরে 'ডিউটি' দিই আর ভাবতে থাকি। শেষে মনে হল যেমন যেমন অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন ঠিক তেমনই লিখে রাখি।

গুরুদেবের মাথার দিকে ঘরের কোণে রাখা কাগজ দিয়ে আড়াল-করা নিবু নিবু লণ্ঠনের আলোয় গোপনে বসে বসে কথাগুলি লিখে ফেললাম পর পর কয়রাত্রি ধরে।

সে সময়টায় আমি একাই থাকতাম গুরুদেবের ঘরে। ভাবলাম, এইভাবে

ধরা থাক্ কথাগুলো, সুযোগমত কোনো ভালো লেখককে ধরে দিলে এ থেকে একটা ভালো লেখা তৈরি করে দেবেন।

এ ঘটনা আমি লিখেছি আমার 'গুরুদেব' বইতে। তবু আবার লিখি। পুণ্য কথা বারবার স্মরণেও আনন্দ।

সেদিনের এই 'কথাগুলি' লিখে রাখা হতেই আমার জীবনে 'লেখা' এল। এও অবনীন্দ্রনাথেরই দান। খেলার ছলে কাছে টানলেন, গল্পের ছলে উৎসের মুখ খুলে দিলেন।

তাঁর কথা আজ লিখতে বসেছি— কোন্ কথা দিয়ে তাঁকে ধরি? কোন্ পথ ধরে এগোই? কোথায় গিয়ে তাঁর কথার শেষ পাই? তাঁকে ধরতে চাইলেই যেন ডুবে যাই। এ কথা বোঝাবার শক্তি আমার নেই।

গুরুদেব অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাঁকে নিয়ে আমরা শান্তিনিকেতনে ফিরে এলাম। তাঁর প্রিয় স্থান আশ্রমের আলো-হাওয়ায় এসে তিনি খুশি হলেন। অসুখ সম্পূর্ণ সারে নি, তবে সহ্যসীমার মধ্যে এসে আছে। গুরুদেব আজকাল উদয়নের জাপানী ঘরের গোল জানালার পাশে একটা আরাম-কেদারায় আধশোওয়া অবস্থায় বেশির ভাগ সময় কাটান, বাইরেটা দেখেন। মাঝে মাঝে একটু পড়াশুনা করেন, লেখেন, দু-একটা ড্রইংও করেন। আমাদের সেবা করবার মতো করণীয় কাজ তেমন কিছু নেই, বিশেষ করে দুপুর বেলাতে, কেবল ঘড়ি ধরে ওষুধ ঢেলে খাওয়াই আর পাশে চুপটি করে বসে থাকি।

সেই সময়েই একদিন দুপুরে গুরুদেব বললেন, দেখ, আমার জন্য তোদের কত সময় নষ্ট হয়, এটা আমার বড়ো লাগে। এখন তো আমি অনেক ভালো আছি, বেশি কিছু তোদের করবার নেই। চুপ করে বসে না থেকে কিছু বরং কর্ এই সময়টাতে। আমার তাতে ভালোই লাগবে। বই পড়্, না হয় কিছু লেখ্।

এর আগেও গুরুদেব অনেকবার আমাকে লিখতে বলেছেন। বলেছেন— তুই ছবি আঁকতে পারিস, লিখতেও পারবি। লিখেই দেখ্-না, দেখবি ঠিক হয়ে যাবে।

শুনে হেসেছি বরাবর। কিন্তু এবার যেদিন বললেন— নাহয় কিছু লেখ্— সেদিন কি জানি কেন হাসতে পারলাম না। হাসি এল না। বললাম— গুরুদেব, লিখতে তো জানি না আমি, তবে এবারে আপনার অসুখের সময়ে

জোড়াসাঁকোয় অবনীন্দ্রনাথ কিছু বলেছিলেন একদিন। তা 'নোট' করে রেখেছি। যদি দেখিয়ে দেন তবে তা থেকে একটা লেখা তৈরি করতে পারি।

গুরুদেব বললেন, সেই লেখাগুলি আছে তোর কাছে?

বললাম— হ্যাঁ।

বললেন— যা, নিয়ে আয় তো।

'উদয়নে'র পাশেই 'কোণার্ক'। কোণার্কে থাকি আমরা। দৌড়ে এসে দেরাজ খুলে লেখাগুলো নিয়ে গুরুদেবের কাছে এলাম।

গুরুদেব পড়তে লাগলেন।

দু-তিন পাতা পড়বার পরই দেখি তাঁর কপাল ঘামতে শুরু করেছে। লিখলে কি পড়লে অল্পেতেই এখন গুরুদেব ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আমার ভাবনা হল। মনে হল এই পাতাটা পড়া হলেই বলি— গুরুদেব আর না, বাকিটা কাল পড়বেন। যেই বলতে যাব অমনি গুরুদেব পলকে পাতা উলটে অন্য পাতা পড়তে লাগলেন। এমন একমনে পড়ছেন যে, পড়ায় মাঝে শব্দ করি এ সাহস হয় না। পাতার পর পাতা এভাবেই চলল।

যেন এক নিশ্বাসে গুরুদেব সবটা পড়ে ফেললেন। বললেন— এ অপূর্ব হয়েছে, 'স্পনটেনিয়াস' হয়েছে। অবন বলে যাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি। এতে বদলাবার কিছু নেই। তুই অবনের কাছ থেকে আরো আদায় করে নে। এমনি করে না বলিয়ে নিলে ও বসে লিখবার ছেলে নয়। ব'লে গুরুদেব তখনি ওই লেখারই একধারে লিখলেন অবনীন্দ্রনাথকে। পরে যখন কলকাতায় আসি সে চিঠি অবনীন্দ্রনাথ, যেমন ছোটো ছেলে রঙিন খেলনা পেলে খপ করে নিয়ে মুঠোয় লুকোয়, তেমনি করেই নিয়ে নিলেন। বললেন, রানী, এ চিঠি তোমাকে দেব না। এ যে রবিকা আমায় লিখেছেন— আমার চিঠি।

চিঠিতে গুরুদেব লিখেছিলেন, 'অবন, কোমর বেঁধে বসে লেখবার ছেলে তুমি নও। এ জিনিস তুমি ছাড়া আর কারো মুখে হবে না। রানীকে তুমি এমনিতরো আরো গল্প দাও।' আরো ছিল, সবটা মনে আসছে না।

কলকাতায় এলাম গল্প নিতে। বলেছি 'গুরুদেব' বইয়েতে যে, সে সময়টা গেছে আমার— সোনায়-মোড়া সময়। গুরুদেবের সময় উপচে পড়ছে অবনীন্দ্রনাথের উপর, আমায় দিয়ে বলে পাঠালেন, অবনকে গিয়ে বলিস— আমি শুনতে চেয়েছি।

অবনীন্দ্রনাথ খুশিতে উছলে উঠছেন, রবিকা গল্প শুনে খুশি হয়েছেন, আরো শুনতে চাইছেন। বললেন, যত পার নিয়ে যাও, রবিকাকে গিয়ে শোনাও।

আমি যেন দুজনের স্নেহ-ভালোবাসার বাহন হয়ে গিয়েছিলাম তখন।

জোড়াসাঁকোর ছয় নম্বর বাড়িতে আমি আছি একা। অবনীন্দ্রনাথ রোজ সকালে বিকেলে আসেন পাঁচ নম্বর বাড়ি থেকে, দু তিন চার ঘণ্টা বসে এক-এক বেলা গল্প বলে যান।

অবনীন্দ্রনাথ মহা খুশি। বলেন, কে জানত রবিকা আমার এই-সব গল্প শুনে এত খুশি হবেন?

সে যেন গল্পের ঝর্না। প্রবল বর্ষণে উপচে পড়া ঝর্না। রবিকা শুনতে চেয়েছেন— অবনীন্দ্রনাথ বললেন, নাও, নাও। যত পার নিয়ে যাও। সময় আমারও বড়ো কম। এই শেষবেলায় এমন আদেশ আসবে কে জানত? বলতে বলতে তাঁর দু চোখ ছলছলিয়ে উঠত।

সকালে আমি ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিই। অবনীন্দ্রনাথ চলে আসেন ওই বাড়িতে। দুজনে বারান্দায় বসি। অবনীন্দ্রনাথ একটানা গল্প বলে যান।

অবনীন্দ্রনাথ চলে গেলে স্নান করে খেয়ে লিখতে বসে যাই। বিকেল হতে না হতে তিনি এসে পড়েন। সকালের বলা গল্প তাঁকে পড়ে শোনাই। পড়ি আর তাঁর মুখের দিকে তাকাই। তিনি আকাশে দৃষ্টি মেলে বসে থাকেন। আমার পড়া শুনতে শুনতে সেই মুখে কখনো হাসি ফোটে, কখনো বিষাদ, কখনো-বা গম্ভীর ভাব। তাঁর মুখের ভাব দেখে ধরি কোথায় লেখাটা ভালো হয়েছে, কোথায় 'কেমন' ঠেকছে। তখন খানিক থেমে যাই। অবনীন্দ্রনাথ কোথাও বলেন— ঠিক আছে, চলবে। কোথাও বলেন, আচ্ছা, ও কথা কয়টা বাদই দাও। কী দরকার সবাইকে জানিয়ে।

আগের লেখাটা শোনা হয়ে গেলে আবার খানিকটা নতুন করে গল্প বলেন। সন্ধে হয়ে যায়। তিনি বাড়ি চলে যান। তাঁকে দোরগোড়া অবধি পৌঁছে দিয়ে রাত্রের খাবার খেয়ে বিকেলের বলা গল্পগুলি লিখে ফেলি। এ লেখাটা বিছানায় শুয়ে-বসেই লিখি। লিখতে লিখতে রাত গভীর হয়। মাঝে মাঝে কী জানি কেন ভয়-ভয়ও করত। একা এই বাড়িতে আমি, এই ঘর— কত কালের কত ঘটনার ঘর; মন ছমছম করত। আলো নেভাতে

পারতাম না। বালিশে মুখ গুঁজে শেষরাত্রের সময়টুকু অমনি করেই কাটিয়ে দিতাম।

একদিন পুরো গল্পটা লিখে উঠতে পারলাম না। ভাবনা হল, ভোরবেলা এসেই তো তিনি প্রথমে আগের দিনের বিকেলে-বলা গল্পগুলি শুনতে চাইবেন। বলবেন, 'পড়ো দেখি কাল কী বলেছি একবার শুনে নিই।'— তাই ভাবলাম, তিনি আসবেন আর আমি লেখা শোনাতে পারব না— তা হয় না। ওঁর আসবার আগেই তাড়াতাড়ি একটা 'স্লিপ' লিখে পাঠিয়ে দিলাম ও-বাড়িতে। লিখলাম— সামলে উঠতে পারি নি, বিকেলে লেখা পড়ে শোনাব, সকালে আর আসবেন না আজ।

রবিকার টানে যে গল্পের তোড় নেমেছে তাঁর মাঝে তা যেন তিনি নিজেও সামলে রাখতে পারছেন না। আমি তো খুব ভোরেই তাঁকে না আসবার জন্য লিখে পাঠালাম কিন্তু তারও আগে যে তিনি তৈরি হয়ে ঘোরাফেরা করছেন আসবার জন্য তা কি আমি জানি? অবনীন্দ্রনাথ লিখে পাঠালেন— ভালো, তাই হবে। আমি একবার ফটকের কাছ থেকে তোমাদের বারান্দার দিকে উঁকি দিয়ে দেখলেম পর্দা ফেলা। আস্তে আস্তে এসে বাগানে ঘুরছি। এইবার আমিও বাঁশের গোড়াগুলো দুরস্ত করতে চললেম। বৈকালে দেখা হলে অন্য গল্প হবে।

স্লিপখানা পেয়ে বড়ো দুঃখ হল। আর কখনো লেখা অসমাপ্ত রাখি নি। যত রাতই হোক লেখা শেষ করে তবে ঘুমিয়েছি।

সাত দিনে অনেকগুলি গল্প লেখা হয়ে গেল। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, এবারকার মতো এই গল্পগুলোই নিয়ে যাও, গিয়ে শোনাও রবিকাকে। ওঁর অসুস্থ শরীরে বেশি উৎসাহ আনন্দ দিতেও ভয় হয়। এই বুঝে ওঁকে লেখা শুনিয়ো। এই গল্পগুলি শুনে রোগশয্যায় যদি উনি মুহূর্তের জন্যও খুশি হন, সেই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

গল্প নিয়ে ফিরে এলাম আশ্রমে। গুরুদেব খুব খুশি হলেন। সে কথা লিখে জানালাম অবনীন্দ্রনাথকে। গুরুদেবও লিখলেন চিঠি ওইসঙ্গে। গুরুদেবের চিঠিখানা এই লেখার সঙ্গে রাখব বলে পরে চেয়ে পাঠিয়েছিলাম অবনীন্দ্রনাথের কাছে।

তিনি লিখলেন— 'রবিকার আশীর্বাদ ও তোমার চিঠি একসঙ্গে পেয়েছি।

কী যে মনের ভিতর হল শক্তিসঞ্চার রবিকার ওই একটুখানি লেখায় তা বলতে পারি নে। ও লেখাটুকু আমার কাছেই রাখলেম, ফিরে দিতে এই সঙ্গে মন সরলো না। ওটি হচ্ছে মহাভারতের যুদ্ধের যোদ্ধা কর্ণের কাছে সূর্যদত্ত কবচ। ও চিঠির ব্যবহার এখন নয়। এখানে এলে তোমাকে এ বিষয়ে বুঝিয়ে বলব, তখন আর ওটা আমার কাছ থেকে চেয়ে নেবে না।'

লিখলেন, 'কত কথা মনের মধ্যে ঠেলাঠেলি করছে, সুবিধেমত তুমি সেগুলোকে এসে আত্মসাৎ করলে সুখী হব। আমার সুবিধে সব সময়ে আছে। তুমি যদি না লিখে নিতে তো এ-সব কথা মনে নিয়েই বসে থাকতেম— তার পর একদিন— বস্।'

গুরুদেব শান্তিনিকেতনে তখন উদয়নের দোতলার ঘরে আছেন। জানালা দিয়ে দূর দেখতে পাবেন বলে তাঁকে আনা হয়েছে উপরে। গুরুদেব জানালার ধারে কৌচে বসেন, আমি গল্পগুলো এনে হাতে দিই— গুরুদেব পড়েন। বলেন, আশ্চর্য রূপ দিয়েছে— ছবির পর ছবি ফুটিয়ে গেছে অবন। সে একটা যুগ— রবিকা তার মধ্যে ভাসমান। তার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে ওদের সবাইকে। কী সজীব, সব যেন আবর্তিত হচ্ছে। এমনভাবে সেই যুগকে ধরেছে এনে— এ আর-কেউ পারবে না।

একটানা বেশিক্ষণ পড়তে কষ্ট হয় গুরুদেবের। রোজ কিছুটা করে পড়েন। পড়ার পরে লেখাগুলো তুলে রাখি, পরদিন আবার তাঁকে দিই।

যেদিন সবটা পড়া হয়ে গেল— উঠে এগিয়ে এলাম, কাগজগুলো সরিয়ে নেব— গুরুদেব কোলের উপর রাখা লেখাগুলোর উপর বাঁ হাতখানি চাপা দিয়ে রইলেন।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বললেন, রথীকে ডাকো।

রথীদাকে ডেকে আনলাম। রথীদা গুরুদেবের কৌচের পিছনে এসে দাঁড়ালেন। গুরুদেব বুঝতে পারলেন। সেইভাবে বসেই লেখার কাগজগুলো হাতে নিয়ে ঘাড়ের পাশ দিয়ে পিছন দিকে তুলে ধরলেন। বললেন, প্রেসে দাও।

রথীদা লেখাগুলো নিয়ে চলে গেলেন।

এই হল 'ঘরোয়া' বইখানার জন্মকথা।

'ঘরোয়া'র জন্ত আরো কিছু গল্প চাই। গুরুদেব আবার আমাকে পাঠিয়ে

দিলেন কলকাতায়। আসবার সময় বললেন, অবনকে গিয়ে বলিস আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার জীবনের সব বিলুপ্ত ঘটনা যে অবনের মুখ থেকে এমন করে ফুটে উঠবে তা কখনো মনে করি নি।

এর কিছুদিন পরে অপারেশনের জন্য গুরুদেব কলকাতায় এলেন। সেইবারেই শ্রাবণ মাসে রাখিপূর্ণিমায় গুরুদেব দেহত্যাগ করেন।

'ঘরোয়া' তখন যন্ত্রস্থ। কয়টা দিনের জন্য গুরুদেবকে ছাপার অক্ষরে বইখানা দেখানো গেল না।

'ঘরোয়া' ছাপা হয়ে এলে অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন— 'ইচ্ছে হয়েছিল 'ঘরোয়া' বইখানা দিয়ে রবিকার ছবির সামনে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ধরে দেব। কিন্তু সে মানসিক উত্তেজনা সইতে পারব না। এ ধাক্কা আস্তে আস্তে কাটবে জানি।'

আমি যখন অবনীন্দ্রনাথের কাছে এলাম, তাঁর তখন পুতুল-গড়ার যুগ।

পাঁচ নম্বর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর কাঠের কৌচে বসে সারাদিন পুতুল গড়েন। হাতের কাছে কাঠকুটো, পাশে ছোট্ট টুলের উপরে পুতুল-গড়ার যন্ত্রপাতি— চার ইঞ্চি মতো লম্বা একটি করাত, তেমনি মাপের বাটালি একটি, একটি পেনসিলকাটা ছুরি, ছোটো বড়ো পেরেক গোটাকয়েক, ভাঙা একটা রঙের বাক্স, খানকয়েক খড়কে কাঠি— ফুটো করে ওই খড়কে কাঠি গুঁজেই তিনি পেরেক মারার কাজ করেন পুতুলে। আর থাকে একবাটি জল। নৌকো, জাহাজ তৈরি করেন যখন, জলে ভাসিয়ে দেখেন ভাসল কি না ঠিক। যতক্ষণ না ভাসে ততক্ষণ মনের মতো হয় না; এটা ওটা টিপে ব্যালান্স করেন, জাহাজের মাথায় মাস্তুল তোলেন, নৌকোর সামনে দাঁড় গাঁথেন। জাহাজ, নৌকো জলে ভাসে— খুশি হয়ে ওঠেন। বলেন, সাজ-সরঞ্জাম নইলে কারোই মন ওঠে না।

একটুখানি খুদে হাঁস— কত তার যত্ন। খুঁটে খুঁটে গলায় ভঙ্গি আনেন, কখনো-বা মুখের জলন্ত চুরুট হাঁসের গায়ে চেপে ধরেন— ছেঁকা লেগে একটু কালচে রঙ ধরে কাঠে, দেখে ফিকফিক করে হাসেন। কী, না— বাচ্চা হাঁসের গায়ে পালক ফুটল।

সেই একটুখানি কাঠের টুকরো— এক কি দেড় ইঞ্চিটাক বস্তু, তাই নিয়ে সারাদিন কাটে তাঁর। একটু পরে-পরেই বাটির জলে ছাড়েন, বাচ্চা হাঁস

কাত হয়ে থাকে, হেলে পড়ে। শেষে এক সময়ে ঠিকটি হয়ে জলে যেই ভাসতে পারল— অবনীন্দ্রনাথ তখন খুশিতে দুলে দুলে হাসেন। বলেন, হাঁস জলে সাঁতার শিখল, আর মায়ের ভয় নেই।

জলের বাটির পাশে আছে ভাঙা গেলাস একটি। এটি হল তাঁর লোহার সিন্দুক— দামি গহনা-পত্রে ভরা। চুরুটের গায়ের সোনালি রঙের লেবেল, গোলাপি সেলুলয়েডের ঝুমঝুমির ভাঙা ডাঁট, রেশমি চুড়ির টুকরো, লাল নীল রাংতা, টফি চকোলেট মুড়বার রঙিন কাগজ; হাতের কাছে পায়ের কাছে যা পেয়েছেন সব-কিছু যত্নে তুলে রেখেছেন গেলাসে। নীল রঙের কাচের বড়ো পুঁতি, একটি মটরদানার মতো— নাতনীর পুতুল-বউয়ের গলার মালা ছিঁড়ে পড়া— সেটিকেও কুড়িয়ে এনে রেখে দিয়েছেন তাতে। সেই নীল পুঁতি দেখি স্থান পেল একদিন মহাদেবের ভিক্ষের ঝুলিতে।

একে তো মহাদেব, তায় তাঁর ভিক্ষের ঝুলি; ঠিকমতনটি হওয়া চাই তো! কত যত্নে টুকিটাকি এটা ওটা ভরে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে বাঁধলেন টেনিস বলের আকারে ছোট্ট একটি পুঁটলি। তাতে গুঁজলেন শুকনো একটা আমকাঠি; এটি হল মহাদেবের লাঠি। ঝুলির সঙ্গে লাঠি না থাকলে ঝুলি ঝুলবে কিসে?

সারাদিন লাগল ঝুলিটি বাঁধতে। বাঁধেন, খোলেন, গিঁট দেন; গিঁট দেওয়াও মনোমত হয় না— আবার খোলেন। ঝুলিটি ঝুলির মতো হবে তবে তো? সব যখন হল, তখন সেই নীলরঙের পুঁতিটি ঝুলির উপরে আটকে দিলেন। বললেন, দেখেছ এই ভিক্ষের ঝুলি? মহাদেবকে রোজই ভিক্ষেয় বের হতে হয়, নইলে সংসার চলে না। আজ পার্বতী বড়ো তাড়নাই দিয়েছেন। মহাদেব ভিক্ষেয় বেরিয়েছেন, পথে এই নীলমণিটি দেখতে পেলেন, তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিলেন, পার্বতীকে দেবেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠোঁট টিপে টিপে হাসেন। আত্মভোলা মহাদেবের প্রেমিক-রূপটি যেন চকিতে দেখে ফেললেন তিনি।

ময়লা নেকড়ার ছোট্ট পুঁটলিটির উপর নীল পুঁতিটি জলজল করে। অবনীন্দ্রনাথ লাঠিসমেত ঝুলিটি তুলে ধরেন আর খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন, যেন উমার বুকে মহাদেবের দেওয়া নীলমণিটি দুলছে— দেখতে পান।

ঝাড় লণ্ঠনের ভাঙা কাচের টুকরো একটি, তাকে যত্নে শুইয়ে দিলেন

কাচের আলমারিতে। বললেন, এ হল আমার 'ফটিকরানী'— শুয়ে ঘুমোচ্ছে, থাকুক অমনি। কেউ ছুঁয়ো না। আহা! এমনি একটি সবুজ কাচের টুকরো পেতুম তো পাশে রেখে দিতুম। থাকত দুজনে পাশাপাশি শুয়ে।

এমনিতরো কত নাম কত রূপে অগুনতি এরা এসে ভিড় করেছে অবনীন্দ্রনাথের পাশে। যাই আসি, এইরকম নিত্য নতুন সৃষ্টি দেখি। দিনরাত্রির ঘরকন্না ছিল এদের সঙ্গে তাঁর।

অবনীন্দ্রনাথ বলেন, দেখো, ছবিতে পরিপূর্ণতা এসে গেলেই মাটি। ছবিতে সব সময়েই কিছু চাইবে— আরো দাও, আরো চাই। শিল্পী অনবরত সেই দেবার চেষ্টা করে যাবে। সব দেওয়া হয়ে গেলে আর রইল কী? শিল্পী তা হলে কিসের প্রেরণায় কাজ করবে? তার জন্য রাস্তা খোঁজা দরকার। সৃষ্টির অফুরন্ত ধারা; শিল্পী ধারা বদলাবে দরকার হলে। রবিকা একবার আমাকে বললেন, অবন, তুমি ছবি আঁকা ছেড়ে দিলে কেন? আমি বললুম, আর ভালো লাগে না। কারণ, এখন যা মনে করি তাই আঁকতে পারি। ডিফিকালটি ওভারকাম করবার যে একটা আনন্দ তা আর পাই নে। তাই কাঠকুটো নিয়ে পড়ে আছি— তাকে ভাঙি, জোড়া লাগাই, পেরেক ঠুকি, তার দিয়ে বাঁধি— হাত ব্যথা হয়ে যায়। তার পর যখন একটা-কিছু তাতে পেয়ে যাই, আনন্দে প্রাণ ভরে ওঠে। এ জিনিস বোঝানো শক্ত।

বলেন, আজকাল এক-এক সময়ে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, তুচ্ছ জিনিসেও কত সব দেখতে পাই। এ চোখ আমার আগে কোথায় ছিল? এই সামান্য একটা কাঠের টুকরো— সত্যিকার একটা সৃষ্টির রূপ দেখে যত আনন্দ পাই— এইটুকু কাঠের ভিতর আমি তা দেখে সেই আনন্দ পাই।

খুঁজলেই পাবে। এ চোখ সব সময়ে থাকে না। রোজ তো বাগানের রাস্তায় চলি, চোখে কিছু পড়ে না। কিন্তু যেদিন খেলনা গড়বার জন্য কাঠ খুঁজতে বের হই— টুকটাক চোখে পড়ে যায় সব-কিছু। তুলে আনি। তাকে যত্নভরে দেখি। আলোতে দেখি, অন্ধকারে দেখি। এদিক দিয়ে দেখি, ওপাশ দিয়ে দেখি। হঠাৎ এক সময়ে অদ্ভুতরূপে আমার কাছে ধরা দেয়। কোনোটাকে উটের পিঠে চড়াই— 'ভাবু' আমার মানসপুত্র, আহা, সেদিন আবার তার জিবটা পিঁপড়ে খেয়ে গেল গো— তাকে গোরুর উপর চড়িয়ে দিলুম কাবুলের কাছে পাঠিয়ে। যত্নে রাখবে সে।

বলেন, শিল্পী যে, সে শুধু ছবিই আঁকবে কেন? তার সৃষ্টি যেদিকে যে রূপে ফুটে উঠবে সেইদিকেই সে যাবে। সৃষ্টিকে ফুটিয়ে তুলবে। এক দিকে সার্থকতা না আসুক অন্য দিকে আসবে। এই যে আমি আজ পুতুল নিয়ে খেলা করছি, এ যেমন মায়ের কোলে শিশু খেলা করছে; মায়ের মন নাচছে তো শিশু মায়ের কোলে ধেই ধেই করে নাচছে।

দক্ষিণের বারান্দায় অবনীন্দ্রনাথ পুতুল গড়েন, পুতুল নিয়ে খেলা করেন। কলকাতায় এলে তাঁর কাছে যখন আসি অভিজিৎও কখনো আসে সঙ্গে। ছোট্ট অভিজিৎ কখনো-বা দু হাতের দু মুঠিতে কুকুরছানা, শালিখ পাখি থাবলে ধরে। তিনি হাসেন, বলেন, চিনেছে ঠিক, দাদা-অভিজিতের চোখ আছে।

পুতুল নিয়ে অবুদাদু-অভিজিৎ দুই শিশুতে খেলা করেন, হাসেন। আমি তফাতে দাঁড়িয়ে দেখি।

আমাদের পুতুল ছুঁতে দেন না। নিজে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান, আবার যথাস্থানে রেখে দেন। বড়ো লোভ থাকে আমারও এই পুতুলের উপরে। কিন্তু বলতে সাহস নেই। তাই অভিজিৎ পুতুল হাতে নিয়ে বারান্দা পেরিয়ে এলেই সেগুলি আমি তাড়াতাড়ি কেড়ে নিই। ওর হাতে আর ফিরিয়ে দিই না তা। ভয় হয়, যদি নষ্ট করে ফেলে।

সেবারে 'অবুদাদু'র কাছে 'বুড়ো আংলা'র গল্প শুনে অভিজিৎ বায়না ধরল তারও একটি রাঙামাটির গণেশ চাই। শান্তিনিকেতনে এসেও সে ঝোঁক যায় না।

শুনে অবুদাদু লিখলেন, তাই তো, এখন রাঙামাটির গণেশ কোথায় পাই? রাধানাথকে বললেন, আমতলি চেনো?

সে বললে, হাঁ।

—যাও তো, অভিজিৎবাবুর জন্যে একটি গণেশ আনো তো!

খানিক বাদে রাধানাথ এসে বললে, আমড়াতলার গলি ঘুরে কোথাও গণেশ পেলেম না।

কোথায় আমতলি, না, সে গেছে আমড়াতলার গলিতে। পায় কখনো?

—ওহে বাপু, আমতলি গ্রাম চেনো? যেখানে বিদুর থাকত, সেখানে হাটে মাটির গণেশ আসে। সেই একটি চাই।

—রেলভাড়া হুকুম করুন।

—টাইমটেবিল দেখি। আমতলি বলে স্টেশন নেই।

—মাস্টারমশায়, জিওগ্রাফির ম্যাপ দেখুন তো।

নামগন্ধ নেই আমতলির। হান্টার সাহেবের গ্রন্থ থেকে পেলেম ৭১ সালের বন্যাতে আমতলি গ্রাম ভাসতে ভাসতে 'উত্তুট্টি'র চরে গিয়ে ঠেকে কাদাতে বালিতে নাকানি চোবানি খেয়ে সীতার পাতালপ্রবেশ যাত্রা দেখতে জলের নীচে নেমে গেছে। একশো বছর পরে আবার ওঠবার সম্ভাবনা আছে—সিকস্তি যখন পয়স্তি হবে পয়স্তি যখন সিকস্তি হবে।

কিছুদিন পরে অবনীন্দ্রনাথ ছোট্ট একটি লাল গণেশ পাঠিয়ে দিলেন অভিজিৎকে। ছোট্ট কোনো জংলী লতার শিকড়ের অতি ক্ষুদ্র এক গণেশ। এক ইঞ্চিরও ছোটো। গণেশ বসে আছে উঁচু একটি বেদীতে তার ক্ষুদ্রতম শুঁড়টি বাঁকিয়ে। কোলে সেতার; কী, না—গণেশ বসে বসে সেতার বাজাচ্ছে। গণেশের গায়ে একটু লাল রঙ লাগিয়ে দিয়েছেন। অপূর্ব হয়েছে গণেশটি।

আসা মাত্র অভিজিৎকে গণেশটি একবার দেখিয়ে আলাদা একটি কৌটোয় ভরে তুলে রেখে দিলাম আলমারিতে অন্য পুতুলগুলির সঙ্গে।

এই গণেশটির প্রতি বিশেষ করে অভিজিতের কী এক আকর্ষণ ছিল—দেখবার জন্য প্রায়ই কান্নাকাটি করত। বলত, গণেশের বাজনা শুনব। আলমারি খুলে গণেশকে আমার হাতে রেখে তফাত থেকে দেখাতাম তাকে। সে স্থির চোখে চেয়ে থাকত। আবার গণেশ তুলে রাখতাম।

শুধু গণেশ নয়, তাঁর তৈরি অন্য খেলনাও দিতাম না অভিজিতের হাতে। আশঙ্কা থাকত, যদি ভেঙে ফেলে, যদি নষ্ট হয়ে যায়। অথচ সময় পেলেই অভিজিৎকে লুকিয়ে আমি বসে বসে দেখতাম খেলনাগুলি। দেখতাম আর ভাবতাম।

সেই কথাই একদিন লিখলাম অবনীন্দ্রনাথকে, নন্দদাও আমাকে বলেছিলেন জিজ্ঞেস করে জানতে যে, আহ্লাদী-পুতুলে আর তাঁর পুতুলে তফাত কোথায়? লিখলাম—শিশুর হাতে পুতুল ভাঙে—এতেই পুতুলের সার্থকতা। কিন্তু আপনার পুতুল কেন অভিজিৎকে দূর থেকে দেখাই, কেন তার হাতে তুলে দিতে পারি না? ভয় হয়—এ যদি ভাঙে তা হলে এমনটি আর দু বার

হবে না। একই পুতুল অনেক হয়, কিন্তু আপনার পুতুল এক-একটি অপূর্ব সৃষ্টি। তবে এগুলিকে পুতুল কেন বলা হয়? এরা তা হলে কী?

অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন, আমার পুতুলগুলো কী জানতে চাও— এরা আহ্লাদীর বোন পেহ্লাদী নয়। কেননা, এদের গড়ন-পিটন আমার দেওয়া নয়। এদের কী বলব এই কথা ভেবে এদের রহস্য ধরেছি।

এদের আমি বলি আমার সব 'কুটুম-কাটাম'। এরা আসে আমার ঘরে সুখদুঃখের ভাগ নিতে কত রূপ ধরে। নতুন নতুন কুটুম জোটে এসে যেমন, এরাও তেমনি।

কাঠামো এদের সব অদ্ভুত রসের, দেবতা ব্রহ্মার কাছ থেকে পেয়ে আসে এরা। আমি এদের কারো গায়ের কাদামাটি কোদাল দিয়ে চেঁছে সাফ করি, কাউকে ডাক্তারি করে হাত-পা জোড়া লাগাই। এরা কেউ বনবাসী, কেউ মাঠবাসী, কেউ জলবাসী কুটুম আমার; এইভাবে এদের দেখি। আমার নতুন গল্পে এদের কথা পাবে, বুঝবে, অবুদাতুর কে হয় এরা। পুতুলের সঙ্গে এদের ঢের তফাত। পুতুল তো খেলার জিনিস; কিন্তু এরা 'কুটুম-কাটাম'। কেউ এসে বলে আমার চুল ছেঁটে দাও, কেউ বলে আমার জামা তৈরি করে দাও, কেউ বলে আমার খোঁড়া-পা জোড়া লাগাও, কেউ বলে আমায় গাছে চড়িয়ে দাও।

উট এসে বলে আমি মরুভূমি পার হতে চললেম, পাখি এসে বলে আমি এই ডালে বসলেম, হাঁস বলে আমি পুকুরে যেতে চাই, ইঁদুর বলে আমি কুটকুট কাটতে চাই।

আমি খালি বলি 'আচ্ছা তাই'। আর্টের এ এক নতুন দিক, নতুন কাহিনী। নতুন রাস্তা পেয়ে গেছি। প্রকৃতিদেবীর 'কুটুম-কাটাম' এরা, যেখানেই যাই এদের ছাড়া নেই আমি, এরাও আমাকে ছেড়ে নেই। এরা সব মায়াবী-মায়াবিনীর দল, মায়ার পুতলি। তাই এরা তোমার মায়া আকর্ষণ করে। এমনি পুতুল হলে তা করতে পারত না, এরা সজীব, এদের রূপ রঙ প্রাণ মন সব আছে, তাই দিয়েই এরা ভুলিয়েছে বুড়োকেও। আমার এই দুঃখ এই সুখ, সবেরই ভাগ নিচ্ছে এরা, যা আমার অতি নিকট আত্মীয় মানুষেরা নেয় না।

লিখলেন— শিল্পের দিক দিয়ে একে বলব 'বস্তুশিল্প', কারণ এর গঠনের

মূলে রয়েছে একান্ত বন্ধুতা, 'মৈত্রীসাধনে'র এ এক সহজ দিক। তোমরা যা ফেলে দাও আমি তা কুড়িয়ে নিই, কুটুম্বিতা জমে ওঠে দিনে দিনে, এইটুকুই এ-সব গঠনের মূল্য। আর-কিছু নয়, সত্যি বলছি।

পরিশেষে লিখলেন, খেলতে শিখিয়ো অভিজিৎকে, আর সে পুতুল ভাঙবে না।

কিন্তু এ খেলা কি খেলতে পারে অভিজিৎ, না, তার মা-ই পারে?

এই কুটুম-কাটাম ছিল তাঁর অতি অন্তরঙ্গ জন। সেবারে যখন 'ঘরোয়া'র জন্য গল্প নিতে জোড়াসাঁকোর ছয় নম্বর বাড়িতে আছি, অবনীন্দ্রনাথ রোজ দু বেলা এসে গল্প বলে যান। একদিন আসতে দেরি দেখে ভাবলাম বুঝি বা শরীর খারাপ হয়েছে তাঁর। খবর নিতে ও-বাড়িতে গিয়ে দেখি তিনি বাগানের এক কোণে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, না, ও আর পাওয়া যাবে না, একেবারে গর্তে পালিয়েছে।

আমার একটু অবাক লাগল। বললাম, কী খুঁজছেন আপনি?

বললেন, একটা ইঁদুর জ্যান্ত হয়ে আমার হাত থেকে লাফিয়ে কোথায় যে পালাল! ও ঠিক গর্তে ঢুকে বসে আছে। কাল বিকেলে একটা ইঁদুর করলুম, কাঠের, এই এতটুকু। বেড়ে ইঁদুরটি হয়েছিল— কেবল লেজটুকু জুড়ে দিতে বাকি। ভাবলুম এটা শেষ করেই আজ উঠব। সন্ধে হয়ে এসেছে, ভালো দেখতে পাচ্ছিলুম না, চৌকিটা বারান্দার রেলিঙের পাশে টেনে নিয়ে ওই যেটুকু আলো পাচ্ছি তাইতেই কোনোরকমে তারের একটি লেজ যেই না ইঁদুরের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে একটা মোচড় দিয়েছি— টক্ করে হাত থেকে লেজসমেত ইঁদুর লাফিয়ে পড়ল।

কোথায় গেল, কোথায় গেল— এদিকে খুঁজি ওদিকে খুঁজি। বাদশাকে বললুম আলোটা আন তো, একটু খুঁজে দেখি কোথায় পালাল। না, সে কোথাও নেই। রাত্রে ভালো ঘুম হল না, ভোর না হতেই উঠে পড়লুম। ভাবলুম, যদি নীচে বাগানে পড়ে গিয়ে থাকে। দেখি সেখানে যত পোড়া বিড়ি আর দেশলাইয়ের কাঠি; চাকররা খেয়ে খেয়ে ফেলেছে। আমার ইঁদুরের আর সন্ধান মিলল না। ও জ্যান্ত হয়ে একেবারে গর্তে ঢুকে মজা দেখছে। কী আর করা যাবে, চলো যাই, এবারে আমাদের গল্প শুরু করি গিয়ে।

কিন্তু ওই অতটুকু তারের লেজের কাঠের টুকরোর ইঁদুর তাঁকে তিনদিন সমানে বাগানের আনাচে কানাচে ঘুরিয়েছে। দোতলায় উঠতে নামতে একবার করে কিছুক্ষণ দোতলার বারান্দার ঠিক নীচে, বাগানের খানিকটা জায়গা ঘুরে ঘুরে খুঁজতেন, বলতেন, দাঁড়াও, একবার ঘুরে দেখে যাই, যদি মিলে যায়।

এই গল্প যখন গুরুদেবকে বললাম, গুরুদেবের সে কী হো হো হাসি। বললেন, 'অবন চিরকালের পাগলা।'

গুরুদেব বলতেন, 'অবনের খেলনাগুলো দু-তিনজন করে না দেখিয়ে একটা পাবলিক একজিবিশন করতে বলিস। খুব ভালো হবে। সবাই দেখুক, অনেক কিছু শিখবার আছে। লোকের সৃষ্টিশক্তির ধারা কত প্রকারে প্রবাহিত হয় দেখ। ছবি আঁকত, তার পরে এটা থেকে ওটা থেকে এখন খেলনা করতে শুরু করেছে, তবুও থামতে পারছে না— আমার লেখার মতো। না, সত্যিই অবনের সৃজনশক্তি অদ্ভুত। তবে ওর চেয়ে আমার একটা জায়গায় শ্রেষ্ঠতা বেশি— তা হচ্ছে আমার গান। অবন আর-যাই করুক, গান গাইতে পারে না। সেখানে ওকে হার মানতেই হবে'— বলে হাসতেন গুরুদেব।

একদিন হুলস্থূল ব্যাপার। জোড়াসাঁকোর ছয় নম্বর বাড়িতে দোতলার খাবার ঘরে তখনো বসে আছি সবাই সকালবেলা, দারুণ আড্ডা জমেছে আমাদের।

লালবাড়ির সিঁড়িটা এসে শেষ হয়েছে ঠিক খাবার ঘর বরাবর। এই সিঁড়ি দিয়ে এ-বাড়িরও দোতলায় ওঠে নামে বেশির ভাগ লোক। কাঠের সিঁড়ি। গুরুদেবের মুখেই শুনেছি গল্প— হাসতে হাসতে বলেছিলেন একদিন— 'তা লালবাড়ির দোতলায় ঘর-বারান্দা উঠে গেল, সব তৈরি, দেখা গেল দোতলায় উঠবার সিঁড়িই হয় নি কোনো। তখন কোনোমতে জায়গা করে ওই কোণ ঘেঁষে কাঠের সিঁড়ি করে দেওয়া হল তাড়াতাড়ি'।

সেই কাঠের সিঁড়িতে খট্‌খট্ লাঠি ঠোকার ও চট্‌পট্ চটি জুতোর শব্দ উঠল। অতি পরিচিত শব্দ। বুঝলাম অবনীন্দ্রনাথ উঠছেন সিঁড়ি দিয়ে। কিন্তু আজকের লাঠি-চটির শব্দটা যেন কেমনতরো। মনে হল— চড়া, দ্রুত।

ছুটে গিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ালাম। অবনীন্দ্রনাথ সিগারসমেত বাঁ হাতের দু আঙুলে হাঁটুর কাছের লুঙ্গিটা আলতোভাবে তুলে ধরে ডান হাতের লাঠিটা ঠুকে ঠুকে মাথা নিচু করে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন। উঠছেন আর বলছেন, না, না, এ কখনো চুরি নয়। এ একেবারে ডাকাতি— ডাকাতি করেছে—

ঘাবড়ে গেলাম। কী হল? অন্যরাও এসে জড়ো হয়েছেন ততক্ষণে। সবাই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অবনীন্দ্রনাথ উপরে উঠে এলেন। উদ্‌বেগভরা মুখ, কাতর চক্ষু— অতি বিচলিত ভাব। প্রণাম করলাম।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, জানো, কাল আমার ওখানে ডাকাতি হয়ে গেছে। একেবারে ডাকাতি। সব লুটে নিয়ে গেছে। বলতে বলতে তিনি খাবার ঘরে এগিয়ে এলেন।

সবার মনই খারাপ হয়ে উঠল। ভাবছি কী ঘটল? কখন ঘটল? এত কাছে এ-বাড়িতে আমরা এতগুলো লোক, আর ও-বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেল টেরও পেলাম না একটু? আশ্চর্য। সবাই উদগ্রীব হয়ে উঠেছি ঘটনা শোনবার জন্য। চেয়ার এগিয়ে দিতে তিনি অত্যন্ত অশান্ত মন নিয়েই বসলেন।

অবনীন্দ্রনাথ কফি খেতে ভালোবাসেন, রোজই এ সময়ে এসে এক পেয়ালা গরম কফি খান, বারান্দায় বসে গল্পগুজব করেন; পরে ও-বাড়ি ফিরে যান।

বোঠান বললেন— একটু কফি দিই ছোটোমামা?

আঙুল নেড়ে তিনি বললেন, না-না, আজ আর কফি টফি কিছু খাব না।— আচ্ছা, দাও কফি এক পেয়ালা— দুধ চিনি না। আচ্ছা— দুধ দাও, চিনি না। না, চিনিই দাও— দুধটা বাদ দাও।

বড়ো অস্থির ভাব।

আমরা হতবাক।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, কাল সন্ধ্যাবেলা ও ঘরে যাবার সময়ে দেখে গেলুম সব ঠিক আছে। ভৈরবীকে ছোটো আলমারির উপরে বসিয়ে রেখেছিলুম, সাঁঝের আলো এসে পড়ল তার মুখে, মুখখানি যেন হাসিতে ভরে গেল। বুঝলুম, এতক্ষণে ঠিক আলোটি পেল। দুদিন ধরে আমি তাকে নানা

আলোতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছি। সব আলোতে কি সব জিনিস চোখে পড়ে? অনেক সময়ে রাত্রে ঘুমোতে যাবার সময়ে পকেটে করে সেই সেই দিনকার খেলনা নিয়ে ঘুমোই। শেষরাতের আবছা আলোতে তাদের বের করে দেখি। তা— ভৈরবীকে দেখে তো আমার মন ভারি খুশি। লক্ষ্মী-পেঁচাকেও বললুম, তা হলে তুমিও থাকো এইখানে। ওদিকে মুকুট মাথায় সিংহটা ডেকে উঠল, বললে— আমি বুঝি তবে একলাটি এই কোণে পড়ে থাকব? বললুম, দরকার নেই বাপু, তুমিও এসো এখানে।

সব কটিকে আলমারির উপরে এনে বসিয়ে দিলুম। মুকুট মাথায় সিংহটি যা হয়েছিল! সে যখন এসে আলমারির উপরে দাঁড়াল— তার সে ভঙ্গি, কী আর বলব। তাকিয়ে তাকিয়ে খানিকক্ষণ দেখে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে ঘরে গেলুম, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লুম। মনটা বড়ো খুশিতে ছিল কাল। রাতে ঘুমটাও ভালোই হল। সকালে আজ একটু অন্ধকার থাকতেই উঠেছি। বারান্দায় এলুম খোঁজ নিতে— দেখি, তারা কেউ নেই সেখানে। অ্যা— একি হল? বাদশা বীরুকে বললুম— তোরা নিয়েছিস কেউ? তারা বললে— না। বউমাদের বলি— তোমরা দেখেছ কে নিল? তারাও বললে— না। চাকরবাকরদের ধমক-ধামক দিলুম, তারাও বললে তারা কিছু জানে না।

বাগানে নেমে গেলুম তাড়াতাড়ি। ছেলেদেরও নিয়ে গেলুম, বললুম— খুঁজে দেখ সবাই মিলে, কী জানি যদি কেউ ফেলে দিয়ে থাকে? নিজেও কত খুঁজলুম— কোনো নিশানা পেলাম না। কি করে পাব? ডাকাতি হয়ে গেছে, লুটে নিয়ে গেছে। একি আর পাব কখনো?

লাঠিখানা হাতেই ধরা ছিল, উঠে পড়লেন। বললেন, মনটা নিশ্চিন্ত হচ্ছে না। ওদের খুঁজে বের করতেই হবে। আহা! তোমাকেও যদি দিয়ে দিতুম তবে থাকত— বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

কয়েকটা বাঁশের গুঁড়ি শান্তিনিকেতন থেকে এনে দিয়েছিলাম তাঁকে কুটুম-কাটাম গড়বার কাজে লাগতে পারে ভেবে। বাঁশের গুঁড়ি খুবই শক্ত জিনিস। তা দিয়ে কুটুম-কাটাম গড়া সহজসাধ্য নয়। তবুও অতি কষ্টে অতি যত্নে কয়দিন থেকে তাই দিয়ে— যে ভাবে ধরা দিয়েছে, সেই রকম কুটুম-কাটাম গড়ছিলেন। রোজই একবার করে গিয়ে সেদিনের গড়া সৃষ্টি

দেখে আসি। কাল বিকেলেও দেখে এসেছি বাঁশের গুঁড়ির ভৈরবীকে। সিংহ লক্ষ্মীপেঁচা আগেই হয়ে গিয়েছিল।

এত কষ্টের তৈরি জিনিস এভাবে নষ্ট হল ভেবে দুঃখ হতে লাগল।

সারাদিন বাড়িসুদ্ধ লোক মিলে তল্লাশ চলল। কোনো হদিস মিলল না। বিকেলে আজ আর এলেন না এ-বাড়িতে অবনীন্দ্রনাথ।

পরদিন সকালে কাঠের সিঁড়িতে আবার সেই পরিচিত শব্দ— লাঠি আর চটিজুতোর। ছুটে গেলাম। দেখি, তাঁর মুখভরা হাসি। হাতে ভৈরবী, সিংহ আর লক্ষ্মীপেঁচা। বললেন, কাল সারাদিনের পর বাদশাই সন্ধান পেল এদের। তেতলার চিল-ছাদের কার্নিশের উপর পাওয়া গেছে সিংহকে, ছাদের কোণে পড়ে ছিল ভৈরবী, আর পেঁচা ছিলেন বাগানে পড়ে, ইটপাটকেলের আবর্জনার স্তূপে। সিংহের মাথার মুকুটটি ভেঙে গেছে। শুনলাম গুটিকয় বানর দেখা দিয়েছে কয়দিন হল। এ কীর্তি তাদের।

অবনীন্দ্রনাথ শিশুর মতো খুশির হাসি হাসেন আর বলেন— দেখলে, বানরগুলোও বুঝেছে যে এগুলো মজার জিনিস। তাই এদের নিয়ে খানিক খেলাধুলো করে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। এই নাও— এদের তুমিই রেখে দাও। বলে, তিনি সেগুলি আমার হাতে দিয়ে কৌচে গা এলিয়ে পরম নিশ্চিন্তমনে চুরুট ধরালেন।

অবনীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর জন্মদিনে একটা বড়ো রকমের উৎসব হয়, দেশের লোক অবনীন্দ্রনাথকে সম্মান দেয়, এই ছিল রোগশয্যায় গুরুদেবের ইচ্ছা। গুরুদেব বলতেন, অবন কিছু চায় না, জীবনে চায় নি কিছু। কিন্তু এই একটি লোক, যে শিল্পজগতে যুগপ্রবর্তন করেছে, দেশের সব রুচি বদলে দিয়েছে। তাই বলছি, একে যদি আজ দেশের লোক বাদ দেয় তবে সব বৃথা।

দেশের লোক আয়োজন করবেন অবনীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের; কিন্তু যাঁকে নিয়ে উৎসব তিনি যদি আসতে রাজী না হন তবে? আগে তাঁর অনুমতি চাই যে।

কে যাবে তাঁর কাছে প্রস্তাব নিয়ে? তাঁকে নিয়ে এ-সব আয়োজন-উৎসবে অবনীন্দ্রনাথের ঘোরতর আপত্তি। কিন্তু তাঁকে বলতে তো হবে? তাঁর মতও নিতে হবে।

কেউ কেউ এলেন এগিয়ে এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে। তাঁরা দোতলায় উঠেছেন কি, অবনীন্দ্রনাথ তেড়ে উঠলেন। তাঁরা বললেন, একটা কথা ছিল।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, আগে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামো, তার পরে তোমাদের কথা শুনব।

এর পরে আর কেউ সাহস করেন না এগোতে। অথচ গুরুদেব চাইছেন এবারে বিশেষভাবে অবনীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব হয়।

শেষ পর্যন্ত নন্দদাকে পাঠিয়ে দিলেন গুরুদেব কলকাতায়। গুরুদেব তখন ছিলেন শান্তিনিকেতনে।

নন্দদা জোড়াসাঁকোয় এলেন। অবনীন্দ্রনাথ বারান্দায় আপন কৌচে বসে কুটুম-কাটাম গড়ছেন, মুখে মোটা চুরুট। অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতেন, কি, কুটুম-কাটাম গড়তেন— মুখে চুরুট ধরা থাকত। প্রথমে চুরুটটা একবার ধরিয়েই নিতেন, কিন্তু তা নিবে ঠাণ্ডা হয়ে থাকত। তবে, মুখে চুরুটটি ঠিকই ধরা থাকত।

জোড়াসাঁকোর এ-বাড়ির সিঁড়ি ছিল দেখবার মতো। চওড়া কালো কাঠের সিঁড়ি, পাঁচ-সাতজন পাশাপাশি ওঠা যায় নামা যায়। এই সিঁড়ি দিয়ে উঠেই মস্ত লম্বা এক 'হল্' ঘর, পাশেই সেই বিখ্যাত দক্ষিণের বারান্দা।

আমি অবনীন্দ্রনাথের কাছে বসে বসে কুটুম-কাটাম গড়া দেখছিলাম, আমার মুখ ছিল 'হলে'র দিকে খানিকটা। 'হলে' বড়ো বড়ো খোলা দরজা দিয়ে দেখলাম নন্দদা ঢুকলেন, খানিক আগুপিছু করলেন, শেষে বারান্দায় এলেন। অবনীন্দ্রনাথ যেখানে বসে ছিলেন তার অনেকটা দূরে একটা নিচু মোড়া টেনে বসলেন।

অবনীন্দ্রনাথ চশমার ফাঁক দিয়ে একবার দেখলেন নন্দদাকে। বুঝলেন, নন্দদা কেন এসেছেন এখানে। নন্দদাও দেখলেন অবনীন্দ্রনাথ বুঝে নিয়েছেন তাঁর আসার কারণ।

দুজনেই চুপচাপ।

অবনীন্দ্রনাথ একমনে পুতুল গড়তে লাগলেন। মুখের চুরুট অনেক আগেই নিবে গেছে। ওদিকে নন্দদাও তেমনই বসে একবার করে মুখ তুলে

একটু তাকান আবার মাথা নামিয়ে নেন। কিছু যেন বলতে চান, সুবিধে পান না। বসে বসে একসময়ে নন্দদা সেখানেই মাটিতে হাত ঠেকিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানিয়ে এক পায়ে দুপায়ে সরে গেলেন। আমি আগাগোড়াই দেখছিলাম সব। যাবার সময়ে নন্দদা আমাকে ইশারায় বলে গেলেন: 'আমি পারব না বলতে, যা বলবার তুমিই বোলো।'

নন্দদা চলে যেতে হাতের পুতুল রেখে দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ হাসলেন, বললেন, মজাটা দেখলে? কিছু বলতেই দিলুম না নন্দলালকে। বলে, দেশলাই জ্বালিয়ে চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন আর মিটিমিটি হাসতে থাকলেন।

গুরুদেব এলেন কলকাতায় শেষবারে। এসেই জিজ্ঞেস করলেন, অবনের জন্মোৎসবের আয়োজন কতটা এগোলো?

গুরুদেবকে বললাম সব ব্যাপারটা।

রবিকা এসেছেন, সকালবেলা অবনীন্দ্রনাথ এলেন তাঁকে দেখতে। গুরুদেব এক ধমক দিলেন অবনীন্দ্রনাথকে— মা যেমন দেন তাঁর বেয়াড়া ছেলেকে। বললেন, অবন, তোমার এতে আপত্তির মানে কী? দেশের লোক যদি চায় কিছু করতে— তোমার তো তাতে হাত নেই কোনো।

অবনীন্দ্রনাথ আর কি করেন? ছোটো ছেলে বকুনি খেলে যেমন মুখের ভাবখানা হয় তেমনি মুখখানা হয়ে গেল তাঁর। মাথা চুলকে বললেন, তা আদেশ যখন করছ— মালাচন্দন পরব, ফোঁটানাটা কাটব— আর কোথাও যেতে পারব না কিন্তু— বলেই অবনীন্দ্রনাথ গুরুদেবকে প্রণাম করে পড়ি কি মরি একরকম ছুটেই সে ঘর ছেড়ে পালালেন। পাছে রবিকা আরো কিছু আদেশ করে বসেন।

দেখে গুরুদেব হেসে উঠলেন, বললেন, পাগলা বেগতিক দেখে পালালো।

এই ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ।

গুরুদেব চলে যাবার পর অবনীন্দ্রনাথ এসে আমাদের তুলে না ধরলে আমরা দাঁড়াতে পারতাম না, এ কথা সত্যিই। সে যা দিন গেছে আশ্রমের, যেন চতুর্দিক ফাঁকা— শূন্য, নিরানন্দ সব।

সেই সময়ে দেখেছি অবনীন্দ্রনাথের এক রূপ। বুকভরা বেদনা সামলে

রেখে সবাইকে যেন হাত ধরে ধরে তুলে দিলেন। নিজে হাসলেন, সকলের মুখে হাসি ফোটালেন।

গুরুদেবের পর আশ্রমের আচার্যদেব হয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ। গুরুদেবকে হারাবার দুঃখ খানিকটা মিটবে অবনীন্দ্রনাথকে কাছে পেলে। তারই আয়োজন হল।

অবনীন্দ্রনাথ তখন জোড়াসাঁকোয়। বললেন, আমি তো মাটির ঢেলা মাত্র। যাঁর তাপে আমার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হত তিনি চলে গেছেন। কোথায় যাব এখন আর? চলব কিসের জোরে? আমাকে আর কোথাও চলতে বোলো না।

তার পর জোড়াসাঁকো চিরদিনের মতো ছেড়ে তিনি বেলঘরিয়ার 'গুপ্ত-নিবাসে' উঠে গেলেন। সেই ফাল্গুনে আবার গেলাম সেখানে, আবার প্রার্থনা জানালাম আশ্রমে আসবার জন্য।

এবারে আর সঙ্গে সঙ্গে 'না' বললেন না। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন, বললেন— যেতে আমাকে হবে একবার। যেটুকু শক্তি আছে তা থাকতেই যাওয়া ভালো। বেশ চলো। আজই। এখনি।

ট্রেন ধরবার সময় বেশি নেই। আমার স্বামী ইতস্তত করছিলেন, পরের ট্রেন বা পরের দিন গেলে সব দিক দিয়ে সুবিধে হয়।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, না, মন হয়েছে যাব, আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। বলে, তৈরি হয়ে নিতে ভিতরে উঠে গেলেন।

যেটুকু সময় ছিল তারই মধ্যে যতটুকু ব্যবস্থা করা সম্ভব তাই করা হল। জোড়াসাঁকোয় বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে ফোন করে বলা হল, যে করে হোক শান্তিনিকেতনে খবরটা পৌঁছে দিতে, যে আচার্যদেব আসছেন আজ।

অবনীন্দ্রনাথ সঙ্গে নিলেন ছোট্ট একটি সুটকেসে খানকয়েক জামাকাপড় শুধু। আর কিছু নয়।

—লোকজন?

বললেন. তীর্থে যাচ্ছি, একলাই যাব; বোঝা বাড়াব না।

কোনোরকমে দুপুর দেড়টার গাড়ি ধরা গেল। ট্রেন ছাড়ল। অবনীন্দ্রনাথ জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, চোদ্দ বছর আগে এই পথে গিয়েছিলুম, তখন গিয়েছিলুম যেমন বাপের কোলে ছেলে

যায়। আর আজ। আজও যাচ্ছি সেখানে ; কিন্তু সে শান্তিনিকেতন তো ফিরে পাব না— সইতে পারব তো ?

বোলপুর স্টেশনে নন্দদা উপস্থিত ছিলেন কিছু ছাত্রছাত্রী নিয়ে। তাড়াতাড়িতে সবাইকে খবরও দিয়ে উঠতে পারেন নি। হাতের কাছে কলাভবনের যে কয়জনকে পেয়েছেন নিয়ে এসেছেন।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই অবনীন্দ্রনাথকে চেয়ারে বসিয়ে মালাচন্দন পরিয়ে ছেলেমেয়েরা গান গাইল—

সবারে করি আহ্বান—
এসো উৎসুকচিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ ॥
হৃদয় দেহো পাতি, হেথাকার দিবারাতি
করুক নবজীবনদান ॥

সন্ধ্যারাত। মোটর আশ্রমের ভিতর দিয়ে উদয়নে এসে থামল। বোঠান এগিয়ে এসে অবনীন্দ্রনাথকে গাড়ি থেকে নামালেন। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, প্রতিমা, আমার সেই ঘর— সেই ঘর কোথায় ? যে ঘরে সেবারে এসে ছিলুম ?

সেই ঘরই সাজিয়ে রেখেছিলেন বোঠান তাঁর জন্য। তিনি হুড়মুড় করে একরকম প্রায় ছুটেই সেই ঘরে ঢুকে, দু হাত তুলে বলে উঠলেন, এই তো আমার সেই ঘর !

পরদিন ভোরে সূর্য উঠবার অনেক আগেই উঠলাম। অবনীন্দ্রনাথের ঘরে গিয়ে দেখি তিনি ঘরে নেই। মহাদেবের কাছে জানলাম, রাত সাড়ে তিনটেয় উঠে খানিক ঘরের ভিতরে অপেক্ষা করে চার দিক ফরসা না হতেই তিনি বেরিয়ে পড়েছেন।

এ-বাগান সে-বাগান খুঁজে দক্ষিণের বাগানে নাগকেশরের ঝোপের কাছে পেলাম তাঁকে। বললেন, অনেকক্ষণ উঠেছি। উঠেই রবিকার বাড়িগুলো একে একে প্রদক্ষিণ করলুম। শ্যামলী প্রদক্ষিণ করে অনেকক্ষণ সেখানেই একপাশে বসে ছিলুম ; বড়ো ভালো লাগল। রবিকার বাড়িগুলো যেন যত্নে সাজিয়ে রাখা হয়। যেমন আমাদের মন্দির— এও তাই।

এত বড়ো একটা শক্তি— এমন একটি মহাপ্রাণ, একি লুপ্ত হয়ে যায় কখনো ? হতেই পারে না। তাঁর কীর্তির স্বাক্ষর থেকে যাবেই। তিনি বর্তমান থেকে যা দিয়ে গেছেন, তাঁর অবর্তমানেও তোমরা তা পাবে।

আশ্রমে নতুন আচার্যদেব এসেছেন, তাঁর শুভাগমন উপলক্ষে আম্রকুঞ্জে সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছে। আশ্রমবাসী সবাই এসে মিলেছি আম্রকুঞ্জের ছায়ায়। অনেকদিন পরে যেন এক আপনজনকে পেয়েছি আমরা। সকলের মনেই একটা সন্তোষ ভাব। একটা কী 'পাচ্ছি পাব' ভাব। যেন কী একটা অভাব পূরণ হবে এইবার।

ঝিলিমিলি আলোছায়ায় ভরা আম্রকুঞ্জ। সেই আলোছায়া আলপনার জায়গা জুড়ে যেন সাগরবুকে রবির কিরণ ঝিকমিক খেলছে।

অবনীন্দ্রনাথ বেদীতে বসলেন। আশ্রমের মেয়েরা অর্ঘ্যথালা হাতে নিয়ে গীত-গানের ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে তাঁকে মালাচন্দন দিলে। গান হল। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় মন্ত্রপাঠ করলেন।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, সেবার এসেছিলুম, সেও এইরকম সময়ে, এই আমগাছেরই তলায়। সে সময়ে আমাদের গুরুদেব যিনি, তিনি কয়েকটি কথা বলেছিলেন— ভুলি নি আমি কোনোদিন। আর আজ আমি যে কথা বলব তোমরাও ভুলবে না আশা করি।

গুরুদেব বলেছিলেন, অবন, আমি যখন না থাকব, তুমি এসে এদের ভার নিয়ো।

তখন ভয় পেয়েছিলুম, বলেছিলুম— তা পারব না, হবে না আমার দ্বারা। তুমি না থাকলে আমি কি আসতে পারব? কিন্তু পারলুম তো— এলেম তো সেই রাস্তা ধরেই। এসেছি এখানে। এটা তাঁর ইচ্ছে ছিল কি না, তাই এমন হল।

যিনি চলে গেছেন তাঁর জন্য শোক করে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া ধর্মে নিষেধ। তাই তো আমি প্রথম কথাই বলে পাঠিয়েছিলুম, আশ্রমের উৎসবগুলি যেন বন্ধ না হয়। উৎসব চাই। মনের উৎসব বন্ধ হলে কাজ চলবে কী করে? এ পৃথিবীতে কত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কত লোক আসছে, কত লোক যাচ্ছে। দুঃখ ভেবে কি হবে? উপর থেকে তাঁর আশীর্বাদ পড়বে। দুঃখ ভেবো না কিছু। অমৃত পরিবেশন করে গেছেন তিনি এখানে— এই ভেবে নির্ভয় হও— আনন্দে থাকো।

জেনো, তোমরা সব তাঁরই পরিবার। অত বড়ো মহাপ্রাণের এই পরিবার— তাদের ভার আমি নেব, তাদের আপন করে পাব— এত পুণ্য নেই

আমার। তবে ভরসা আমার, আশীর্বাদ আছে গুরুর, আর আছে তোমাদের শুভেচ্ছা।

অবনীন্দ্রনাথ থামলেন কিছুক্ষণ। বললেন, একটা কথা মনে রেখো তোমরা, এই আশ্রয়নীড়— নিজের হাতে তিনি এই নীড় তৈরি করে গেছেন তোমাদের জন্য। এ যেন না ভাঙে কোনোদিন। তা হলে এত বড়ো দুর্দৈব জগতে আর ঘটবে না। মহাকবির মহাপ্রাণের মানসসৃষ্টির চমৎকারী এই রূপ। এ বস্তু রক্ষা করবার একমাত্র উপায় একপ্রাণ হয়ে একদিকে একভাবে সবাই চলো একসঙ্গে। 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' এই মন্ত্র ধরে থাকো।

বললেন, নিরানন্দ হওয়া কেন? সেই লোক নেই আর, এ কথা তো মন নেয় না আমার— বলতে বলতে তাঁর গলা ধরে এল। বললেন, হায়! তোমাদের যে সান্ত্বনা দেব সেই আমিও তো কাঁদি।

বললেন, আনন্দে থাকো তোমরা। এই আমবাগান এই আলোছায়ায় আমাদের মাঝে যিনি একদিন ছিলেন তিনি নেই এ কে বলবে? গানে কথায় যে তাঁরই সুর পৌঁচচ্ছে— মিলছে এসে যারা আছি তাদের সুরে। উথলে চলেছে অফুরান প্রাণের ধারা। আনন্দে গেয়ে যাবে। এই স্থানটি থেকে কবি দিয়ে গেছেন আনন্দের উৎসবে মহা আহ্বান সকলকে সমানভাবে। তাঁর এ আমন্ত্রণ চিরদিনের মতো— ভুলো না কোনোদিন।

অবনীন্দ্রনাথ উঠলেন। শালবীথির ভিতর দিয়ে যেতে যেতে বললেন— যতই মনকে সামলাতে চেষ্টা করি, পারি নে। ভিতরটা থেকে থেকে কেমন করে ওঠে। আমার অবস্থা হয়েছে যেমন মৌমাছি মধু খেয়ে মৌচাক থেকে চলে গিয়ে আবার সেই চাকে ফিরে এসেছে।

অবনীন্দ্রনাথ আপন ব্যথা আড়াল করে ফেললেন। আমাদের মুখে হাসি ফোটাতে নিজেকে ঢেলে দিতে লাগলেন। কতদিন যেন হাসতে পাই নি আমরা। যেন এখন হালকা লাগছে সবারই। অবনীন্দ্রনাথকে ছাড়ছি না মোটে। তিনি উঠছেন বসছেন চলছেন বেড়াচ্ছেন— আমরা ভিড় করে ঘিরে আছি তাঁকে।

একদিন গাছের তলায় তলায় তখন ক্লাস বসেছে, অবনীন্দ্রনাথ ছায়ায় ছায়ায় চলছেন, দেখছেন; ক্লাসের ছেলেমেয়েরাও দেখছে তাঁকে। তিনি ক্লাসের কাছাকাছি যেতেই ছেলেরা লাফিয়ে ওঠে, বলে 'ছুটি আমাদের, গল্প

শুনব।' অবুদাদুকে দেখেই ছোটো ছেলেমেয়েদের গল্প শোনবার শখ জাগে। তখন কি আর বই খুলে পড়ায় মন বসে ?

অবনীন্দ্রনাথ মাস্টারমশায়ের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়েন, মানে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেন— কি বলেন পণ্ডিতমশায় ?

পণ্ডিতমশায় আর কি বলবেন, হাসিমুখে তিনিও ঘাড় নাড়েন— ওই ঘাড় নাড়িয়েই জানান— আচ্ছা।

অবুদাদু তখন ছেলেদের দিকে ফিরে ঘাড় নেড়ে চোখ টিপে জানান— 'তবে আচ্ছা।'

এই 'আচ্ছা' আর 'তবে আচ্ছা' করতে করতে চোখ টিপে টিপে ক্লাসের পর ক্লাস ছুটি দিয়ে চললেন তিনি ; আর ছেলেমেয়েরা হৈ-হৈ করে বই খাতা বগলদাবা করে আসনখানা পিঠে ফেলে পিছু ধরল তাঁর। দেখতে দেখতে সব ক্লাস ছুটি হয়ে গেল। মস্ত একটা ভিড় জমল। মাস্টারমশায়রাও সেই ভিড়ে সমান উৎসাহে মিলে গেলেন।

এ এক দেখবার মতো দৃশ্য। আগে আগে চলেছেন অবনীন্দ্রনাথ, পিছনে পিছনে স্কুলের ছোটো ছেলেমেয়ের দল,.চলেছে কলেজের ছাত্রছাত্রী, চলেছেন শিক্ষকমণ্ডলী, চলেছেন তাঁদের ঘরণী গৃহিণী সব কলরব করতে করতে।

দেখে মনে হচ্ছিল— এই তো, এইখানেই তো আশ্রমের প্রাণ। এমনি করেই তো 'শারদোৎসবে' ছুটির ডাক দিয়েছিলেন ঠাকুরদাদা। কাজের ফাঁকে জীবনের ফাঁকে এইরকমই তো সে ছুটির আহ্বান।

'কোথায় বসি, কোথায় বসি'— অবনীন্দ্রনাথ আমবাগানে গিয়ে বসলেন পুরো দলটি নিয়ে।

ছোটোদের আবদার সকলের আগে। গল্প শোনাতে হবে।

অমনি— কী গল্প শুনবে ? আচ্ছা শোনো তবে। এক ছিল দুয়োরানী ; দুয়োরানী কে জানো ?— গল্প শুরু হয়ে গেল :

দুয়োরানী আর তার ছেলে রাজপুত্তুর— সে রাজপুত্তুর সবে জন্মাল এই আমবাগানে, এই মুহূর্তেরই সৃষ্টি। এ সৃষ্টির কৌশল বড়োদের অভিভূত করে, ছোটোদের ভোলায়। মুখ দিয়ে যে যে কথা বেরিয়ে পড়ছে সেই সেই কথাকে ধরে গল্প হয়ে যাচ্ছে। রাজপুত্তুরের রাজত্ব চাই, সৈন্যসামন্ত চাই, রাজকন্যা চাই। মা দিলেন এক কাঠের গোরু, সেই গোরুর পিঠে চড়ে

চললেন রাজপুত্তুর। দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে। কত নদী পার হলেন— অজয়, বিজয়, কোপাই। পার হলেন কত মাঠ প্রান্তর বন অরণ্য। এসে পড়লেন এক মরুভূমির সামনে। রাজপুত্তুরের কাঠের গোরুর শিং ভেঙে গিয়ে মরুভূমিতে এসে সে উট হয়ে গেল।

অবনীন্দ্রনাথ বলে চলেছেন: রাজপুত্তুর সেই উটের পিঠে চলেছেন দিনের পর দিন মরুভূমির উপর দিয়ে। মাঝে মাঝে উটের গায়ে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঘুণ পোকা মারে। উট চলেছে খটখট-খটখট— হেলছে দুলছে— দোলার সাথে সাথে আকাশের তারাগুলি এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে, ওদিক থেকে এদিকে আসছে।

এ বর্ণনা শুধু কানে শুনি না, চোখে দেখি। দেখি নিজেই উঠে বসেছি উটের পিঠে, চলার তালে তালে হেলছি দুলছি— আকাশের তারাগুলোও দোল খাচ্ছে— এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক।

ছেলে-বুড়োকে একসঙ্গে একসুরে সেই তেপান্তরের মাঠে নিয়ে ছেড়ে দেন অবনীন্দ্রনাথ। এমনই জাদু তাঁর গল্প বলায়। দু চোখ বড়ো বড়ো করে মেলে চেয়ে থাকি তাঁর দিকে। ভাষায় তিনি যত-না বলেন, বলেন বেশি ভাবে, হাতের আঙুলের ভঙ্গিতে। তাঁর আঙুলের ভাষা যে না দেখেছে সে বুঝবে না এ কথা।

মাত্র চার দিন রইলেন আশ্রমে অবনীন্দ্রনাথ। এ কয়দিন কথায় গল্পে হাসি গানে চার দিকে যেন সাড়া জাগিয়ে দিলেন। যেন থিতিয়ে পড়া আনন্দের ঢেউটা হাতে করে নেড়ে দিয়ে গেলেন।

শিল্পীদের বললেন, ওরে, তোরা সব ছবি এঁকে চল, ছবি এঁকে চল। চোখের দেখা মনের দেখা মিলিয়ে ছবি আঁকতে থাক্।

গাইয়েদের বললেন, রোজ মনের আনন্দে গান করিস— সেখানে পৌঁছবে ধ্বনি। দেখবি প্রাণে শান্তি পাবি।

কর্মকর্তাদের বললেন, কাজে মন দাও, মন বসাও; কাজের মধ্যে ডুব দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে, পেয়ে যাবে মনের বল।

শ্রীনিকেতনে পাকুড়তলায় শিক্ষককর্মী ছাত্রছাত্রী সবাইকে নিয়ে বসলেন, বললেন, মনে রেখো, এ ফসল পার্বতীর সংসারে যাবে। সেরা ফসল ফলাতে হবে তোমাদের। যেমন-তেমন করে চাষ করলেই হবে না।

যাবার আগের দিন সন্ধেবেলা উদয়নের সামনের বারান্দায় 'ফাল্গুনী' অভিনয় হল। অবনীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে অভিনয়, তাঁকে দেখাবার জন্য অভিনয়, জমাট অভিনয়। গানে, কথায়, নাচে, ছেলে-বুড়ো নবীন-প্রবীণে মিলে এক অভিনয়ে সব কিছুর সমাবেশ। অবনীন্দ্রনাথকে সামনে পেয়েছে; সকলে মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে অভিনয় করছে। অভিনয় দেখতে দেখতে অবনীন্দ্রনাথের মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, গানের তালে তালে দেহ দুলছে। শেষ গান হল—

ওরে আয় রে তবে, মাত রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে॥
পিছন-পানের বাঁধন হতে চল্ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন-হাওয়ায় ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে॥
বাঁধন যত ছিন্ন করো আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে॥
অকূল প্রাণের সাগর-তীরে ভয় কী রে তোর ক্ষয় ক্ষতিরে।
যা আছে রে সব নিয়ে তোর ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অনন্তে॥

অবনীন্দ্রনাথ আর স্থির হয়ে থাকতে পারলেন না। বাসন্তী রঙের চাদরখানা মাটিতে লোটাতে লোটাতে ছুটে চললেন স্টেজের দিকে— যোগ দিতে এ নাচে।

স্টেজের কাছে সিঁড়িতে পা দিয়েছেন, বাতি 'ফিউজ' হয়ে গেল। সে জিনিস আর দেখতে পেলাম না।

পরদিন সকালের ট্রেনে কলকাতায় ফিরবেন, লাইব্রেরির সামনে গৌর-প্রাঙ্গণে জড়ো হয়েছে আশ্রমবাসী সকলে এসে তাঁকে বিদায় জানাতে। লাইব্রেরির বারান্দায় অবনীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে। ছাত্রছাত্রীরা গান ধরল—

আমাদের শান্তিনিকেতন
সে যে সব হতে আপন।

অবনীন্দ্রনাথ বারান্দা হতে নেমে ভিড়ের মধ্যে মিশে দাঁড়ালেন, বললেন, আমাকে দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমাকে শোনানো হচ্ছে 'আমাদের শান্তি-নিকেতন'। জানো, এই শান্তিনিকেতনের কাঁচা আম তোমাদের চেয়ে আমি আগে খেয়েছি। বলে, তিনিও সবার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠলেন—

আমাদের শান্তিনিকেতন
সে যে সব হতে আপন।

এর পর অবনীন্দ্রনাথ আরো কয়েকবার শান্তিনিকেতনে এসেছেন। কখনো কম কখনো বেশিদিন থেকেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ আশ্রমে এলেইএকটা প্রাণময় সাড়া জাগত তাঁকে কেন্দ্র করে। বোঠান অবাক হতেন, হাসতেন; বলতেন আশ্রমে ছোটোমামার এ এক আলাদা রূপ। নিজেকে যেন ঢেলে দিয়েছেন। ছোটোমামা এমনভাবে ধরা দেন নি তো কখনো, ছোটো বড়ো সকলের কাছে এমন করে। বড়োরা তো ভয়ে তাঁর কাছেই এগোতে পারতেন না; এই তো দেখে এসেছি বরাবর।

অবনীন্দ্রনাথও বলতেন, রবিকা চলে গেলেন, আর কেন? মুখোশটাও খুলে ফেলে দিলুম। থাক্ এখন এমনই।

মুখোশ পরে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ছবি এঁকে গেছেন, ছবি আঁকিয়ে গেছেন। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথই ধরা দিলেন সকলের কাছে। মানুষ অবনীন্দ্রনাথ লুকিয়ে থাকতেন মুখোশের আড়ালে।

এখানে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের 'অবুদাদু' তিনি। আশ্রমে ঘুরে বেড়াতেন যখন, ছোটো ছেলেমেয়ের দল তাঁকে দেখতে পেলেই কোথা কোথা থেকে ছুটে ছুটে আসত, তাঁকে ঘিরে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলত। অবুদাদুকে একবার তারা দেখতে পেলেই হত।

অভিজিৎও সেই ছোটোর দলেরই একজন। একদিন সে শিশুবিভাগের ঝোলা-দোলনায় দুলছিল বিকেলবেলা সঙ্গীদের নিয়ে; দেখল অবুদাদু চলেছেন পথ দিয়ে। দেখামাত্র দোলনা থেকে নেমে এক ছুট; অবুদাদুর কাছে যাবে। সামনে ছিল কাঁটা তারের বেড়া; ছোটার মুখে যেই মাথা গলিয়েছে বেড়ার ফাঁকে, লোহার তীক্ষ্ণ কাঁটা মাথায় বিঁধে একটা লম্বা দাগ কেটে দিল সঙ্গে সঙ্গে। বেগে আসছিল, সেই ধাক্কায় কাঁটাটা যতখানি বিঁধেছে ততখানি গভীরভাবেই কেটেছে কপালের কাছ হতে মাথা বরাবর একটানা একটা নিখুঁত লাইনে।

অভিজিৎকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সেলাই করানো হল, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা

হল। সেই মাথায় মুখে জড়ানো পটি বাঁধা নিয়েই হাসতে হাসতে অবুদাদুর কাছে এল ; কয়দিন অবুদাদুর সঙ্গে কুটুম-কাটাম গড়ল। কাটা ঘা যখন শুকোল, মাথায় স্থায়ী একটা সিঁথি হয়ে রইল। তখনো অভিজিৎ ছোটো, তাকে চুল আঁচড়ে দিতে হয়, উলটো দিকে সিঁথি কাটতে গেলেই মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে চুল এলোমেলো করে দিত। ওই সিঁথি রেখেই চুল আঁচড়ে দিতে হবে তার। বড়ো হয়েও বহুকাল সেই সিঁথি ছাড়া সিঁথি কাটত না সে।

এমনিই ছিল অবুদাদুর আকর্ষণ ছোটোদের সবার কাছে।

যখন-তখন অবুদাদুর কাছে আবদার 'অবুদাদু গল্প বলো'। তিনি খুশি হয়ে গল্প বলতেন। নিত্য নতুন নতুন গল্প। কত গল্পই যে বলেছেন তাদের।

অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে আসত, আশ্রমে এমন ছাত্রছাত্রী ছিল না যে তার অটোগ্রাফ খাতায় অবুদাদুকে দিয়ে না আঁকিয়ে নিয়েছে। আঁকা তো চাইই, আবার লেখাও চাই। যদি লিখতেন—

'ছবি নয়
কথা নয়
এই শুধু নাম—
সেইটে দিলাম।' তা হলে হত না।

ছড়ার নীচে শুধু নিজের নাম সই করেই রেহাই পেতেন না। এঁকেও দিতে হত তাঁকে। তাদের খাতায় কত যে ভালো ভালো ছবি এঁকেছেন আর ছড়া লিখেছেন! দু-চারটি ছড়া মনে পড়ে, ছবিও অনেকগুলো চোখে জাগে। চোখের দেখা বোধ হয় টিঁকে থাকে বেশি।

ছোটোদের নিয়েই তিনি মজা পেতেন। লিখলেন—

ছাই আর ভস্ম, তাতে হয় নস্ত
জল আর মাটি, ওতে আঁকি খাঁটি ;

তার পর— পাশে ছবি আঁকলেন, এঁকে লিখলেন,

আর ছবি ?
তোমরা বল খাতা করলে মাটি।

ছেলের দল উপুড় হয়ে থাকে— 'কী লেখা হয়, কী আঁকা হয়।' কারো খাতায় আগে লেখেন পরে আঁকেন, কারো খাতায় আগে আঁকেন পরে লেখেন। তাঁর লেখার মধ্যে ছবি, ছবির মধ্যে লেখা সমানভাবে ফুটে ওঠে—

চাঁদের আলো
নৌকো জল
এই ধরে ধরে চল।

•

উঠল সূর্য
উড়ল পাখি
আমি কেন ঘরে থাকি।

•

আমি যে স্কুলবয়
পকেটে ফুল আর-কিছু নয়।

•

কলম আছে কালি নেই
লাইন আছে কলার নেই।

•

রঙ মেলেছে চোখ দুটি
ফুল বলে হায় আমি পড়িব
মাটিতে লুটি।

•

পুতুল আত্মভোলা
তাকের উপর তোলা।

একটি ছেলে বড়ো একটা খাতা এনেছে, অবুদাদুকে দিয়ে বড়ো ছবি আঁকিয়ে নেবে। তিনি আঁকলেন। লিখলেন—

খাতার পাতা তো নয় গড়ের মাঠ
কলমটা ভাবে ডরাই কিসে
পাই নে হিসেব
মন-অশ্ব ভাবে দিশে ধরতে এ পাতের
আমি হারি— এ বড়ো হল 'খিরের'।

এক-একটি খাতায় লেখা আঁকা হয় আর ছোটোর দল উল্লাসে কলরব করে ওঠে। সবার খাতার জন্যই, সবাই খুশি হয়। এ নয় যে এর খাতায় বেশি

ভালো হল, আমার খাতায় নয়। অবনীন্দ্রনাথের ভাব ও ভঙ্গির জাদুতে একই খুশি ছড়িয়ে পড়ে সকলের মনে। তিনি যে খেলা করতে জানেন।

একজনের খাতায় ছবি আঁকলেন, পরে ছবির বর্ণনা লিখলেন—

গাছের তলায় ঘর, ঘরের ধারে গাছ
খানা ডোবায় জল, জলের ধারে মাছ।

লিখে এমন কৌতুকভরা চোখে তাকালেন তাদের দিকে, তারা হৈ-চৈ করে হেসে উঠল। অবুদাদুর ওই চাহনিতেই তারা ধরে নিয়েছে তাঁর কৌতুক। জলে মাছ না এঁকেই জলের তলায় মাছ তাদের মনে কিলবিল করিয়ে দিলেন। এমনিই ছিল অবুদাদুর খেলা।

অটোগ্রাফে লেখা টুকরো ছবি অনেক ভাসে চোখে। চোখের দেখা আটকে রাখা বোধ হয় সহজ, মনে ধরার চেয়ে। তাই তো দেখি, চোখে-দেখার পথ ধরে ধরে পূর্ণ ঘটনাটিকে যেন দেখতে পাই, কথাও শুনি। সেই দেখা আর শোনা নিয়ে তাঁর কথা লিখতে বসে ক্ষণে ক্ষণে কত ভয় জাগছে প্রাণে; যদি তাঁকে ঠিকমত না ধরতে পারি— এই ভয়।

অটোগ্রাফ খাতায় লেখার কথায় ছোট্ট একটি ঘটনা মনে পড়ল। ছোট্ট কিন্তু অতি সুন্দর ঘটনা।

এ অনেক আগের কথা। কলাভবনের এক ছাত্রী গিয়েছিল কলকাতায়, অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছে, প্রণাম করেছে। মেয়েটির অটোগ্রাফ খাতায় তিনি এঁকে দিয়েছেন, লিখে দিয়েছেন। আশ্রমে ফিরে এসে মেয়েটি বলছিল এ-সব কথা, আর নন্দদা অতি আগ্রহে শুনছিলেন। আপন ছাত্র-ছাত্রীকে গুরুর কাছে পাঠিয়ে নন্দদা বড়ো খুশি হতেন, যেন তাদের মাধ্যমে তিনিই যেতেন গুরুর কাছে।

নন্দদা কথা শুনছেন, আর মেয়েটির অটোগ্রাফ খাতায় গুরুর আঁকা ছবিখানি দেখছেন।

অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছেন— ইটপাথরের একটি মজবুত প্রাসাদ ধসে পড়ে গেছে। নীচে লিখে দিয়েছেন ছোট্ট একটি কবিতা। বহুদিন মনে ছিল আমার কবিতার কথা কয়টি, এখন দেখছি ভুলে গেছি। কবিতাটির ভাবার্থ— মাটির বাসা ঝড়ে উড়ে গেল, নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবার জন্য পাথরের বাড়ি বানালো— ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ল। পরে ছোট্ট একটি প্রশ্ন ছিল— এখন থাকবি কোথা বল?

নন্দদা কলাভবনে যেখানে বসে ছবি আঁকেন সেখানেই বসে ছিলেন—অটোগ্রাফ খাতাটির পরের পাতায় রঙ-তুলি নিয়ে আঁকলেন— একটা গাছ, গাছের তলায় একটি লোক বসে। তুলি দিয়েই লিখলেন ছবির নীচে—গাছতলা আমার ঘর, আমার থাকবার ভাবনা কিসে ?

নীরবে ছিল গুরুশিষ্যের এমনিতরো প্রশ্নোত্তরের খেলা। এ বড়ো মধুর !

আশ্রমে যখন থাকতেন, অবনীন্দ্রনাথ কলাভবনে যেতে ভালোবাসতেন। প্রায় রোজই সকালে একবার বেড়াতে বেড়াতে কলাভবনে যেতেন, ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গল্প কথা বলে আসতেন। দু-চারদিন না গেলে বিশেষ করে মেয়েরা অভিমান করত। বলত, অবুদাদু, আপনি আমাদের ভুলে গেছেন।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য বড়ো স্নেহ ছিল তাঁর। কাউকে যেন আঘাত দিতে পারতেন না ; কাউকে অবহেলা করতে পারতেন না। সবে নতুন ছবি আঁকা শিখেছে, কাঁচা হাত, এ বলে তাঁর কাছে অনাদর ছিল না।

একদিন অবনীন্দ্রনাথ কলাভবনে গেছেন। দুদিন যান নি ; মেয়েরা অভিমান করেছে। তারাই আবদার করে বেশি। অবনীন্দ্রনাথ বললেন—এই তো এসেছি, আন তোদের কাজ, কে কী করেছিস দেখি।

একটি মেয়ে তার কাজ এনে দেখাল। অবনীন্দ্রনাথ বললেন— বেশ হচ্ছে। এতে বেশি কিছু বলবার নেই। যা, এমনি করে কাজ করে যা।

আর-একটি মেয়ে আনল তার কাজ, তাকেও একটু-আধটু বলে ছেড়ে দিলেন। এমনিতরো একে একে অনেকেই তাদের ছবি নিয়ে এল, তিনি কাউকে কিছু বললেন, কারো ছবি সংশোধন করে দিলেন। শেষে একটি মেয়ে তার ছবি আনল, অবনীন্দ্রনাথ বললেন, দাঁড়া, আজ তোর ছবি নিয়েই বসি।

অবনীন্দ্রনাথ যখন কলাভবনে আসতেন, মেয়েরা এসে তাঁকে ঘেঁকে ধরত অবশ্য ; কিন্তু পিছনে ছাত্রশিক্ষক সবাই থাকতেন। সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াতেন। সকলের পিছনে নন্দদা থাকতেন, সজাগ হয়ে, কান পেতে।

অবনীন্দ্রনাথ শুধু যে ছাত্রছাত্রীকে বলছেন, শেখাচ্ছেন তা তো নয় ; নন্দদা জানেন তাঁরা শিখছেন এইভাবে অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। যেমন শিখে এসেছেন বরাবর নানাভাবে।

অবনীন্দ্রনাথ সেই মেয়েটির আঁকা ছবি হাতে নিয়ে বললেন— বেশ ঠাণ্ডা রঙ দিয়েছিস, বেশ হয়েছে। মাঠ, মাঠের মাঝে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সামনের রাস্তা দিয়ে একটি গোরুর গাড়ি যাচ্ছে— বেশ। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, ছবিখানা তোর শেষ হয়ে গেছে?

সে বললে— হ্যাঁ।

আর-কিছু করবার নেই?

না।

তবে আয় এদিকে। এই ছবিখানা নিয়েই আজ তোদের সঙ্গে কথা বলি।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন— দেখ, ড্রইং-এ ভুল যা আছে, তা আছে। ও ধীরে ধীরে শোধরাবে; কিন্তু আসল ভুল কী করেছিস শোন। এই যে ছবিখানি করেছিস— আচ্ছা— গোরুর গাড়ি কি তোর চাইই, নইলে চলবে না? তা বেশ। রাস্তা দিয়ে গোরুর গাড়ি কোথায় যাচ্ছে; না, এদিকপানে হাটে যাচ্ছে। আর তোর তালগাছ কয়টিও এই দিকেই ঝুঁকেছে— আকাশে হাওয়াও বইছে এইদিকে। সব গতি হাটের মুখে। বেশ হয়েছে। কিন্তু মেয়েদুটিকে হঠাৎ এখানে ছেড়ে দিয়েছিস কেন? সবেরই একটা মানে থাকা চাই তো! বিনা কাজে ওরা কী করছে এখানে? তবে হ্যাঁ, এক হতে পারে, মেয়েদুটি গাঁ থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে গোরুর গাড়িতে চাপবে বলে। কিন্তু পয়সা নেই হাতে, গোরুর গাড়ি মিলল না তাদের, চলে গেল। তারা থমকে দাঁড়িয়ে রইল সেদিকপানে চেয়ে। আর-এক ভাব হত, যদি মেয়েদুটিকে রাস্তাতে গোরুর গাড়ির পিছু পিছু চালিয়ে দিতিস। আমি হলে তাই করতুম— ব'লে তুলিতে একটু রঙ নিয়ে মেয়েদুটিকে কাছে এনে দিলেন। ড্রইং-এর দোষ যেটুকু ছিল গোরুর গাড়িতে— একটু ঝোপঝাপের আভাস দিয়ে ঢেকে দিলেন। দু-চারটে আঁচড়েই হয়ে গেল, ছবি নতুন রূপ নিল।

ছবির কথায় কথা হতে নন্দদা একসময়ে বললেন, তবে 'পার্সপেক্‌টিভে' যেতে হয়। আমাদের তো আপনি তা শেখান নি কখনো।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 'নন্দলাল, তখন আমি তোমাদের দিয়ে আমার পিঠের লোহার বর্ম তৈরি করেছিলুম। 'পার্সপেক্‌টিভ' শেখাবার দরকার ছিল না। তখন আমার একটা যুদ্ধে নামতে হয়েছিল, সেই যুদ্ধের জন্যই

তোমাদের তৈরি করেছিলেম। তোমরা ছিলে আমার পিঠের বর্ম, বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের এক-একটি 'বুদ্ধদেব' তৈরি করে যান নি। তিনি তাদের দিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়েছিলেন, তাদের ভিক্ষু তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তোমাদের দিয়ে শিল্প-দেবতার মন্দিরে দেয়াল গেঁথেছিলুম। আর এই-সব মেয়েরা, এরা আমার কাছে ফুলের মতো ; এদের দিয়ে মালা গেঁথে আমি তাঁর গলায় পরাতে চাই। এদের নষ্ট কোরো না, অন্ধকারে রেখো না।'

একজন শিক্ষক বলে উঠলেন, এ মেয়েটি সবে একমাস হল এসেছে কলাভবনে। আগে থাকুক দেখুক সব— তবে তো ?

অবনীন্দ্রনাথ যেন চমকে উঠলেন। বললেন, কী বললে! একি মার কোলে শিশু, জানে না শেখে নি কিছু ?

অবনীন্দ্রনাথ মেয়েটিকে বললেন, কোথায় থাকিস তুই ?

সে বললে, ডায়মণ্ড হারবারে।

—এখানে আসবার আগেই তোর ছবি আঁকার ইচ্ছে হয়েছিল ?

—হ্যাঁ।

—এঁকেছিস কিছু ? গঙ্গার ঘাট, লোকজন, গাছপালা ?

—হ্যাঁ।

—আনিস নি কেন সে-সব সঙ্গে তুই ? বড়ো ভুল করেছিস।

তিনি বললেন, এই দেখ, এখানে আসবার অনেক আগে হতেই এর আঁকা শুরু হয়ে গেছে। মন চেয়েছে আঁকতে, চোখ চেয়েছে দেখতে। এসেছে আমাদের সাহায্য পেতে।

বললেন— ও নন্দলাল, তোমরা এদের নষ্ট কোরো না। বোলো না ধীরে ধীরে শিখবে, পরে শিখবে। ঘড়ি প্রথমেই যদি ভুল সময় দেয় পরে আর শোধরাবার সময় থাকবে না। 'পার্সপেক্‌টিভ' নয়, ও ব'লে আমাদের ছবিতে কোনো কথা নেই। এ হচ্ছে 'যোগাযোগ'। যে মাটিতে গাছ দাঁড়িয়ে আছে তার সঙ্গে গাছের যোগ।

গোরুর গাড়ি হাটে যাচ্ছে হাওয়ার মুখে রাস্তা দিয়ে, তা প্রমাণ করতে হবে। আবার গাঁয়ের সঙ্গে গোরুর গাড়ির যোগ, ওখান থেকেই যে গাড়ি বেরিয়ে এসেছে। 'স্টোরি কনস্ট্রাক্‌ট্‌' করো।

নবু একবার এক কোন্‌ বাদশার ছবি এঁকেছে। এক্‌জিবিশন হবে—

টাঙানো হয়েছে ; আগের দিন গিয়ে দেখি সেই ছবি। বললুম, নবু, করেছিস কী? বাদশার ছবি এঁকেছিস, কিন্তু এতে যে বাদশাই কিছুই নেই। সব লাইনে রঙে ছবিতে বিবাদ বেধে গেছে।

শুনে নবু ছবি নামাতে চায়। বললুম—টাঙানো হয়ে গেছে, তা আবার নামাবি? দাঁড়া, দেখি কী করতে পারি।

দেখে দেখে দেখলুম, শুধু একটা জায়গায় মিল আছে। বললুম, নবু, বিবাদ হয়েছে নামে। নাম বদলে ছবির নাম দে 'আবুহোসেন'— এক রাত্তিরের রাজা। ভিখিরি ছিল সে, কেবলমাত্র একটি রাতের জন্ম রাজা হয়েছিল।

ছবির নাম বদলে দিতেই সেই-সব রঙ, সাজ-পোশাক, লাইন, সব চমৎকার মিলে গেল। বেসুরো ছবি নামের জোরেই পার। শুধু ভাবের জায়গায় একটু মিল ছিল, সেখানে যেই একটু সুতো দিয়ে ভাবের সঙ্গে ছবিটি গেঁথে দিলেম, অমনি তা চলে গেল ছবির জগতে।

অবনীন্দ্রনাথ ঘুরে বসলেন। তাঁকে ঘিরে যে ভিড় দাঁড়িয়ে— সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন— ওরে, ও তোরা, আমার কাছে মাস্টার বলে কেউ নেই। আমরা সবাই ছাত্র। শেখার অনেক বাকি আমাদের। চোখ খুলে দেখো চারি দিক। যে জিনিস দরকার তা তোমাদের 'পার্সপেক্টিভে' ধরা নেই। টেকনিক স্টাইলে ধরা নেই। কোনো জালে সে ধরা দেয় না। তালাচাবিতে বন্ধ নেই। সে খোলা আছে, সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। চোখই দরজা, সেই দরজা খুলে দাও। সেই রাস্তা দিয়েই তাকে ধরতে পারবে। দেখো, দেখতে শেখো। এই আসল জিনিসটাই যদি ভুলে রইলে তবে যাই কর, কিছুই হল না। এ বলছি আমি তোমাদের, খুব জোর দিয়েই বলছি। জেনেছি আমি— তাই তো দুঃখ হয়।

অবনীন্দ্রনাথ থামেন। পরে ধীরে ধীরে যেন আপন মনেই আপনাকে শোনান, বলেন— ছবি আঁকা আমি শিখি নি, পথ খুঁজেছি। চোখ মেলে কান পেতে থাকতে হয়। না চাইলে প্রকৃতি ধরা দেয় না। মন দিয়ে মন চাইলে তবে মন পাওয়া যায়। খাতা পেনসিল নিয়ে তার সামনে যাও তাকে ধরে রাখবার জন্ম ; সে ফুল মরে যাবে ভয়ে। সেই মনটি নিয়ে তবে তার কাছে যেতে হয়।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন— সে হচ্ছে নানারকম ফাঁদ, এক-এক ফাঁদে এক-একটা জিনিস ধরা পড়ে। মাছ ধরা আর পাখি ধরা জাল কি এক? এক নয়। কিন্তু যে জিনিসটি কোনো ফাঁদেই ধরা পড়ে না, তাকে ধরবে কী দিয়ে?

ওরে ও অবোধ আছিস চাহিয়া
কি লাগি ফাঁদ বাতাসে পাতিয়া।

তাকে ধরা যায় কী করে বলো দেখি নি। মন দিয়ে। চোখ মেলে রূপ রঙ দেখবে, কান দিয়ে সুর কথা শুনবে; চোখ-কানের দুই ফাঁদে তাকে ধরে তার পর মন দিয়ে তাকে টেনে তুলবে।

আর-একদিন, কলাভবনে গেছেন অবনীন্দ্রনাথ— কয়েকটি ছাত্রছাত্রী প্রত্যেকেই ঝর্নার ছবি আঁকছে— ঘুরতে ঘুরতে তিনি গেলেন তাদের কাছে। বসলেন, বললেন— ঝর্নার ছবি আঁকছিস? আগে পড়ে দেখ রবিকার কবিতাটি—

ওরে তোরা কি জানিস কেউ
জলে কেন ওঠে এত ঢেউ।
ওরা দিবস রজনী নাচে,
তাহা শিখেছে কাহার কাছে।
শোন্ চলচল্ ছলছল্—

স্পষ্ট করে ঝর্না আঁকলেই কি ঝর্না হল?

আমি বসে বসে তাই ভাবি,
নদী কোথা হতে এল নাবি।
কোথায় পাহাড় সে কোন্‌খানে—

ঝর্না আসে কোন্ রহস্য হতে, পাথরের বাধা ঠেলে— কোথাও লাফিয়ে, কোথাও নেচে, কোথাও-বা বেঁকে।

শিলা খান খান যায় টুটে,
নদী চলে পথ কেটে-কুটে।

নদী কবিতাটি পড়ে দেখ্, সব পাবি। যেখান থেকে ঝর্না শুরু তা কি দেখা যায়? সব-কিছু চোখে ধরাও পড়ে না।

মুসৌরি পাহাড়ে সকালে বেড়াতে বের হতুম, কানে আসত শব্দ— 'ঝরঝর ঝরঝর'। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখি— কোথায় পায়ের কাছে কয়েকটা পাতার ফাঁক দিয়ে তিরতির করে জল বয়ে চলেছে। সেই জলের রেখা ধরে ধরে উপরে উঠতুম। পাহাড়ে ওঠা আমার পক্ষে কম কথা নয়। আঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে হাঁপাতে থাকতুম। বুড়ি এক নেপালী মেয়ে বনের পথে যেতে যেতে আমায় দেখে দাঁড়িয়ে হেসে ছুটো কথা কইত— 'বাবু বহুত থক গয়া।'

হাত-পা ঝাড়াঝুড়ি দিয়ে কপালের ঘাম মুছে চার দিকে তাকাই— ওমা কোথায় ঝর্না! কেবল কানেই শব্দ শুনি— ঝরঝর ঝরঝর।

তাই তো বলি, সব কি চোখে দেখা যায়? কান দিয়েও দেখতে হয়।

ঝর্না চলেছে কোথাও-বা একটু রেখার মতো, কোথাও-বা শুধু শব্দই শোনা যায়; কোথাও পলকের জন্য ঝিলিক দেয় চোখে। কিন্তু হাঁ— খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঝর্না সেখানেই, যেখানে তার মাটির সঙ্গে যোগ হয়। দেখ নি চীনে-ছবিতে? সেখানে জোরালো ছুটো সোজা লাইনে তারা ঝর্না এঁকে ছেড়ে দিয়েছে। কী তার বেগ! মাটির সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা— অন্য কিছুই যেন রোধ করতে পারে না তাকে।

গাছ দেখ-না— মাটির নীচে কোথায় কিভাবে জন্ম সে কেউ তো দেখতে যায় না। মাটি থেকে আলোতে এসে মিলবার জন্য তার কী উদ্‌বেগ— কী জোর বেগ। আলোতে এসে মিলল যখন— হেসে ডালপালা ছড়িয়ে দিলে, নিজেকে পুলকভরে মেলে ধরলে।

ঝর্নারও তাই। তার পর সে যখন মাটিতে ধরা দিয়ে সমতল ভূমির উপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলল, স্থির রেখা টেনে দিয়ে গেল। বলে গেল— এই আমি চললেম এইখান দিয়ে এমনি করে।

সহজ নয় ঝর্না আঁকা।

একটি মেয়ে ঝর্নার পাশে একটি পাখি বসিয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন— অতবড়ো পাখি ওখানে কী করে হবে?

আর-একজন ঝর্না যেখানে নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে সেখানে একটি মেয়ের ফিগার দেবে, তা কত বড়ো ফিগারটি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন— এই ভাবনা?

কলাভবনের আলমারি খুলিয়ে তিনি একটি পুরানো চীনে-ছবি বের করিয়ে

আনালেন। দেখালেন, নদীতে নৌকো বেয়ে চলেছে লোক— ছোট্ট একটি টানে শিল্পী বুঝিয়েছে তা।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, এই দেখ, নদীর স্রোতে যেন কুটো একটি ভেসে যাচ্ছে। আর তুই কত বড়ো 'ফিগার' বসাবি তাই নিয়ে ভাবছিস?

৭ই পৌষ উৎসবের পর সব বিভাগের ছেলেমেয়েরা কয়দিনের জন্য 'এক্সকারশনে' যায় বাইরে নানা জায়গায়। এবারেও গিয়েছিল। কলাভবনের দল গিয়েছিল রাজগির। তারা সেখানে যা ছবি এঁকে এনেছে স্কেচ করেছে দেখাল অবনীন্দ্রনাথকে।

তিনি বললেন— পাহাড়টাই দেখছি এগিয়ে এসেছে তোমাদের কাছে, আর্ট এগিয়ে এল কই? হাজার জিনিস লুকিয়ে আছে ওই পাহাড়ে। রাজগৃহের ছবি আঁকো। কোথায় বিম্বিসার কোথায় কে; সব চলে গিয়েও যায় নি। সব-কিছু আগলে আছে পাহাড় এখনো। ওই গান 'কেন ধরে রাখা ও যে যাবে চলে'— ওই গান বাজছে রাজগৃহে। রাজা বিম্বিসার হঠাৎ রাত্রে উঠে চলেছেন বুদ্ধকে দেখতে। শত রাজহস্তী শত শত ঝাড়লণ্ঠন মশাল জ্বালিয়ে পাহাড় আলো করে চলেছেন রাজা। আঁকো সে-সব। তোমার ভাবনাই যদি না পেলেম ছবিতে, তবে পেলেম কী?

আর-একদিন, সেদিনও কলাভবনে জমিয়ে বসেছেন অবনীন্দ্রনাথ। অনেক হাসি গল্প। গল্পই বেশি। তিনি বলেন আর থেকে থেকে সবার হাসির হুল্লোড় ওঠে।

এর মাঝে একটি মেয়ে খাতা এনে ধরল সামনে— কিছু লিখে দিন।

অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন—

যে বংশে কলম হয় সেই বংশে বাঁশি,
এতেও সুর বাজে ওতেও সুর—
বলি যদি উঠো না হাসি।

বললেন, একই বাঁশের কলমেও সুর বাজে, আবার সেই বাঁশের বাঁশিতেও সুর বাজে। কেন বললুম এ কথা? ওই যে সুর— যা সবেতেই বাজে সেই সুরটি খুঁজে বার কর। এটা হচ্ছে আর্টের আর-একটা দিক। সেই সুর বাজাতে হবে।

আর-একটি মেয়ে খাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাশে। অবনীন্দ্রনাথ

বললেন, আয়, তোকেও লিখে দি একটা চৌপদী, খুড়ো ফাল্গুনীতে চৌপদী লিখে গেছেন, সেই ছোঁয়াচ আমারও লেগেছে দেখছি। লিখলেন—

এই মন্দির ধরেছে কি শিল্পদেবতারে,
না এই পাথর, কে বলতে পারে।
এই আকাশ ধরেছে কি তার বর্ণ
বাতাস ভরে আসছে কি তার বাণী,
মনহরিণী আমার শুনছে উৎকর্ণ।

বললেন— সবই প্রশ্ন। প্রকাণ্ড একটা প্রশ্ন নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে বনহরিণীর মতো এদিকে চাইছে ওদিকে চাইছে— আকাশ কী বলছে, বাতাস কী বলছে, নদীর জল কী কথা কইছে। এই যে একটা প্রকাণ্ড প্রশ্ন— এই প্রশ্ন নিয়ে মানুষ আমরা দিবারাত্রি উৎকর্ণ হয়ে আছি। কী বলছে, কেন বলছে। কী চাইছি, কোথায় চলেছি। অনবরত এইই প্রশ্ন হচ্ছে।

বেদে একটি গল্প আছে, দেবমাতা অদিতি বামদেব ঋষির আশ্রমে এসেছেন। দেবমাতা দেবভাষাই জানেন শুধু। মর্তের ভাষা জানেন না। নদী বয়ে চলেছে, কলকল ধ্বনি। ঋষিকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, জল কী বলছে? ঋষি বললেন, ওরা মেঘলোকে ইন্দ্রের স্তুতি গেয়ে সমুদ্রের দিকে চলেছে। আকাশকে প্রশ্ন করছে, কোন্ পথে যাব, কোথায় সমুদ্রের সঙ্গে মিলতে পারব।

বেদে আছে অরণ্যানী-দেবতার বর্ণনা। সে যে কী বর্ণনা অরণ্যানীর! বনের ভিতর দিয়ে শকট চলেছে, যেন তার শব্দ শুনতে পাই। সে-সব যেন ছবি আঁকা যায়, এমন সব বর্ণনা।

এমনি করে কথার ভিতর দিয়ে সুর ছবি দিয়ে গেছেন। বাগ্‌দেবতার মূর্তি— তার বর্ণনা মেঘকে অতিক্রম করে চলেছে। কত বড়ো সৃষ্টি তা। কথা দিয়ে যেন একটি 'হিরোয়িক স্ট্যাচু' করে গেছেন তাঁরা। কথাকে সেখানে পাথর হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কথাতে ছবি হয়, কথাতে সুর বাজে, আবার কথা দিয়ে মূর্তিও তৈরি হয়। তাই তো বললুম, যে বংশে কলম হয় সেই বংশে বাঁশি, এতেও সুর বাজে ওতেও সুর। এগুলো শিল্পীর কাজ। তাকে যে শুধু ছবি লিখতেই হবে তা নয়। মনের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রশ্ন উদয় হবে, মনের ভিতরে সব নিতে হবে। এই যে গাছ, ডালপালা মেলে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে এই প্রশ্নই করছে— কী? কেন? আর্টেরও মূল কথা

এই। তোমরা যদি প্রশ্ন না কর তবে কিছুই ধরা যাবে না। এই যে দেখছ সোনাঝুরির গাছ— যারা নাম দিয়েছে তারা দেখেছে ওই গাছ। প্রশ্ন করেছে, কী গাছ? দেখলে ঝিরঝিরে পাতা, সোনার রঙের ফুল ঝুরঝুর করছে। এই-সব দেখেছে। প্রশ্নের দ্বারা 'সোনাঝুরি' নাম পেলুম। এর মধ্যে কোনো শিল্পী কোনো কবি ছিল। তারা সামান্য গাঁয়ের লোক বা সাঁওতালও হতে পারে। সবার ভিতরেই এই 'ইন্‌স্‌টিঙ্কট্‌' আছে। এর জন্য বড়োলোক গরিব লোক দরকার হয় না।

আমি কী প্রশ্ন করেছি, কী জবাব পেয়েছি— ছবিতে তা রেখে গেছি।

রবিকা ধরে গেছেন রেখে গেছেন সব-কিছু— মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগ —সব এই গানের মধ্যে। তাই কতবার বলেছি, এখনো বলছি, গানে তিনি যেভাবে সব ধরেছেন ও সবাইকে দিয়ে গেছেন এমন ওঁর সাহিত্যে ছবিতে কিছুতে নয়। এই একটি লোক, যে প্রশ্ন করে গেছেন, প্রকৃতিদেবীর সঙ্গে যে ঘরকন্না করে গেছেন। এক-একদিনের— এমন-কি, প্রতিটি মুহূর্তের ভাব পর্যন্ত গানে ধরা আছে। সেই বুঝে গাইবে। গানের শুধু সুরটাই সব নয়। কথা বাদ দিয়ে তা পাবে না তো।

শিল্পীর কাজ 'কোলাবোরেশন'। ছবিতে গানে কথায় মিলিয়ে সব হবে।

সংগীতের সঙ্গে সবাই আছি জোড়া
সুর কথা ছবি— এই তো জানি মোরা।

নয়তো নাটক ভালো হবে না। জীবন-নাটক খুঁড়িয়ে চলবে। তোমাদের ভিতরে যে জিনিস একটা ঠেলা দিচ্ছে তা সবেতে মেলাতে হবে।

আমি ছবি এঁকেছি কী করে, পুণ্যকথা নিজের মুখেই বলতে হচ্ছে। নন্দলালকে ধরো, ও সব জানে, বলবে তোমাদের। নয়তো শেষে হরিশ্চন্দ্রের মতো নিজ পুণ্যি বলার অপরাধে আবার না মাঝপথে ঝুলতে হয় আমাকে।

যাক, বলি শোনো। আমার এ-সব বলার উদ্দেশ্য হল যে, কিছুতেই কিছু আটকায় না, যদি ভিতর থেকে ঠেলা আসে।

ছাত্রদের নিয়ে ছবি আঁকি তখন। অতবড়ো তো আর্টস্কুল, সে কি তখন অমনি ছিল? একটা ভাঙা বাড়ি— আজ এ দেয়াল ভাঙছে, কাল ও দেয়াল মেরামত হচ্ছে; এই চলছে। তার ভিতরেই কোনো রকমে বসে

কাজ করছি— কাজ করাচ্ছি। গরমের ছুটি হয় নি তখনো। দুরন্ত গরমের তাত— দিলে দেয়াল ভেঙে।

সবাই বললে ক্লাস সরাও, অন্য জায়গায় গিয়ে বসো। বললুম— না, যেখানে আছি সেখানেই থাকব। সেখানেই সবাই একত্রে মিলে চলল আমাদের কাজ। গুরুশিষ্যের বালাই ছিল না। যে যার একমনে কাজ করে যেতুম। সেই সময়ে আমাদের মধ্যে যা ভাব ছিল— সবাই আমরা এক ছিলুম। সেইরকম সব হতে হবে তোমাদের। এক বাঁশিতেই সব হবে— সুর বাজবে, লেখা হবে, ছবিও হবে। আবার দরকার পড়লে পিঠেও পড়বে।

অবনীন্দ্রনাথ 'গুপ্তনিবাসে' সকাল বিকেল নীচে নেমে বাগানে ঘুরে বেড়ান। বাড়ির বাইরের দিকের দেয়ালে বৃষ্টির জলের ছাটে, নোনা লেগে নানারকম দাগ পড়েছে সেখানে। অবনীন্দ্রনাথ দেখেন দেখেন; তার পর একদিন বাগানে পড়ে থাকা একটা পোড়া কাঠ তুলে নিয়ে দাগ কাটলেন তাতে। একটু-আধটু রঙ লাগালেন। দেখতে দেখতে কয়েকদিনের মধ্যে পুব দিকের দেয়ালের নীচের দিকটা ঘিরে এঁকে ফেললেন কত কিছু। চমৎকার সব ছবি। একবার গিয়েছিলাম যখন, বলেছিলেন, তোমরাও 'ফ্রেস্কো' করছ আশ্রমে, আমিও দেখো কেমন 'ফ্রেস্কো' করেছি এখানে!

আজ কলাভবনে বসে তাই বললেন যে, 'মেটিরিয়েলে'র জন্য কিছু আটকে থাকে না। নন্দলাল, রানী ওরা দেখেছে— আমি এখন যে বাড়িতে আছি, বসে বসে এঁকে দেয়াল ছেয়ে ফেলেছি। হাতের কাছে ছিল দাঁতমাজার খড়ি, একটা পোড়া ডাল— বেশ সুন্দর— তার একদিকটা ধরে ধরে আঁকি, পেনসিল-চারকোলের কাজ চলে যায়। একটু হলুদ রঙ গেরির টুকরো থাকে কাছে একটা নারকেলের মালায়। এই তো আমার 'মেটিরিয়েল'। এই দিয়েই তো দেয়াল ভর্তি করে ফেলেছি। কেমন সুন্দর গাছের ডালে একটি বেড়াল এঁকেছি, গোরু ঘাড় বেঁকিয়ে আছে, জলে মাছ হাঁস— কত কী, মাঝে মাঝে আবার মূর্তিও দেখতে পাই। তাই বলি, যদি আঁকতে চাও— মেটিরিয়েল হাতের কাছেই আছে।

যখন আমি ইণ্ডিয়ান আর্ট করলুম— কোনো সাধনভজন দিয়ে নয়। চার দিকে খুঁজেছি। এ বই ও বই ঘাঁটছি, দেখছি পড়ছি। তার পর দেখি একসময়ে সব হাতের কাছে এসে গেল। সারা ভারতের আর্টের নমুনা পেয়ে

গেলুম কত সহজে। তাই ভাবি এক-এক সময়ে— কী করে এল সব। ভাবছিলুম— না, ওদের দেখাতে হবে, শেখাতে হবে, সব জিনিস হাতের কাছে চাই। এসে গেল সব।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, কাল কলাভবনে একটি ছেলে, আমাকে জিজ্ঞেস করলে— ছবি আঁকার নিয়মকানুন কী? নিয়মকানুন আছে কিছু। বললুম তাকে বুঝিয়ে।

আজকাল দেখি এরা রেখার জালে আটকা পড়ে আছে। রেখা দিয়ে রূপকে বেঁধে ফেলে। দাও তো একটু কাগজ রঙ তুলি, তোমাকে দেখিয়ে দিই।

অবনীন্দ্রনাথ তুলিতে রঙ নিয়ে কাগজে একটি ছোটো রঙিন গোল আঁকলেন। বললেন, কোন্ রঙের পাশে কোন্ রঙ খাটে। ধরো-না কেন এই গোল রঙের পাশে এই আর-একটা অন্য রঙের গোল রেখা টানলুম—

দেখি, গোল রঙটা পুকুরের মতো গর্ত হয়ে গেল। অবনীন্দ্রনাথ আবার সেই রঙের পাশেই অন্য রঙ দিয়ে আর-একটা গোল রেখা টানলেন।

দেখলাম গর্তটা উঠে এগিয়ে এল— যেন জলের বুদ্‌বুদ একটি।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, তবেই দেখো 'রেখা' বলে কিছু নেই। রেখাই মোটা করে দাও, রঙ হয়ে যায়।

অবনীন্দ্রনাথ এবারে একটা ফ্ল্যাট ব্রাশে 'চাইনিজ ইঙ্ক' নিয়ে কাগজে লাইন টানলেন, বললেন, এই হল টান, এই টান দেখো একটু মোটালেই হল 'টোন', ব'লে চওড়া ব্রাশটা পুরোপুরি পেতে নিয়ে টানলেন। বললেন, তা হলে—

টান হয় টোন মোটালেই
টোন হয় টান শুখালেই
আর, ছোপছাপ রাখে ছাপ কাগজে।

বলে তুলিটা উলটে পালটে কয়েকটা ছোপছাপ দিলেন কাগজে।

বললেন, ছোপ স্থায়ী নয়। ছাপ হচ্ছে স্থায়ী। চাঁদের ছাপ, সূর্যের ছাপ পেড়ে বসল সেখানে। ছোপের বাঁধা কোনো বাঁধন নেই। ছোপ ছিপায়— মানে লুকায়। একটা রঙের উপর আর-একটা ছোপ লুকিয়ে যায়। ছাপ তো তা নয়।

আজ পূর্ণিমা রাত, মনে একটা ছাপ রেখে গেল। ছবি— ছবি হচ্ছে ছাপ। রামধনুকের লাইন— ওকি লাইন? লাইন দিয়ে আঁকো না, কিছুতেই হবে না। ও হচ্ছে টোনের টান। দু দিকেই বিস্তারের অবসর—দু দিকেই ছড়াবে।

মেঘে বিদ্যুৎ চমকাল এক মুহূর্তের জন্য। নেচার তখুনি তা মুছে গুরুগম্ভীর আওয়াজ দিলে। টোন সেখানে। টোন শব্দও। বেহালায় ছড়ি টান দিয়ে দিলে, টোন হয়ে সুর বের হল।

এইখানে রেখা— বিদ্যুৎ রেখা। ওই একটি রেখা। সমুদ্রের জল বালির উপরে গতির রেখা রেখে গেল। রেল লাইনের রেখা। গোরুর গাড়ির রাস্তার রেখা; এই রেখায় গাড়ির সম্পর্ক কতখানি রয়েছে। যেমন বুড়ো মানুষের মুখ, কত রেখা সেখানে গোরুর গাড়ির রেখার মতো; কালের চক্র চলে গেছে তার উপর দিয়ে।

মেঘদূতে আছে 'রেখা মাত্রেণ পর্য্যবসিতা' বিরহে বিরহে রেখায় এসে পর্যবসিত হয়েছে। এইখানেই হচ্ছে রেখার রূপ।

আকাশের গায়ে কালো মেঘের রেখা আর ইলেকট্রিক তারের রেখা; দুইয়ে কত তফাত।

নেচারের রেখা কাট করে যায় না, আলোছায়ায় মিলে থাকে। তার কাঠিন্য থাকে না। তালগাছ আর লোহার থাম দাঁড়িয়ে আছে ওই সামনে, চেয়ে দেখো। তালগাছ— আলোছায়া তাকে মুক্ত করেছে রেখার বাঁধন থেকে।

কত রকম রেখা আছে নেচারে— এই-সব 'স্টাডি' করো। দেখবে রেখা টোনে মিলে আছে। মুখে চোখ-ভুরুর লাইন— তাও 'টোনে' কত 'সফ্‌ট্' করে রেখেছে।

সীমান্ত রেখা— তার মধ্যে কত কি 'সফ্‌ট্' রঙের টোন; তবে হয়েছে সীমান্ত রেখা।

দাদা রেখা টেনেছেন, ওই বাহাদুরি ওখানে, কত আলোছায়া দিয়ে রেখা টেনেছেন। ও শুধু কালো নয়, ওর ভিতর সমস্ত রঙই আছে। কালোর আড়ালে লুকোনো সব রঙ।

ওকাকুরা আমায় বলে দিয়ে গিয়েছিলেন, যখনই লাইন টানবে রঙের

কথা ভাববে ; যখন রঙ দিতে যাবে তখনই টোনের কথা ভাববে। এ বড়ো মজার ব্যাপার।

ছোপ একটু-আধটু আসে, সে আপনি তার জায়গা বেছে নেয়।

টান-টোনের রহস্য জানাই হল আসল 'সিক্রেট'। এটি জানতে পারলেই সব জানতে পারবে।

এই তো পুবের আকাশে সূর্যাস্তের লাল আলো এসে পড়েছে মেঘে। বসে বসে দেখছি— কত রঙের টোন পড়তে পড়তে এখন সব আলো নিবে গিয়ে তবে চাঁদ ফুটল।

কলাভবনের একটি ছেলে কয়েকখানা 'ল্যান্‌ড্‌স্কেপ' এঁকেছে— এল অবনীন্দ্রনাথকে দেখাতে। অবনীন্দ্রনাথ সস্নেহে দেখলেন, উৎসাহ দিলেন। বললেন, কী, 'ল্যান্‌ড্‌স্কেপ আর্টিস্ট' হতে চাও? তা ভালো। ঈজেল ঘাড়ে ঘুরে বেড়াও গে এবার। আমি করেছি এককালে, ঈজেল ঘাড়ে ঘুরে বেড়াতুম আর ল্যান্‌ড্‌স্কেপ আঁকতুম। এবার তোমাদের পালা। তোমরা তো পারবে, কিন্তু মেয়েরা— তারা কী করবে? তারা তো আর তোমাদের মতো ঈজেল ঘাড়ে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারবে না। মেয়েদের তো ওই অসুবিধে। তা একটি মেয়েকে দেখেছি ল্যান্‌ড্‌স্কেপ আর্টিস্ট হতে গিয়েছিল মুসৌরি পাহাড়ে।

আমিও তখন আছি সেখানে। অন্ধকার থাকতে উঠে গায়ে গরম কিছু জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ি। মাথার উপর দিয়ে বলব কি, ভ্রমরের গুঞ্জন শুনেছ কখনো? আমি শুনেছি। সকালবেলা পাহাড়ে বেড়াতুম, মাথার উপর এক ঝাঁক ভ্রমর ভনন্‌-ভনন্‌— সে কী গুঞ্জন! অনেকটা রাস্তা অবধি সেই ভ্রমরের ঝাঁক ভনন্‌-ভনন্‌ করতে থাকত মাথার উপরে।

পাখির গানও শুনেছি সে সময়ে— সে কথা তো বলেছি কত। কত রকমের পাখি দেখেছি সে সময়ে।

কালো বরফের পাহাড় দেখেছ তোমরা? আমি দেখেছি। তোমরা মনে কর বরফের পাহাড় সব সময়েই সাদা থাকে। আঁকতে গেলেও তাই কর। না— তা নয় সব সময়ে। আমি কালো বরফ দেখলুম তবে কি করে? সেই সময়েই একদিন ভোরে দেখেছিলুম— গোটা বরফের পাহাড় আগাগোড়া কালো হয়ে গেছে।

পিছনে সূর্যোদয় হবে, আকাশ যেন সোনার পট একখানি। তারি গায়ে কালো কালো বরফের পাহাড়।

আর-একদিন দেখি— নীল বরফের পাহাড়।

এমনি রোজই নতুন নতুন কত কিছু চোখে পড়ে। দেখে শুনে বাড়ি আসি, দুধ খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে ছোট্ট এই পোস্টকার্ডের সাইজে একখানি ছবি আঁকি ; রাম নাম জপ হয়। বাস, সেদিনের মতো কাজ সারা।

এইরকম সময়ে একদিন সকালে আমি বেড়িয়ে ফিরছি, দেখি এক মেমসাহেব পথের পাশে 'ঈজেল' খাটিয়ে তেল রঙ দিয়ে বরফের পাহাড় আঁকছে। পরদিন দেখি, সেদিনও সে সেখানে একই জায়গায় একইভাবে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকছে। বরফের পাহাড়— তাতে সাদা রঙ লাগাচ্ছে আর মুছছে। যেন একটু বিব্রত ভাব। কাছে গিয়ে আলাপ করলুম। বললুম— কি, ছবি আঁকছ ?

মেম বললে— হ্যাঁ, এই পাহাড়টা করছি। কিন্তু দেখ-না, বরফের পাহাড়টা কিছুতেই হচ্ছে না। ঠিক রঙটি কিছুতেই দিতে পারছি না— কেবলই বদলাচ্ছে।

বললুম— কতদিন ধরে আঁকছ এখানা ?

সে বললে— আজ আটদিন হল।

বললুম— বল কী ? আটদিন ধরে তুমি একই জায়গায় একই কাগজে ছবি আঁকছ ? জানো, আটদিনের আটখানা ছবি তুমি নষ্ট করেছ ?

সে বললে— কী করব তবে ?

বললুম— যেটুকু ভালো লাগে ঝট করে এঁকে ফেলবে। আবার একখানা নতুন 'ক্যানভাস' নেবে। প্রতি মুহূর্তে রঙ বদলে যাচ্ছে প্রকৃতিতে ; আর তুমি কিনা আটদিন ধরে সেই রঙ ধরবার চেষ্টাই করে চলেছ ? সে ধরতে পারবে কী করে ? সবচেয়ে ভালো— বেশ করে দেখো, দেখে ঘরে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে ছবি আঁকো।

মেম বললে— তুমি তো আর্টিস্ট, তুমি স্কেচ কর না ?

বললুম— করি মাঝে মাঝে।

এখন করছ কিছু ?

বললুম— না।

তবে কী কর ?

বললুম— দেখি। দু চোখ দিয়ে দেখে মনের ভিতরে স্কেচটি করে নিয়ে বাড়ি যাই।

কাগজ রঙ হাতে নিয়ে তৈরি থাকলেই বুঝি সব ধরা যায় ? প্রকৃতি সময় দেয় কতটুকু ?

সেবারে মুসৌরি পাহাড়েই আর-একদিন বেড়াতে বেরিয়েছি বিকেলে। যাবার পথে দেখি একটি চেরী গাছ। গাছে পাতা নেই, ফুল নেই; খালি খালি ডালগুলি আকাশের গায়ে— কেমন যেন ব্যথা লাগল বুকে। আহা! এই গাছ যখন ফুলে ভরে ওঠে, কত বাহার তার। ফেরবার পথে— সন্ধে হয়ে আসে আসে— পা চালিয়ে ঘরে ফিরছি, সেই চেরী গাছের কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালুম। একি ? যাবার সময়ে দেখে গেলুম খালি ডাল, আর এরই মধ্যে গাছটি ভরে গেছে— কচি কচি সবুজ পাতা হাওয়ায় দুলছে !

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আর চোখের পলক ফেলে ফেলে দেখছি— ঠিক দেখছি কি না। এমনি দেখতে দেখতে এক সময়ে কচি পাতাগুলি ঝাঁক বেঁধে যেন হাওয়ায় উড়ে গেল। ছোট্ট ছোট্ট এই এতটুকুটুকু সবুজ পাখিগুলি, বুকটা সাদা; এসে বসেছিল দল বেঁধে চেরী ডালে। মুহূর্তের জন্ম চেরী গাছের শোভা দেখিয়ে চলে গেল।

তাই বলি, সোজা মনে কোরো না 'ল্যাণ্ডস্কেপ' আঁকা।

সেই কথাই হচ্ছিল আজ সকালে। শিল্পে তিন জগৎ পেরিয়ে চলতে হবে সকলকেই। এ ছাড়া উপায় নেই। সাহিত্য বল, ছবি বল, গান বল— সবেতেই এই।

সামান্য ফুলে ফলেও তিন জগতের ভাবই আনা যায়। ওকাকুরা আঁকলেন— একটি পদ্মফুল নীচে কয়েকটা পদ্মপাতা। ওইতেই ধরে দিয়ে গেলেন সেই দূরের জগৎকে।

রবিকা গান গেয়েছেন—

আজি দক্ষিণপবনে
দোলা লাগিল বনে বনে ॥
দিক্‌ললনার নৃত্যচঞ্চল মঞ্জীরধ্বনি অন্তরে ওঠে রনরনি
বিরহবিহ্বল হৃৎস্পন্দনে ॥…

এই সেই দূরের জগতের কথা। দক্ষিণ পবনে তিনি সেই দিক্‌ললনার মঞ্জীরধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। সাহিত্যে হয়, কিন্তু এ ছবিতে ফোটাই কী করে? রবিকা পারতেন তাঁর ভাবকে কথায় ধরে দিতে। আমাদের তো সেটি হবার জো নেই। আমাদের ও-ভাষা জানা নেই। কথায় যা বলা যায়, তুলিতে তা যায় না। আকাশে যদি দিক্‌ললনার নৃত্যচঞ্চল মঞ্জীর এঁকে ছেড়ে দিই তবে লোকে পাগল বলবে।

মঞ্জীর এখানে 'সিম্‌বল'; এ জিনিস ফোটানো যে যায় না ছবিতে তা নয়, তবে অন্য জিনিসের ভিতর দিয়ে ফোটাতে হবে।

'প্রজাপতির পাখায় দিকে দিকে লিপি নিয়ে যায়' রবিকা দূরের জগৎ থেকে কাছের জগতে এসে গেলেন এবারে। আবার অনেক গানে দেখবে কাছের জগৎ থেকে দূরে চলে গেছেন।

এই দুই রাস্তা আছে মাত্র যাওয়া-আসার জন্য। রবিকার গানগুলি গেয়ে না পার, পড়ে দেখো; সব পাবে। তাঁর ওইখানেই তো সুবিধে। কথা দিয়ে কত ভাব ছড়াতে ছড়াতে চলে গেছেন।

একদিন নন্দলাল রবিকাকে বলেছিল— আপনি কথায় গানে নানা রস ব্যক্ত করেছেন, তাই ছবিতে সেদিকের ধার ধারেন নি। কিন্তু আমাদের তো তা নয়, তাই সবরকম ছবিই করতে হয়।

রবিকা হেসে বলেছিলেন— তা বটে। তোমাদের মুশকিল ওইখানেই।

কী জোরালো সব ছবি এঁকে গেছেন। আর, কত এঁকে গেছেন। বলতেন তো, যে, ছবি এঁকে ফিরে যখন দেখি, মনে হয় কতখানি আগের কাজ। নিজের কাছেই পুরোনো লাগে।

এ যেন ফুল ছিটিয়ে দেওয়া। গাছ ফুল ঝরিয়ে আর কি ফিরে তাকায়? তবু বলব— তোমরা রবিকার ছবি দেখেই আশ্চর্য হও— ওঁর গান এবার দেখতে শেখো। ও কী ছবি নয়? এক-একখানা গান, এক-একখানি ছবি।

শুধু 'ল্যাণ্ডস্কেপ আর্টিস্ট' হতে চেয়ো না। তাতে পূর্ণ মুক্তি পাবে না। একটু বড়ো খাঁচায় এদিক থেকে ওদিক ওড়ার আনন্দটুকুই পাবে, তার বেশি না। চিড়িয়াখানায় আজকাল 'ন্যাচারেল গার্ডেন' করে পশুপাখি ছেড়ে দেয়, ভাবে, তারা মুক্তির আনন্দ পাবে। কিন্তু বন্দীত্ব ঘোচে কি তাতে? বাঘ-

সিংহের খাঁচার ভিতরেও একটু জল, ঝোপ, গুহা করে দেয়; যেন বন বন দেখায়। কিন্তু কতটুকু তার পরিধি?

একবার চিড়িয়াখানায় গেছি, রেলিং দেওয়া সিংহের খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। একটা সিংহ আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল গুহার ভিতর থেকে। এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। মস্ত বড়ো সিংহ। দাঁড়াল যে, আমাদের মাথা ছাড়িয়ে উঠল তার মাথা। আর কী ভঙ্গি! জটাজূট নিয়ে বুড়ো সিংহটা ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে রইল আমাদের মাথার উপর দিয়ে। আমরা যে দাঁড়িয়ে আছি সামনে, কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

তখন সূর্যাস্ত হয় হয়। আলো এসে পড়েছে সমস্ত গাছগুলির উপর; চার দিকে লালচে আভা। সিংহটা তাকিয়ে গর্জন করে উঠল। সে গর্জন আলাদা। সে হচ্ছে বনের ডাক। যেন অনেকখানি একটা ডাক, তালে তালে ভুমভুম করে পড়ছে। খানিকক্ষণ অবধি চলল সেই ডাক। তার পর সিংহটা ঘুরে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকে গেল। বেশ বুঝতে পারলুম আজকের আলো তাকে বনের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে। যেন বুড়ো সিংহ তার সিংহীকে ডাক দিল।

বাড়ি এসে বললুম সবাইকে— সিংহের ডাক কী— আজ শুনেছি।

তিনটে জগৎ আছে শিল্পীর কাছে। প্রথম ধরো কাছের জগৎ। এই কাছের জগৎ কী নিয়ে, না, আপন জিনিস আপন লোকজন আপন সুখদুঃখ আপন ঘরবাড়ি এই-সব নিয়ে। এই যে নিজেরটি— এই নিয়ে কত শিল্পী দিচ্ছে কত ছবি।

তার পর আর-এক জগৎ; নিজের থেকে একটু দূরে। এ হল পাড়াপড়শী নিয়ে। যেন— এ গ্রাম সে গ্রাম এ বাজার সে বাজার।

তারও পরে— আরো দূরে— দূরের জগৎ। সে নিজেরও নয়, পাড়াপড়শীরও নয়। সেই গহনে কিসের খোঁজে যায় শিল্পীমানুষ? মনের মানুষের খোঁজে।

ছবিতে এই তিন জগৎই ধরা পড়ে দেখবে। কেউ কেউ দেখবে ঘর এঁকেছে, ঘরের মানুষ এঁকেছে। বেড়াল, টিয়ে, ফুলদানিতে ফুল— নিজের দৈনন্দিন সব ব্যবহারের জিনিস এঁকেছে যা তার অতি কাছের জগতে আছে।

কেউ কেউ আপনার কাছ থেকে আর-একটু দূরের জিনিস— পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি এঁকেছে।

কেউ কেউ আবার এ-সব ছেড়ে গভীর রাত্রের আকাশে একটি চাঁদ তারা দিয়ে ভাব-গভীর চিত্র এঁকে দেখাচ্ছে।

রূপজগৎকে এই তিনটে ভাগে ফেলা যায়। এই যে, এই একটা ছবি দেখো, কাছে— বুকের কাছে যে অংশ সেখানে শিল্পী একটি ঘর এঁকেছে, একটি লোক বসে মাছ ধরছে। তার থেকে দূরে একটা পাহাড়। আর, এই একটু রাস্তা চলে গেছে কুয়াশার ভিতর মিলিয়ে দূর দূরান্তরে অদৃশ্য এক দেশের মুখে। এই তিন জগৎ নিয়ে একটি পুরো ছবি হল। ছবিতে এইভাবে সিঁড়ি বেয়ে চলে মন।

যেমন মেঘদূত, আরম্ভ করেছে কি, না, একেবারে মনের মানুষের কথা নিয়ে।

'কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ'— এই 'স্বাধিকার' নিয়েই প্রথমে সে ছিল। নিজের জগৎ, নিজেরটা নিয়েই মত্ত। তার পর একদিন শাপগ্রস্ত হয়ে এল রামগিরি পর্বতে। সেখানে এসে যক্ষ দেখেন নানা 'ল্যাণ্ডস্‌কেপ'। কত রকমের ছবি। সেখানে নিজের লোক নেই, বসে বসে কাছের ফুলটি গাছটি দেখেন, শিলাতলে মাটি দিয়ে যক্ষিণীর পট এঁকে চেয়ে থাকেন, ফুল ছড়িয়ে সাজান।

তার পর হঠাৎ এল একদিন মেঘ। দূরের জগতের দরজা খুলল এতদিনে। বর্ষার আগন্তুক একটা মেঘ, তাকে দূত করে পাঠাল। তখন মেঘ উড়ল, বক উড়ল, সব উড়ল। কোথায় পাঠাচ্ছে তাদের? মনের মানুষের কাছে। মনের মানুষ— ঘরের যক্ষিণী।

মেঘদূতে এই তিনটি ভাব সুস্পষ্ট ধরা আছে, পায়ে পায়ে চলে গেছে।

জগতে এই তিন ঘরে যাঁর দখল— তা বড়ো কম। ওই এক-এক ভাগে এক-এক দল। ঘর বাজার নিয়েই বেশি।

দূর ও ঘর একসঙ্গে 'কমপ্লিট' হয়ে তবে হয় ছবি। কোনো অদৃশ্যলোক থেকে ঝর্না নেমে এসে ঘরের পাশ দিয়ে বয়ে যায়, অতি কাছের হয়ে ধরা দেয়।

রামায়ণ কী? এত বন, এত যুদ্ধ সব পার হয়ে এল সীতাতে। সেখানে

এসেও লেখক থামতে পারেন নি। রামের কী 'ক্যারেকটার' দেখিয়েছে— সেই সীতাকে তাঁর ছাড়তে হল। কিন্তু পেরেছেন কি সত্যি ছাড়তে? তা পারা যায় না। রামায়ণেও তাই দেখাতে হল শেষে; সেই রামই বসে বসে লবকুশের গান শুনছেন।

আমিও সেই লবকুশের গান গাইছি— বসে বসে স্মৃতিকথা শোনাচ্ছি।

শ্যামলী, মাটির ঘরটি; থাকবেন বলে শখ করে করিয়েছিলেন রবিকা। আদর করে তার নাম দিলেন 'শ্যামলী'। সেই আপন লোকটি যখন চলে গেল, আমরা কী করি? বড়ো জোর স্মৃতি রাখবার মতো কিছু একটা করে রাখি, যে, হ্যাঁ, এইখানে তিনি এমনভাবে ছিলেন। অথবা 'রবীন্দ্রভবন' করি। কিন্তু রবীন্দ্রভবন রবীন্দ্রনাথকে 'রিপ্রেজেন্ট' করেন কি? করেন না। 'রবীন্দ্র' নামটুকুরই যা দরকার সেখানে। সেদিন এক মেম জিজ্ঞেস করল-না, নামের সার্থকতা কোথায়? তা এইখানেই। 'রবীন্দ্রভবন' নাম দিয়ে বোঝাল এ রবীন্দ্রনাথের চেয়ার, রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা, কলম, চশমা ইত্যাদি।

শান্তিনিকেতনের একটা রূপ আছে। সে কি এই পলাশ আর শিমুল গাছের জন্য? 'ল্যাণ্ডস্কেপে' একটি পলাশ এঁকে দিলেই কি শান্তিনিকেতন বোঝাবে? এ গাছ তো অনেক জায়গায়ই আছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে ছিলেন, এখানে তিনি নিজেকে ধরে দিয়ে গেছেন, তাঁর অভাবেও সেই জিনিসটি ধরা আছে। এইটি ফোটাতে হবে। এখানে আর একটু বড়ো শিল্পী চাই।

তারও উপরে যেখানে শান্তিনিকেতনও নেই, রবীন্দ্রনাথও নেই, সেখানে শুধু মনের মানুষ। সে ধ্যানের ছবি।

মনের এক-একটা ভাব রূপ পাচ্ছে, তবেই হল তা বড়ো 'ল্যাণ্ডস্কেপ'।

মনে উৎসব রাখো। উৎসব রাখো নিজের মনে। উৎসব রাখো কাজে, উৎসব রাখো সকালে সন্ধ্যায়।

দেখো-না, নিস্তব্ধ রাত্রি— সব ঘুমে অচেতন, পাখিরা নিঝুম, তখনো উৎসব চলছে প্রকৃতিতে; সৌরভের উৎসব। স্তব্ধ হয়ে সে উৎসব দেখতে হয়।

কতদিনের কত কথা মনে পড়ে। কতভাবে অবনীন্দ্রনাথ বলে গেছেন ছবির কথা, কতভাবে বুঝিয়েছেন আমাদের, কত নির্ভর দিয়েছেন বারে বারে।

সেবারে 'ঘরোয়া'র জন্য গল্প নিতে জোড়াসাঁকোয় আছি। সঙ্গে নিয়ে

এসেছিলাম আমার আঁকা একটি ছবি। বড়ো ছবি। একটি সাঁওতাল মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিমুল গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে। তখন সেই সময়টায় মোটা মোটা রঙ দিয়ে মোটা মোটা তুলি টেনে ছবি আঁকছি; তারই একখানা, নিয়ে এসেছি একবার সুযোগমত অবনীন্দ্রনাথকে দেখাব ভেবে।

ছবি নিয়ে তাঁর কাছে ভয় আমার যায় নি এখনো। একদিন সকালবেলা বেশ অনেকখানি আড়ষ্টভাব নিয়েই দেখালাম ছবিখানা তাঁকে।

অবনীন্দ্রনাথ একবার দেখেই তুলিতে রঙ ভরে নিয়ে মেয়েটির পায়ের কাছে একটা ঘট করে দিলেন। যেন জল আনতে গিয়ে ঘট নামিয়ে দাঁড়িয়েছে খানিক। মাটিতে কয়েকটা ফুল ছিটিয়ে দিলেন। যেন শিমুল গাছের গা-বেয়ে-ওঠা মাধবীলতার ফুল পড়েছে তলায়। মুখে তিনি কিছু বললেন না। দু-তিন আঁচড়ে ঘট ফুল এঁকে ছেড়ে দিলেন।

বিকেলে 'ঘরোয়া'র গল্প বলা সেদিনের মতো শেষ হল। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। চুরুট খেলেন।

পরে বললেন, দেখো, একটা কথা বলব ভাবছিলুম। প্রায়ই দেখি তোমাদের ছবিতে কেবল সাঁওতাল আঁকছ। সাঁওতাল ছাড়া কি অন্য কিছু 'সাবজেক্ট' নেই প্রকৃতিতে? ছবি আঁকতে হলেই সাঁওতাল ছেলেমেয়ে কেন? তবুও যদি দেখতুম একটা বিশেষ-কোনো 'টাইপ' আঁকছ তা হলেও বুঝতুম। কিন্তু তা তো নয়, তোমরা যেন ওই সাঁওতালের মাঝে আটকা পড়ে গেছ। তার বাইরে আসতে পারছ না।

এদিকে আর্টের স্বাধীনতা, পুরোনো 'ট্র্যাডিশন' থেকে মুক্তি চাই বলে চেঁচাচ্ছ, অথচ নিজেকে ওইটুকু থেকে মুক্ত করতে পারছ না। ওই যে একটা নতুন ট্র্যাডিশনের খাঁচাকল স্বহস্তে প্রস্তুত করে নিজেকে ধরা দিচ্ছ তা কি বুঝতে পারছ না? বাইরের পৃথিবী তা হলে জানবে কি করে? এইটুকু সাঁওতাল-গণ্ডির মধ্যেই তো জগৎ সীমাবদ্ধ নেই। 'প্রিমিটিভ' এত বড়ো স্থান পেল প্রকৃতিতে কবে থেকে?

দেখো তো, অজন্তায় অত ছবি এঁকে গেছেন শিল্পীরা, শুধু একটি প্রিমিটিভের টাইপ দিয়েছে তাতে। একটি প্রিমিটিভ মা মেয়ের হাত দিয়ে ভিক্ষে দিচ্ছে বুদ্ধদেবকে। অত বড়ো বুদ্ধের সামনে সেই মা-মেয়ে।

সেই ছবিটিকে অনেকেই বুদ্ধদেবের স্ত্রী যশোধরা ও পুত্র রাহুল বলে ভুল

করেছে। ওই অতবড়ো বুদ্ধের পাশে ছোট্ট মা-মেয়েকে তাই একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। আমি বললুম, না, তা কি হয় কখনো? নন্দলালকে বললুম—'ও আলাদা করে ফেল'। বুদ্ধদেব যাচ্ছেন ভিক্ষে করতে করতে, নগরীর পথে ঘাটে সবাই তাঁকে ভিক্ষে দিচ্ছে, ওই একটি মা-ও মেয়ের হাত দিয়ে তাঁকে ভিক্ষে দিচ্ছে। ও ছবি কেন যশোধরা আর রাহুলের হতে যাবে? হলেনই-বা বুদ্ধদেব ভিখারি, যশোধরা হলেন রানী। রাহুল রাজপুত্র। তাঁদের কেন অমন বেশ হবে? রাহুল গিয়েছিল বুদ্ধদেবের কাছে ভিক্ষে নিতে, সে বড়ো সুন্দর গল্প।

সিদ্ধার্থ তো সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এলেন রাত্রিবেলা, যশোধরার বুকে রাহুলকে রেখে। যশোধরার কত দুঃখ মনে; একমাত্র পুত্রকে বুকে নিয়ে দিন কাটান। নানারকমের সুখ ঐশ্বর্য দিয়ে ডুবিয়ে রাখেন। ভয় হয় পাছে সেও বাপের মতো সংসারত্যাগী হয়। সারাক্ষণ রাহুলকে বুকে আঁকড়ে রাখেন। এমনি করে রাহুল বড়ো হতে লাগল।

একদিন বুদ্ধদেব এলেন জন্মস্থান দেখতে। তখন তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়ে গেছে, জায়গায় জায়গায় নগরীতে নগরীতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার হচ্ছে। তখন সংঘে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ।

যশোধরার বড়ো দুঃখ প্রাণে— স্বামীর সহধর্মিণী হতে পারলেন না। তাঁকে স্বামীর ধর্মের পথ থেকে দূরে সরে থাকতে হল। কী সুন্দর, এঁকো দেখি নি এই ছবিখানা; আমি যেমন এঁকেছিলুম অশোকের রানীর ছবি।

যশোধরার তো মহা দুঃখ প্রাণে। বুদ্ধদেব খবর পাঠালেন, তিনি আজ কপিলাবস্তুর বাইরেই দিন কাটাবেন, কাল প্রাতঃকালে নগরে ঢুকবেন।

রানী যশোধরা রাহুলকে সাজিয়ে দিলেন নিজের হাতে পরিপাটি করে। রাহুল বাপের সঙ্গে দেখা করতে যাবে নগরের বাইরে, যেখানে বুদ্ধদেব গাছ-তলায় আস্তানা করেছেন। রাহুল বললে— মা আমি কী চাইব বাবার কাছে?

রানী বললেন— কিছু তোমার চাইতে হবে না। নিশ্চয়ই তোমার বাবা তোমার জন্য কিছু এনেছেন— দেখ কী দেন তিনি তোমাকে!

রাহুলকে পিতার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে রানী যশোধরা বসে আছেন অন্তঃপুরে। ভাবছেন— কী নিয়ে আসবে ছেলে, কী দেবেন তাঁর স্বামী ছেলেকে। নিজে তো যেতে পারছেন না, মনের মধ্যে নানা বেদনা নিয়ে বসে বসে এই-সব ভাবছেন।

রাহুল বুদ্ধদেবকে গিয়ে প্রণাম করল। বুদ্ধদেব বললেন, 'এই নাও, তোমাকে দিলুম'— বলে বুদ্ধদেবের ত্রিরত্ন-মন্ত্র ভূর্জপত্রে লিখে দিলেন। বললেন, 'কাল নগরীতে যাব, তখন তোমার মার সঙ্গে দেখা হবে; তাঁকে বোলো।'

রাহুল তো ফিরে এসে মার হাতে সেই মন্ত্র দিলে, বললে, 'বাবা আমাকে এই দিয়েছেন মা।'

রানী যশোধরা বললেন, 'শ্রেষ্ঠ জিনিস তিনি তোমাকে দিয়েছেন, একে যত্নে গ্রহণ করো'; বলে মন্ত্রপত্র তার মাথায় ছুঁইয়ে রেখে দিলেন।

পরদিন বুদ্ধদেব নগরীতে প্রবেশ করলেন।

রানী যশোধরা চলেছেন আগে আগে মাথা মুড়িয়ে ভিক্ষুনীর সাজে, পিছনে অন্যান্য পুরনারীরা, সকলের ভিক্ষুনীর বেশ।

রানী যশোধরা বুদ্ধদেবকে প্রণাম করে প্রার্থনা জানালেন যেন তারাও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবার অনুমতি পায়।

সেই থেকে বৌদ্ধ সংঘে মেয়েরা প্রবেশাধিকার পেলেন।

আর তোমরা বলবে অজন্তার ওই ছবিখানা রানী যশোধরা আর রাজপুত্র রাহুলের? ও হল একটা প্রিমিটিভ টাইপ। ওই রকম দু-একটা টাইপ থাকতে পারে; কিন্তু সাঁওতাল-ময় সব ছবি হবে, তা হলে শিল্পী মুক্ত হল কিসে?

আমি এঁকেছিলুম একটি সাঁওতাল মেয়ে, ওই কালো মেয়ের ছবিখানা।

আমি তখন রাঁচিতে জ্যোতিকামশায়ের বাড়িতে আছি। একটি পাহাড়ে দেখি কতগুলি সাঁওতাল মেয়ে— কালো কালো মূর্তি, নীল রঙের সব আলখাল্লা পরা, হাতে এক-একটি বাইবেল— তাদের নিয়ে দু-তিনজন মিশনারি মেম এসেছেন পিকনিক করতে। জিজ্ঞেস করে জানলুম এই সাঁওতালদের খ্রীস্টান করা হয়েছে। সাঁওতালই যদি ছবির 'সাবজেক্ট' হয়, তবে কই, তাদের দেখে তো মনে হয় নি কোনোদিন যে, তাদের ছবি আঁকি।

কিন্তু একদিন বনে ঘুরতে ঘুরতে দেখলুম একটি কালো মেয়ে খালি গায়ে গাছতলায় বসে ঘাড় বেঁকিয়ে মাথায় লাল ফুল গুঁজছে। বাঃ, দেখে মনে হল যেন প্রকৃতির গাছপালার সঙ্গে কালো মেয়েটিও মিশে এক হয়ে গেছে; প্রকৃতিরই মেয়ে সে।

আঁকলুম কালোমেয়ের ছবিখানা। আর 'পোর্ট্রেট' আঁকি নি, একটা 'টাইপ' এঁকেছিলুম। সেরকম হয় তবে বুঝি যে, হ্যাঁ, একটা বিশেষ 'টাইপ' হল।

আর একবার দেখেছিলুম সেই রাঁচিতেই— ট্রেনে করে যাচ্ছি, রেল লাইনের পাশে একটি সাঁওতাল যুবক দাঁড়িয়ে আছে তীর ধনুক হাতে নিয়ে। কী শরীর। কালো কুচকুচে রঙ, যেন কালো পাথরে খোদাই করা মূর্তি। আর দাঁড়াবার কী দৃপ্ত ভঙ্গি, যেন একটা কালো বাঘ শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছে।

আর একবার দেখেছি সাঁওতালের 'লাইফ'।

সকালবেলা বেড়াতে বেরিয়েছি, সাঁওতাল গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, দেখি গ্রামে খুব মাদল বাজছে। ভাবলুম, কী ব্যাপার। দেখি, একদল সাঁওতাল মেয়ে— তারা মিশনারি নয়, আসল সাঁওতাল; তারা সব সেজেগুজে মাথায় ফুল দিয়ে এক-একটি বনদেবী সেজে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এসে রাস্তার একটা জায়গায় থামল। খানিক বাদে দেখি ওদিক থেকে একদল পুরুষ মাদল বাজাতে বাজাতে সড়কি বল্লম হাতে, একটি বরা মেরেছে, বাঁশে বেঁধে সেটা ঝুলিয়ে নিয়ে নাচতে নাচতে আসছে শিকারের পর।

সে এক দৃশ্য! তখন ভাবলুম, বাল্মীকিপ্রতিভার কথা। ভিল সর্দারের ছবি আঁকতে হয় তো এইভাবে আঁকা দরকার।

সে সবের ছবি আঁকলে একটা কিছু তবু পাওয়া যায়। নয়তো দলে দলে কেবল সাঁওতাল আর সাঁওতাল। এর মানে কি? রাধিকা— সেও সাঁওতালী হয়ে বসে আছে।

একটা ঢেউ উঠেছে, প্রিমিটিভ্, ক্রুড, এই-সব আঁকতে হবে। তাতে কি আছে, না, 'স্ট্রেংথ' আছে।

সেটা ভুল। প্রকৃতিতে তো তা নেই। একটা গাছ, গাছের গুঁড়ি ডাল কেমন শক্ত খড়খড়ে, কুমিরের চামড়ার মতো। সেই ডালে দেখা দেয় কচি কচি পাতা।

প্রকৃতিতে 'ক্রুডিটি' সৌন্দর্যের আবরণ দিয়ে ঢাকা। সেখানে ক্রুডিটি প্রকাশ করে নি নিজেকে। তবে কেন সেই জিনিসটাই তুলে ধরবে চোখের সামনে?

মানুষের শরীর, শক্ত হাড়ের কাঠামোর উপর রক্ত মাংস কত কিছু দিয়ে এই শরীর তৈরি। তার উপরে নরম চামড়া, টোলনিটোল মধুর ভাব, এই-সব নানা সৌন্দর্য দিয়ে তবে তাকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছে।

একটা জিনিস যখন অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে সেটাকেই বলে 'ক্রুড'। চটের কাপড় মসলিনের চেয়ে শক্ত বটে, কিন্তু সেটা 'ক্রুড'। চট বেশি টেকে বলে তো আমরা তা দিয়ে জামাও করি নে, কার্পেটের মতো পেতে ব্যবহারও করি নে। 'ক্রুড' অবস্থায় জিনিস রাখা কিছু কাজের কথা নয়।

'স্ট্রেংথ' থাকবে ভিতরে, কিন্তু বাইরে থাকবে সৌন্দর্যের আবরণ। হিমালয় তো এত কঠিন, এত প্রচণ্ড ; কিন্তু কাছে গিয়ে দেখ, কী সুন্দর তার রূপ। মেঘেতে পাহাড়েতে কেমন মিশে গেছে, যেন কে নীলমণি গালিয়ে ঢেলে দিয়েছে। তার গায়ে সবুজ শেওলায় ফুল ফুটে আছে।

রবিকা, কত নরম তাঁর শরীর, কত নরম তাঁর মন। কিন্তু ভিতরে কী বিরাট শক্তি, অগাধ সাহস। সেইখানেই হচ্ছে আর্ট। আগুন তো একটা ভীষণ জিনিস ; আগুন লাগাও, পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে সব। কিন্তু আগুনের রূপটি কি সুন্দর। যেমন রং, তেমনি তার ভঙ্গি। আগুনের শিখাগুলি যেন নাচের তালে তালে জ্বলে ওঠে।

তাই ছবিতে যখন আগুন দেওয়া হয়, সে পুড়ে যাবার জন্য নয়। আঁকতে হয় তার রঙ আর সেই নাচের ভঙ্গিটি। জাপানী ছবিতে দেখবে কী সুন্দর আগুনের রূপ তারা দিয়েছে। পিদিমের শিখাটি দেখ, সেও তো আগুন, কিন্তু দেখতে যেন ফুলের পাপড়িটি।

সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য মানুষের মন 'অ্যাপীল' করে। ক্রুড জিনিসে তা হয় না। গগাঁ— ওঁরা আফ্রিকায় গিয়ে প্রিমিটিভ স্টাডি করে ক্রুড জিনিস করে ঠেকে শিখেছিলেন। আমরা ঠেকেই রইলুম, আমাদের আর শেখা হল না।

তোমরা সব আজকাল 'টাচ' লাগাতে শিখেছ। কথায় কথায় ছবিতে 'টাচ' লাগাও, 'ক্রুড' অসমাপ্ত ছবি আঁক, মনে কর খুব 'স্ট্রেংথ' এল ছবিতে। কিন্তু 'টাচ' যে ছবিতেই থাকে, মনে যে 'টাচ' লাগে না।

এইখানে শোন একটা কথা। আমি তখন টাইকান-এর কাছে তুলিতে লাইন টানতে শিখছি। তাদের এক-একটা লাইন দেখলে মনে হয় যেন সড়াৎ করে এক নিমেষে টেনে গেছে। কিন্তু তা নয়। আমি যেই অমনি সড়াৎ করে লাইন টানতে গেছি, টাইকান আমার হাত ধরে থামিয়ে দিলেন। বললেন, ও ভাবে নয়। আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে টানতে হবে।

তখন বুঝলুম কী ব্যাপার। ওইটুকু লাইন টানতে গিয়ে দেখলুম সেখানে হাতের স্ট্রেংথ কতখানি লাগে।

ক্রুডিটি স্ট্রেংথ নয়। যেমন আধসেদ্ধ ভাত রান্না শিল্পের কিছুই প্রকাশ করে না।

মনের ভিতরে খড়খড় করে করাত চালাও তার একরকম বেদনা। আর একটি শানিত তীর চলে যায় মনের ভিতর দিয়ে— তার বেদনা আলাদা। 'ক্রুড মেথড' নিয়ে রস ভোগ করানো যায় না।

সেদিন গিয়েছিলুম উদয়শংকরের নাচ দেখতে। পাশে ছিলেন গুরুসদয় দত্ত। উদয়শংকরের নাচ দেখে ভালো লাগল। শিবের তাণ্ডবনৃত্য হচ্ছে, সে ভীষণ ব্যাপার; কিন্তু সৌন্দর্যের আবরণ ছিল, তাই মন নিতে পারে তা। উদয়শংকর স্টেজের জন্যেই নাচ তৈরি করেছেন বিশেষভাবে, যাতে সেই নাচে দর্শকরা রস পাবে। রায়বেঁশে নাচ মাঠেতেই ভালো লাগে। স্টেজে যদি রায়বেঁশে নাচ দেখাও তবে সেখানে রসের ব্যাঘাত ঘটে।

আমাদের ছবিও তাই। সাঁওতাল 'টাইপ' ভালো; কিন্তু আমার মনের মঞ্চে তুলতে হলে তাকে অনেকখানি বাদ দিয়ে সৃষ্টির মাধুর্য দেখাতে হবে।

খাবার পরিবেশন যেমন তেমন করে করলেও খাওয়া যায়, আর নিখুঁত-ভাবে পরিবেশন করলেও খাওয়া যায়; এখানে রস বেশি, খাওয়ার খাওয়াবার আনন্দ বেশি। ঠাকুর চাকরও পরিবেশন করে, মেয়েরাও পরিবেশন করে; কত তফাত। তাই বলছি 'ক্রুডিটি' বড়ো জিনিস নয়।

তোমাদের আর্ট বদ্ধ হয়ে থাকছে একটা সীমার মধ্যে। নিত্যকার দেখার সঙ্গে আর্টের অনেক তফাত। এটা যদি না ধরতে পার তবে সত্যিকার আর্টিস্ট হতে পারবে না। তা হলে যা আঁকবে সেটা হবে ফোটোগ্রাফ, ইতিহাস। তা হলে তোমার কল্পনা কোথায়?

কল্পনায় ধরে আনতে হবে এক-একটি রূপকে। সিলোনে যেমন এঁকে গেছে বুদ্ধদেবের মূর্তি। কী বিরাট, কী অগাধ শক্তি তার মধ্যে। যা লোকের চোখের সামনে নেই তাকে এনে চোখের সামনে তুলে ধর। ধরে আন সেই কোন্ গরুড় পক্ষী আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে— তাকে।

তুমি যে সাঁওতাল মেয়ের ছবি করেছ এতেও ওই দোষ হয়েছে। সব সোজা লাইন। সোজা গাছে সাঁওতাল মেয়ে সোজা হয়ে ঠেস দিয়ে আছে।

পা দুটি যেন কাঠের পা। ভগবান আমাদের শরীরে সব জয়েন্ট দিয়েছেন কেন তা হলে? কারভড্‌ লাইনে স্ট্রেট লাইনে মিলে তবে আমাদের দেহ সুন্দর হয়েছে। তোমার ছবির পায়ের ওই শক্তভাব গেল, যখন ওখানে একটি জলের ঘট দেওয়া গেল। তখন ওইভাবে দাঁড়াবার একটা মানে পাওয়া যায়। তখন কেঠো ভাব থেকে জলের তরল ভাবে এসে পড়ল। ঘট দেবার সার্থকতা ওইখানেই।

আর্টে এক-একটা জিনিসের সার্থকতা থাকে। কথায়ই আছে— সমস্ত অর্থটাকে পরিষ্কার করবে, তবেই হয় তার সার্থকতা। নয়তো সবই শক্ত কেঠো ক্রুড করেছ স্ট্রেংথ-এর জন্যে। ছবিতে স্ট্রেংথ থাকবে— তাই সাঁওতাল মেয়েকে দাঁড় করিয়েছ শক্ত ভঙ্গিতে। হাজার হোক— সে হল মেয়ে। হোক না সে প্রিমিটিভ, মেয়ের কমনীয়তা চাই বৈকি।

শুধু তেঁতুলে নয়, তেঁতুলে-মিশ্রিতে মিলে একটা সরবৎ হল। রসের সমাবেশ করা চাই আর্টে। প্রকৃতিও তাই করে।

শিল্পাগারের নামই হচ্ছে আবেশনী; যেখানে শিল্পীরা একত্র হয়ে বসে রস পরিবেশন করে।

ছেলেবেলায় পাকাটিতে কাগজ জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে সিগারেট খেতুম, তাতেও ধোঁয়া বের হত। আর এখন বহু যত্নে করা চুরুট খাই, তাতেও ধোঁয়া বের হয়। এখন, এই দুই ধোঁয়ার তফাত কত, আর কোথায়— দেখতে হবে তো?

শিল্প হচ্ছে আমাদের ভোগের জিনিস। সেখানে ইট চিবোতে দিলে ভোগও হয় না, তেষ্টাও মেটে না।

নন্দদার প্রতি, নন্দদার কলাভবনের প্রতি অবনীন্দ্রনাথের ছিল সর্বদা প্রখর দৃষ্টি। কখন কোন্‌ পথে চলতে হবে, কখন কোথায় থামতে হবে, কোন্‌ বাঁকে মোড় ঘুরতে হবে, সর্বদা তিনি নির্দেশ দিতেন কলকাতায় বসে বরাবর।

নন্দদাও জানতেন; যখন যেমন আদেশ পেতেন সেইভাবে চলতেন।

নন্দদা যেন কোলের ছেলেটি— আগলে আগলে রাখতেন তাঁকে।

কখনো বলতেন 'নন্দলাল কাঁটাবন মাড়ায় নি। কোলে কোলে চলে এসেছে। আমার কোল থেকে খুড়োর কোলে এল।'

কখনো বলতেন, 'আহা, নন্দলালকে যদি আরো কিছুকাল আমার কাছে রাখতে পারতুম তবে এদিকটাও দেখিয়ে দিতুম। তা হলে যে-কথা আজ তোমাদের বলতে হচ্ছে তা আর বলতে হত না আমাকে। কিন্তু তার আগেই তাকে শান্তিনিকেতনে আসতে হল। রবিকা চাইলেন কলাভবনের জন্য নন্দলালকে, 'না' বলি কী করে।

এবারে অবনীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে আশ্রমে আসছেন, সঙ্গে আছি আমরা। ট্রেনে বসে বসে অনেক কথা বললেন। বললেন, বহুকাল আগে আমি যখন শান্তিনিকেতনে এসেছিলুম, তখন নন্দলালকে বলেছিলুম— 'নন্দলাল, পুতুল গড়ো ছেলের মন ভোলাবার জন্য।' তখন ওইটি ওদের দরকার ছিল। এবারে বলব 'রিয়ালিষ্টিক' জিনিস করো।

ওরা বড়ো আটকা পড়ে গেছে 'কনভেনশনে'র মধ্যে। এই ধর-না, রবিকা গান লিখে গেছেন, সেই গানে শান্তিনিকেতনকে পাই। তিনি 'কনভেনশনে'র ভিতর দিয়ে যান নি। কিন্তু এখনকার তোমাদের ছবিতে তো শান্তিনিকেতনকে পাই নে।

তালগাছ কর, কনভেনশনাল তালগাছ; তার তলায় কতকগুলি মানুষ ছেড়ে দাও, যেন পুতুল গড়াচ্ছে। এ কেন হবে? দেখ, দেখতে শেখ। কত আছে এ পৃথিবীতে দেখবার। তালগাছ, তাকে নিজের রূপ নিজের সৌন্দর্য, তার আশপাশের শোভা দিয়েই ফুটিয়ে তোলো। প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে যাও কেন?

অনেক সময়ে আমরা কাছের জিনিস দেখি নে। এই তো— চার দিকে ছবি ছড়ানো, এই আমাদের বাংলা দেশ, পুকুরঘাট, এ-সবের কত সৌন্দর্য। এর আসল রূপটা কেউ নিলে না। এই আমার দুঃখ। যে যেটুকু নিয়েছে অতি কদর্য দিকটাই নিয়েছে শুধু। এই যে বাড়িগুলির ছাদে সূর্যাস্তের আলো পড়েছে, পরপর গাছগুলি চলে গেছে; মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। মন চলে যায় একেবারে ওর ভিতরে। ছবিতেও তাই হওয়া চাই। মন একেবারে ছবির ভিতর দিয়ে চলে যাবে ওই দূরে সবুজের পর সবুজ গাছগুলির মতো।

এই দেখ, দেখ, কী সুন্দর হলুদ রঙের শিরীষ গাছটি, পাতা ঝরে গেছে, হলদে রঙের ফলগুলি ঝুলছে, রঙটি তার কী খুলেছে। জলের ধারে গাছটি ঝুলে পড়েছে, মাটিটাকে যেন শিকড়গুলি আঁকড়ে ধরে আছে।

আঁকো, এই গাছেরই একটি ছবি। এঁকে আমাকে দেখাও। 'টেম্পারা' নয়, সাদা রঙ একেবারে ব্যবহার করতে পারবে না। কাগজের সাদা বজায় রেখে এই রঙ ফুটিয়ে তোলো। বড়ো সহজ নয় এ কাজ।

আজকাল তোমরা সাদা রঙ দিয়ে কাগজ লেপে দাও কেন বুঝি নে। এই ধরো গায়ের চামড়া— তার জায়গায় জায়গায় উঁচু-নিচু ; দেখ এইটুকু জায়গার মধ্যে কত রঙ আছে। সেই রঙই একটু বাড়িয়ে কমিয়ে দাও, দেখবে জলজল করে উঠবে। সেইভাবেই ছবি আঁকতে হবে। নয়তো এ যেন সন্ন্যাসীর গায়ের মতো, খড়ি দিয়ে লেপে তার উপর রঙ লাগানো। এতে আসল জিনিসের রস মরে যায়। আজকাল আমার ক্ষমতা নেই, করে দেখাতে পারি নে, বলে যাই, তোমরা কর।

শান্তিনিকেতনে এসে অবনীন্দ্রনাথ নন্দদাকে বললেন, 'রানীকে দেখালুম শিরীষ গাছটি, আহা, কী সুন্দর। দাও দেখি নি কিছু একটা, এঁকে ফেলি।'

হাতের কাছে খানিকটা পেস্টবোর্ড ছিল, কয়েক টুকরো প্যাস্টেল নিয়ে সেই পেস্টবোর্ড খানায় আঁকলেন, সেই ছবি। হালকা হালকা রঙ দিলেন ; প্যাস্টেল একটু একটু ছুঁইয়ে আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে দিলেন। জায়গায় জায়গায় পেস্টবোর্ডের নিজের রঙই থেকে গেল ছবিতে।

আর নন্দদা কোণার্কের পিছনের ঘরে, যে ঘরে বসে আমি ছবি আঁকি, সেই ঘরে বসে চুপিচুপি একখানি ছবি আঁকলেন। তিনিও ছোট্ট একখানা পেস্টবোর্ডের উপরে প্যাস্টেল দিয়েই করলেন ছবি, যেমন শুনেছেন বর্ণনা অবনীন্দ্রনাথের কাছে। জলের ধারে শিরীষ গাছ, চেপটা লম্বা হলুদ ফলগুলি ঝুলছে গাছে। ছবিখানা শেষ হলে নন্দদাও হাসলেন, আমিও হাসলাম।

নন্দদা এঁকেছেন— ডালে ডালে শিরীষ ফলগুলি, যেন ডালের জালে আটকা পড়া হলুদ মাছ এক ঝাঁক।

অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, রবিকা ছিলেন বিরাট মহাপুরুষ। কোথায় তুলে দিয়েছেন সাহিত্যকে, তার কি নাগাল পাবার জো আছে? এমন একটা স্তরে তুলে দিয়ে গেছেন— সেখানে উঠতে হবে না কারো।

আমাদের আর্ট সে ধাপে ওঠে নি এখনো। তেমন লোক জন্মায় নি আজও। হয়তো ধীরে ধীরে উঠবে একদিন। তাড়াতাড়ি নয়, সময় লাগবে। এই আমরা সব বীজ বপন করে দিয়ে গেলুম, এই নন্দলাল— তার কলাভবন, সে

সব বাঁচিয়ে রাখবে। এরও দরকার আছে। জায়গায় জায়গায় এভাবে বেঁচে থাকতে থাকতে একদিন হয়তো ফলে ফুলে ভরে উঠবে ডালপালা মেলে। তার জন্য তাড়াহুড়ো কোরো না। আমি পঞ্চাশ বছর এ কাজ করে গেছি, নন্দলাল ত্রিশ বছর করলে। হাতে হাতে ফল যদি আমরা এখনি না পাই— দুঃখ করবার কারণ নেই।

এ জিনিসের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, সময় অপেক্ষা করে। আমি বলি, ফল পাবার আশাই বা রাখা কেন? থাক-না, আগাছা হয়েই বেঁচে থাক। এই আগাছা থেকেই হয়তো একদিন কেউ এসে ফুল আবিষ্কার করবে, ফল ধরাবে।

আগাছাই তো আগে সব গাছ ছিল। মানুষ তাকে চিনেছে, জেনেছে, আদর করে কাছে টেনেছে; ফুল ফোটাচ্ছে ফল খাচ্ছে।

আমাদের এই বীজও বেঁচে থাকুক আগাছা হয়েই, ক্ষতি নেই তাতে।

চীনাভবনের দেয়ালে ছবি আঁকা হচ্ছে, বুদ্ধদেবের ছবি; অজন্তার কপি। কলাভবনের শিক্ষক ছাত্রছাত্রী সব জড় হয়েছেন সেখানে। একদল আঁকছেন; একদল জোগান দিচ্ছেন, আর দল দেখছেন।

অবনীন্দ্রনাথ এলেন। এলেই বসেন। বসলেই শিল্প সম্বন্ধে কথা বলেন; এ জানা কথা। তাই আঁকার কাজ ফেলে তাঁকে ঘিরে জমল সবাই। আজ এখানেই সভা বসল।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, এবারে তোমাদের বলব বলে ঠিক করেই এসেছি— বলব কনভেনশনাল আর্টের কথা। তোমরা যে 'কনভেনশনাল' আর্ট করছ, কনভেনশন মানে কি? কতটা তোমরা তা থেকে পেয়েছ?

কনভেনশনাল্‌ আর্ট অজন্তা করে গেছে, দেখিয়েছে তার সমস্ত রূপ। এমন জিনিস করে গেছে যা অমর হয়ে আছে; মায় রঙ পর্যন্ত। তোমাদের সে-সব মেটিরিয়েল নেই, তোমরা হারিয়ে ফেলেছ। তা থেকে খানিকটা নিয়েছ মাত্র। তাই নিয়ে 'কনভেনশনাল' আর্ট করছ, ছবি আঁকছ।

আচ্ছা নন্দলাল, জিজ্ঞেস করি, এই যে কনভেনশনাল আর্ট, এতে সত্যিকারের আনন্দ কে কতটুকু পায়? পেতে পারে না। কনভেনশান একটা ধারা তো, ঘেঁষে অনবরত চললে তা থেকে আনন্দ পাওয়া যায় না। ছেড়ে দাও সব ছেলেমেয়েকে। কলাভবনে-বাঁধা কাজ উলটে দাও। ওই দালানের ঘরে

মাস্টারির দরকার নেই। তারা নিজেরা ঘুরে বেড়াক, খুশিমত ছবি আঁকুক।

গুরু আপনার জায়গায় বসে দেখবে, নিজের কাজ করে যাবে। ছেলেমেয়েরা তার কাজ দেখে শিখবে ; তবেই না সত্যিকারের গুরু হতে পারা যায়। গুরু কোন্ রাস্তায় চলতে চান, তাঁর কাজ দেখে ছাত্ররা বুঝবে।

আর, তারা কী চায়। কী খেতে ভালো বাসে তা ভাববে গুরু নিজে। তাদের বুঝবে। আমাকেও তো নন্দলালদের এ-সব নিয়ে ভাবতে হত। এখনো ভাবছি।

এ এক দুদিনের চেষ্টায় নয়, সময় লাগবে। নয়তো যতই কর পাঁচশো বছরেও আর্ট আসবে না। একটা অবনীন্দ্র কি নন্দলালে কি হবে? পঞ্চাশটা অবনীন্দ্র-নন্দলাল আসবে, তবে যদি হয়।

এক সময়ে কথা উঠল আমি ছবিতে সব টেকনিক মিলিয়ে 'কেমিক্যাল কম্বিনেশন' করেছি তা নয়। তখন আমাকে একটা দিক নিয়ে জোর করতে হয়েছিল। একটা লম্বা মোটা শক্ত ফোর্সপাম্প দিয়ে জল তুলতে হয়েছিল। নয়তো বেগে জল উঠত না। পড়তও না।

দেশে যে তখন জল ছিল না একেবারে। তাইতো ফোর্সপাম্পের দরকার হয়েছিল।

তখন চার দিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি ; কোথায় ইণ্ডিয়ান আর্ট, কোথায় ইণ্ডিয়ান আর্ট। কটকের তাস এল উলটে পালটে দেখলুম ; ভাবলুম এই কি শেষ? রবিকা রবিবর্মার ছবি এনে দিলেন, তাতেও মন উঠল না। অজন্তার খবর পেলুম, সেখানে যেতে পারি নে। কোথায় বই পাওয়া যায় খোঁজ করতে করতে রমজান দুশো টাকা দিয়ে কোত্থেকে দুখানা বই জোগাড় করে আনল।

ভালো করে দেখলুম। একটি পাতায় অজন্তার স্টাইল, টেকনিক, অরনামেন্টাল, সব কিছু স্টাডি করলুম। ওই একটি পাতার বেশি নয়। একটি পাতাতেই অজন্তার সব কিছু জানা হয়ে গেল। বইয়ে দেখলুম হরিণ দৌড়োচ্ছে, ভালুক বসে আছে— বেশ লাগল ; কিন্তু সব হরিণই নয়। বুদ্ধ, অজন্তাও পারে নি বুদ্ধ আঁকতে।

তার পর অজন্তার স্টাইলে 'মাতার ড্রিম' আঁকলুম, ছোট্ট একটি ছবি। বুদ্ধ আঁকি— কেষ্টর সিরিজ হয়ে যায়। সরে এলুম সেখান থেকে।

মোগল-পেন্টিং দেখলুম। হ্যাঁ টেকনিক বটে। দেখবার মতো, নেবার মতো। সে যেন 'অ্যারাবিয়ান নাইট্‌স'এর গুহা খুলে দেবার মতো। কী মাস্টারি টেকনিক।

বিদেশীরা অনেকে বলে থাকেন, অজন্তার কী লাইন, কী তার টান! কিন্তু সত্যি করে বলো দেখি, এই যে তোমরা অজন্তার কপি করছ— এই ছেলেমেয়েরা একটা লাইন টানতে কতখানি সুখ পায়? এর বাহার আছে বৈকি! কিন্তু তা অন্য রকমের। আর মোগল-পেন্টিঙের একখানা পোর্‌ট্রেট হাতে নাও, দেখবে তার রঙ স্টাইল— সে এক অদ্ভুত জিনিস।

একে মোগল-পেন্টিং বলি শুধু মোগলরা আঁকত বলে। এ সম্পূর্ণ ইণ্ডিয়ান। তা নিয়ে আমি যা করেছি তাকে কি 'কেমিক্যাল কম্বিনেশন' বলে?

দোষ, হ্যাঁ, মোগল-পেন্টিঙের দোষও দেখেছি। সব ছবিই সেরকম উঁচুদরের নয়। দু-একখানা পেয়েছি মাত্র। জাহাঙ্গীর বাদশার পোর্‌ট্রেট, হাতে নিতে যেন আতরের গন্ধ পেলুম। এমন সব রঙের কাপড় পরিয়েছে— মনে হয় সত্যি যেন আতর-গোলাপের সুবাস মাখানো। এমনি সব ছবি।

যখন সে-সব ছবির টেকনিক খানিকটা দখল করেছি, সেই সময়ে নন্দলাল প্রশ্ন করলে, আপনি তো করে যাচ্ছেন, আমরা কী করব?

সে-সময়ে দেখলুম দু-একখানা বাদশার মূর্তি ছাড়া আর-সব মূর্তিই যেন প্রাণহীন পুতুলের মতো। সব বেগমই একভাবে বসে আছে, একই এক্সপ্রেশন মুখে, একই দৃষ্টি চোখে। অথচ কাপড়-চোপড় যেন সত্যিকারের কিংখাবের তৈরি। গহনা যেন সত্যিকারের হীরে-মুক্তোতে জলজল করছে।

কিন্তু বেগমে বেগমে, বাদশায় বাদশায়, এক ব্যক্তি আর-এক ব্যক্তিতে যে তফাত তা নেই তাদের ছবিতে। দু-একখানা বাদশার মূর্তিতে, হাতি-ঘোড়ায় বা কুক্কীর ড্রইং থেকে বোঝা যায় কত ইন্‌টিমেট স্টাডি তারা করেছিল নেচারের। কিন্তু তা বেশিদিন নয়, জাহাঙ্গীরের আমল পর্যন্ত।

আমি বললুম নন্দলালকে, তারা যেটা করে যেতে পারে নি, তোমাদের তা করতে হবে। এই-সব পুতুলদের ভিতর চরিত্র ফুটিয়ে তাকে প্রাণবন্ত করতে হবে। চোখের দৃষ্টিতে কথা বলাতে হবে, ভাব ফোটাতে হবে।

তখন তাকে ওই পথ বাৎলে দিলুম। কিন্তু সবটা দেখাবার সময় পাই নি। একটা দিক শুধু দেখাতে পেরেছি। কাল ট্রেনে আসতে, রানী ছিল

কাছে, তাকে ছবির আর-একটা দিক দেখালুম ; যা কনভেনশান-ঘেঁষা নয়। দেখালাম খেজুর গাছ, কেমন সে আপন মহিমায় আপন শোভা ছড়িয়েছে খোলা মাঠে। বললুম, আঁকো দেখি এই একখানা ছবি। খেজুর গাছের নিজস্বতাকে ফুটিয়ে তোলো ছবিতে, তাকে তার আসল রূপ দাও।

রবিকা সেবারে যখন অসিতদের নিয়ে বিদেশ ঘুরে এলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, কী রকম দেখলে ও দেশের আর্ট, রবিকা ?

তিনি বললেন, ফ্লোরেন্সের গ্যালারিতে যখন ঢুকলুম— মনে হল ছবি যেন চার দিক আলো করে রেখেছে।

সেই আলো চাই। এক-একটি মাস্টারপিস ছবি হচ্ছে তাই। আলো যেন ফুটে বের হচ্ছে।

তখন আমি স্বপ্ন-প্রয়াণ, মেঘদূত আঁকি। সবেমাত্র নাম হচ্ছে বাইরে। আমার মেঘদূত দেখে এক বুড়ো পণ্ডিত আমাকে সর্বপ্রথম প্রশংসা করেন। যখন এই-সব ছবি আঁকছি, বড়োজ্যাঠামশায় আমাকে বললেন, তা বেশ, ভালো ছবিই হচ্ছে, বেশ হচ্ছে। তবে অবন, তুমি একটা 'মাস্টারপিস' আঁকো দেখি। সে বড়ো কঠিন জিনিস। সারাজীবন তো কাজ করেছি, এখন পর্যন্ত একটা মাস্টারপিস করতে পেরেছি কি না কে জানে।

মাস্টারপিস করা মানেই হচ্ছে, তুমি মাস্টার হয়ে গেছ ছবির। এ মাস্টারি করা নয়। সে জিনিস আলাদা। তাই তো নন্দলাল, তোমাকে বলি, এবারে ছেড়ে দাও এদের। তুমি শুধু দেখবে চুপ করে। বিদ্যে নিজে দখল করলে যা গৌরব হবে মনে, তা কি পারে এই মাস্টারির ভিতর শিক্ষা পেয়ে ? এই-যে 'আমি পেয়েছি', 'আমি করেছি', এ গৌরব থেকে কাউকে বঞ্চিত করতে নেই। এই যেদিন দেখব আমি, সেদিন বুঝব কলাভবন সার্থক হয়েছে।

রবিকা তাই চেয়েছিলেন। এ কথা তিনি এসে বলতে পারবেন না আর। তাই যেন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমার ভিতর দিয়ে এ কথা বলাচ্ছেন।

নন্দলাল, চেষ্টা করো। তুমি পারবে দিতে। গুরু ইচ্ছে করলে দিতে পারে। তুমি নিয়েছ আমার কাছ থেকে, আমি দিয়েছি। নয়তো বীজ ছড়াবে কী করে ? কী বীজ ছড়াবে তুমি ? এই-যে ছাত্রছাত্রী তৈরি করেছ, এ একটা স্টেপ তোমার সাধনার। এর পরের স্টেপ কী, ভাবো তো।

খুঁজে বের করো। শাস্ত্র দেখো। আমি দেখে যেতে চাই তুমি কোন্ রাস্তায় নৌকো চালাচ্ছ। আমি যে তোমার হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। আমি তো তোমাদের নেবানো আগুন ফুঁ দিয়ে জ্বালাতে বারে বারে আসতে পারব না।

আমি তো বলি, আমি পরিপূর্ণতা পাই নি। তার আগেই বয়সের পরিপূর্ণতা এসে গেছে। তাই ক্ষমতা নেই, বসে বসে খেলনা গড়ি কাঠকুটো দিয়ে। উইপোকা যেমন শুকনো কাঠ থেকে রস পায়, আমিও একটা পরিপূর্ণ রস পাই এ থেকে। রবিকা অতবড়ো একজন মহাকবি, 'শুনব হাতির হাঁচি' কবিতা তৈরি করেও সেই রসই পেয়ে গেছেন। আর এই আমার খেলনা গড়ার রস, এ দুই একই জিনিস।

অবনীন্দ্রনাথের কথা শুনতে শুনতে কী-একটা বেদনা যেন হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ভারী করে তুলেছে সকলের মন। আমরা যারা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে শুনছিলাম কথা এতক্ষণ, কখন এক সময়ে নত করে ফেলেছি যে যার দৃষ্টি।

দরদী অবনীন্দ্রনাথ চকিতে হাওয়া হালকা করে দিলেন। বললেন, সেবারে যখন এসেছিলুম এখানে, একদিন সিংহের মুখে পড়ে গিয়েছিলুম, জানো কোথায়? সে ভারি মজার ব্যাপার।

তাঁর কথা বলার সুরের খেলাই ছিল এমনি। সুর ছেড়ে দিয়ে আবার পলকে গুটিয়ে আনতেন।

বললেন, তর্ক হচ্ছিল একদিন মেয়েদের সঙ্গে। আমি বলছিলুম, তা তোমরা যত চেষ্টাই করো, মেয়েরা কখনো 'জিনিয়াস' হতে পারে না। মেয়েদের নামই হচ্ছে 'শ্রী— লক্ষ্মী'। তারা সাজবে, সাজাবে, রাঁধবে, বুনবে। চার দিক শ্রীমণ্ডিত করে রাখবে। আর জিনিয়াস হচ্ছে— পৌরুষ; সে অন্য জিনিস। যতই করো— মেয়েরা তা হতে পারে না। তারা লক্ষ্মী। শিব পাগলা খেপা, তাঁকে বলি জিনিয়াস; তাঁর পৌরুষ— সে কি মেয়েদের দ্বারা সম্ভব?

এই-সব তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে। রবিকা কখন এসে ঘরে ঢুকেছেন, পড়ে গেলুম একেবারে সিংহের মুখে। কাঁচুমাচু হয়ে যাই আর-কি! খুড়ো তখন আমাকে নিয়ে পড়লেন, বললেন, মেয়েরা জিনিয়াস হতে পারে না কেন— বুঝিয়ে দাও।

বললুম, সে বোঝাব কী করে। তবে হয় নি আজ পর্যন্ত, এইমাত্র জানি। কত তো বিদুষী মহিলা জন্মেছেন, কিন্তু 'জিনিয়াস' তো কাউকে বলা যায় না।

অবনীন্দ্রনাথ আমাদের মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদেরও তাই বলি। তোমরা শ্রী, জিনিয়াস হতে যেয়ো না। পারবে না তা। না-পারার দুঃখই তখন বাজবে শুধু। তবে, কী জানি, কারো ভিতরে যদি থাকে ফুটে বের হবেই। সরস্বতী, হ্যাঁ, তিনি জিনিয়াস। অথচ কেন যে তাঁর এই রূপ তুলে ধরলে আমাদের সামনে। তাঁর আসল রূপ এ নয়, পৌরুষে ভরা। বেদে সরস্বতীর বর্ণনা পড়ে দেখো।

ইণ্ডিয়ান-আর্ট আমার কাছে ভিখারিনীর সাজে এসেছিল, তা বলেছি সেবারে। একদিন আর্টস্কুলে যাচ্ছি, দেখি জাদুঘরের সামনে এক ভিখারি তার ভিখারিনী মাকে নিয়ে জিরোচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় যাবে?

সে বললে, মাকে নিয়ে কালীঘাটে যাব, তীর্থে।

আমি চমকে উঠলুম, তাই তো! এ ভিখারি তার মাকে কাঁধে করে তীর্থে নিয়ে যাচ্ছে। আমিও আমার ভিখারিনী শিল্পদেবীকে কাঁধে করে নিয়ে এসে আর্টস্কুলে বসালুম।

ইণ্ডিয়ান-আর্ট যখন আমার কাছে এসেছিল সেদিন তাঁর সাজসজ্জা ছিল না। ভিখারিনীর বেশে এনেছিলুম তাঁকে। লেগে গেলুম তাঁর সেবায়, সাজাতে লাগলুম একে একে। নন্দলালদেরও লাগিয়ে দিলুম সে কাজে। ওঁরা আমার ছাত্র নন, শিল্পদেবীর সেবক ওঁরা।

আজ দেখি আমার সেই মাকে এ দুয়োর সে দুয়োর, এ সভা সে সভায় টানা-হেঁচড়া করছে। বড়ো লাগে বুকে। আমি তো একটা জায়গায় এসে ঠেকে গেছি। নন্দলাল, তুমি এবারে ভাবো। তোমার রাস্তা এখনো খোলা আছে।

চাইনিজ ফিলজফিতে আছে, 'যদি কিছু করতে চাও, তবে চেষ্টা কোরো না।' বড়ো খাঁটি কথা। চেষ্টা করে কোনো জিনিস হয় না, তাকে ছেড়ে দিতে হয়।

ছবিতেও তাই। বিনা চেষ্টায় হয়, তবেই তা ছবি। নয়তো রস থাকে না। কী করছি, কে করছে, সব ছাপ পড়ে যায়। ছবিতে ছাপ পড়বে না। ছবি— ছবিই থাকবে।

কেষ্টনগরের মতিলালবাবু; এক বুড়ো তখনকার আমলের, তিনি আমাকে বললেন একদিন, নন্দলাল, সুরেন ছবি আঁকে, বেশ লাগে দেখতে। ভালোই হয়। কিন্তু আপনি যা ছবি আঁকেন তা দেখে মনে হয় না যে কেউ এঁকেছে তা। মনে হয় কোথাও যেন ছিল, কাগজের উপর উড়ে এসে পড়েছে।

আশ্চর্য হয়ে গেলুম। মতিবাবুর মুখ থেকে অমন কথা শুনব কল্পনা করতে পারি নি কখনো।

সত্যিই, তাই হওয়া উচিত ছবিতে। দেখলে মনে হবে যেন, হ্যাঁ, এই ছবি ছিল কোথাও, কাগজে এসে পড়েছে।

সৃষ্টিকর্তা আসেন, যেমন ময়ূর এগিয়ে আসে। আগে ঠোঁট মাথা পা, পিছনে আসে তার পেখম, বিচিত্র রঙে, বিচিত্র বাহারে।

সৃষ্টিকর্তা অপূর্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনি এগিয়ে আসেন নি। সৃষ্টিকে দিয়েছেন সামনে ঠেলে। নিজে আছেন পিছনে।

আর্টের আসল কথাও হচ্ছে তাই।

আজকাল একটা ঢেউ উঠেছে— অগ্রগতি। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, দেখো, জগতের একটা গতি আছে, জগৎ নিজে ঘুরছে— আমরা তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছি। জগতের নিয়মেই আমাদের চলতে হবে। এ না হয়ে উপায় নেই। জগৎ এক দিকে চলছে আর আমরা তেড়ে ফুঁড়ে আর-এক দিকে চলছি; তাকে চলা বলে না। তা ধ্বংসের পথে এগোয়। যে গতিতে ধ্বংস অনিবার্য তাকে তো অগ্রগতি বলে না।

সেকালে কি আমাদের অগ্রগতি ছিল না? তখনকার তাঁরা কি কম অগ্রগতি করে গেছেন? বাংলা দেশই অগ্রগতির শিখরে ছিল। আমাদের বাড়ির কথাই ধরো-না, কর্তামশায় যে সত্যকে পেয়েছিলেন একচুল তা থেকে নড়েন নি কখনো। রবিকা, তিনিও সেই নিয়মেই চলেছেন। তাকেই বলি অগ্রগতি।

আমাদের কালে 'ড্রামা'র অগ্রগতি হল। ছিল ড্রপসিন, এটা ওটা কত কী উঠতে উঠতে, বাদ দিতে দিতে ড্রপসিন সিনারি তুলে দিয়ে সব শেষে রইল শুধু একটি চাদ— একটি তাল। এ কি 'ড্রামা'র অগ্রগতি হল না? কতখানি অগ্রগতি ভেবে দেখো দেখি একবার।

পায়ে পায়ে চলবে। এক পা মাটিতে থাকবে, এক পা হাওয়ায় তুলে এগোবে। নয়তো কি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে অগ্রগতি করবে?

দেশে এখনো কতখানি ফাঁক রয়েছে। একটা দিকই দেখো-না, ছোটো ছেলেদের হাতে দেবার কিছুই নেই এ দেশে। না ছবি, না বই, না পুতুল। আমাদের কথা হয়েছিল— শিশুচিত্তবিনোদনের জন্য বই লিখতে হবে। রবিকা শুরু করলেন, কিন্তু তাঁকে তো বসিয়ে রাখা চলবে না শুধু ছেলেদের বই লিখতে। আমি লিখতে শুরু করলুম, আরো কেউ কেউ লিখতে লাগলেন। ছেলেদের জন্য এখনো যে বই লিখি তা সেই কথা মনে রেখেই।

ড্রামাতে আনন্দ করবে ছেলেমেয়েরা, ঝুড়ি ঝুড়ি ড্রামা লিখে দিলেন রবিকা। ছবির বেলা ঝুড়ি ঝুড়ি ছবি এঁকে সহজ পথ বাৎলে দিলুম, 'নে এবার আঁক্ সবাই'। আমাদের অগ্রগতি ওই রকম।

অগ্রগতি হবে— রথ চলবে, ঘোড়া চলবে— আপনিই চলবে। ঘোড়া কি হাঁকবে 'অগ্রগতি অগ্রগতি' বলে?

কর্তামশায়, রবিকা তাঁরা কি কম অগ্রগতিশীল ছিলেন? মেজো-জ্যাঠামশায় বাপকেও হার মানিয়ে দিলেন। ন-পিসিমা কুচবিহারের মেয়ের সঙ্গে জ্যোৎস্নার বিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণ-বৈদ্যতে বিয়ে— বাপ-মেয়েতে এ নিয়ে দস্তুরমত ঝগড়া। ন-পিসিমা বাপকে বোঝালেন; কিছুতেই দমলেন না। সেকালে কি তিনি অগ্রগতিশীল ছিলেন না?

আমরা চুরুট খেতুম, কিন্তু বড়োদের সামনে নয়। তাঁদের আসতে দেখলেই ধড়মড় করে চুরুটটুরুট ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াতুম। জ্যাঠামশায় জানতেন, বলতেন, তা খাও— খাও-না, ব্যস্ত হবার দরকার নেই। তবে অন্য লোকের সামনে খেয়ো না। তিনি নিজেও অনুমতি পেয়েছিলেন বাপের কাছ থেকে, তামাক খেতে। তাই বলে তাঁর সামনে খেয়েছেন তামাক? কখনো না। আদব-কায়দা মেনে চলতেন খুব।

জ্যাঠামশায়ের পোর্ট্রেট আঁকব— প্যাস্টেলে, বাগানে রঙ কাগজ নিয়ে তৈরি হয়ে বসে আছি; এবার তিনি এলেই কাজ শুরু করি। বেয়ারাকে বললুম, যা বড়োবাবুকে হাতজোড় করে বলে আয় যে, আমি সেলাম জানিয়েছি। সে বেটা ছিল নতুন, জ্যাঠামশায়কে গিয়ে বলেছে যে, ছোটোবাবু আপকো বোলাতা হ্যায়। জ্যাঠামশায় এসে বললেন, অবন,

তোমার বেয়ারাকে একটু আদব-কায়দা শিখিয়ে দিয়ো। ও কিছু জানে না, আমায় গিয়ে এই কথা বলেছে। শুনে আমি কী অপ্রস্তুত।

সেই জ্যাঠামশায়েরই অগ্রগতি কী রকম— মুনীশ্বরের ছেলেকে নিয়ে খাটে বসে আছেন।

জ্যাঠামশায় দেখা করতে যাবেন কয়লাহাটায় দিদিমার সঙ্গে ; খুড়ির কাছে যাবেন, জোব্বা-টোব্বা চলবে না। ধুতি পরে গলায় চাদরটি ঝুলিয়ে, পায়ে চটি-জুতো— চললেন খুড়ির কাছে। কে নিয়ে যাবে, বললেন অবন তুমিই চলো।

সেখানে গিয়ে পেন্নাম করলেন খুড়িকে, ঠিক যেন একটি কচি ছেলে। খুড়ি বললেন, ও, দ্বিজেন্দর, আয় আয়, কেমন আছিস, কতকাল পরে এলি। বলব কী, তাঁর সামনে একেবারে ছোট্ট ছেলেটি— পাকা দাড়ি নিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ। কী রকম বিনয়।

সেখানে অগ্রগতি নয়? সেখানে যদি হুট হাট্ করে সিগার ফুঁকতে ফুঁকতে যেতেন তা হলেই কি অগ্রগতি হত?

বিজয়ায় কর্তামশায়কে তিন ভাই প্রণাম করতে যেতুম, কত সাবধান হয়ে হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে। কর্তামশায় বলতেন, আজ বিজয়া? এসো এসো, কোলাকুলি করি, বলে দুহাতে বুকে টেনে নিয়ে কোলাকুলি করতেন। আমায় বলতেন, দাঁড়াও দেখি সোজা হয়ে— বলে নিজের সামনে খাড়া দাঁড় করাতেন; কাঁধের হাড়গুলি টিপে টিপে দেখতেন, বুকের মাপ নিতেন। বলতেন, চওড়া আছে বুক। বেশ, বেশ, এই তো চাই। লম্বায় কিন্তু ছোটো আছ এখনো আমার চেয়ে— বলে হাসতেন।

সেখানে তো আমরা 'হ্যালো গ্র্যাণ্ড ফাদার, হাউ ডু ইউ ডু' বলে শেক-হ্যাণ্ড করতে যেতুম না। সহজ চলাই অগ্রগতি।

রবিকার সব গানে লেখায়ও এই কথা। কী হবে এ-সব কথা বলে!

সেকালের 'রাখিবন্ধন', সে কী ব্যাপার ভেবে দেখো দেখি। সেকালে বাংলা ভাষার, দেশী সাজের প্রচলন, সে কি কম অগ্রগতি? সেই যে মোজা ছাড়লুম, আজও ছেড়েছি।

দেশের সেই সাহেবিয়ানা ভেঙে দিয়েছিলুম, এখন আবার সেইদিকেই ফিরে যাচ্ছে সব। তা হলেই বোঝো আজকালকার অগ্রগতির 'আউটলুক' কি?

আমাদের দেশের অতীতকে ভুললে চলবে না।

ঈশ্বরবাবু, সেকেলে বুড়ো, তাঁর অগ্রগতি দেখো। তিনি গোড়ায় রবিকার কবিতা গান পছন্দ করতেন না। বলতেন, ও কি কবিতা হল! সেই বুড়োই যখন রবিকার 'হিং টিং ছট' শুনলেন, বললেন, হ্যাঁ, রবি লেখে ভালো।

নতুন কাকীমা ঘোড়ায় চড়ে কলকাতার রাস্তায় বের হয়ে তখনকার সমাজে তোলপাড় তুললেন। মেজোমা শাড়ি পরে গভর্নমেণ্ট হাউসে পার্টিতে গেলেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কী রাগ। আজ যেভাবে তোমরা শাড়ি পরছ তা তো মেজোমারই ইনভেণ্ট করা। তখনকার দিনে শাড়ির চল করা কী সাংঘাতিক অগ্রগতি ভেবে দেখো দেখি।

এই শাড়ি পরা নিয়ে ঠেকেছিলুম ছবিতে। কি ভাবে শাড়ি পরাব? সেখানেও ইনভেণ্ট করতে হবে।

আমার ছবিতে দেখবে বাঙালি সাজ নেই। আঁকলে যে ভালো আঁকতে পারতুম না, তা তো নয়। আঁকলে সেই সাজই চল হয়ে যেত দেখতে ছবিতে। কিন্তু কেন আঁকি নি— বোধ হয় চোখে লাগে নি। তাই মনে হয় নি যে আঁকি।

ছবিতে প্রত্যেকটি জিনিস আমায় ইনভেণ্ট করতে হয়েছে। আমার পূর্বপুরুষ তো আর্টস্টুডিয়ো আর রবিবর্মা? তাঁরাও সেখানে ফেল করেছেন। তাই তো দেখে চটে গিয়েছিলুম, রবিবর্মা মহাদেব এঁকেছেন, ইয়া এক পালোয়ান ভুঁড়ি ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে মাথায় গঙ্গা ধরছেন। সে-সব ভেঙে-চুরে আমাদের আবার নতুন করে করতে হল সব। বাঙালি সাজ চলল না, তার কারণ চোখে লাগে নি। কিন্তু মজুমদার তো আঁকল, চলল কি?

আমি 'ডিজাইনার' নই; কিন্তু নিজের ছবির বেলা করেছি সে কাজ। কোথাও রাজপুত মেশাতে হয়েছে, কোথাও মোগল মেশাতে হয়েছে। মিশিয়ে তাদের চেয়ে ভালো জিনিস করেছি। ছবিকে উঁচু ধাপে নিয়ে গেছি। তারা পুতুল করেছিল, আমি তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছি।

ওই মহাদেবের দাড়ি গোঁফ নিয়ে কি কম ঝগড়া? দাড়ি গোঁফ থাকবে কি থাকবে না। আমি তো সব তুলেই দিলুম ছবি থেকে।

হর-পার্বতীর মূর্তি গড়ালুম, গ্রীক থেকে নেওয়া অবশ্য আইডিয়াটা। এক দিকে হরের মূর্তি, আর দিকে পার্বতীর মূর্তি।

এলাহাবাদে তৈরি হচ্ছে, বিন্দা কারিগর পাথর কাটছে। মহা তর্ক সে মূর্তি নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে। তাঁরা স্নান করতে যান আর মূর্তি দেখে তর্ক করেন। শুধু একজন পণ্ডিত বললেন, এ তো ঠিকই হচ্ছে, এক দিকে হর আর-এক দিকে পার্বতী। নয়তো একমুখে আধাআধি দুই মুখ, দেবতার মুখ কি করাত চালিয়ে কাটব? সেই পণ্ডিত শেষে সব তর্ক থামিয়ে দেন ওই এক কথা বলে।

মূর্তি থেকে সাজ থেকে সব আমাকে ইনভেণ্ট করতে হয়েছে। বাঙালি সাজ একটি করেছি ওই সেই ছবিখানাতে, যেটি কলাভবনে আছে— মা ছেলেকে কোলে নিয়ে নাচাচ্ছে। সেই ছবিখানাতেই শুধু বাঙালি সাজ পাবে। আর আঁকি নি।

বাঙালি সাজের নিন্দে করি নে, কিন্তু কী জানি কেন, আঁকি নি। যা দেখছি তাই এঁকে সন্তুষ্ট হতে হবে— তা হই নি। প্রত্যেক ছবিতে নতুন কিছু দিতে হবে। 'কাজরী' ছবি এঁকেছি; দেখেছি তো কেমন মালকোঁচা মারা হাঁটুর উপর তোলা সাজ! কিন্তু ছবিতে তো তা দিই নি। ছবিতে দিলুম— এই এখন তোমরা যে সাজে নাচো। দেখো, হুবহু মিলে যায়। এখনকার এই সাজ তখন এঁকেছি।

দাদা এঁকেছেন চৈতন্য, দেশী সাজ। কিন্তু আমাকে আবিষ্কার করতে হয়েছে। হয়তো বলবে, তুমি ফেল করেছ। তুমি পারো নি বলে কি আমরা পারব না? পার যদি সে তো ভালো কথা।

আর্টের একটা কোয়ালিটি হচ্ছে, বুকের ভিতর একটা কী-যেন হাত বুলিয়ে দেয়; তার স্পর্শে ঠাণ্ডা একটা ভাব।। সামনে একটা কিংখাব ঝুলিয়ে রাখো, দেখে মনে হবে 'আঃ'।

এই তো অভিজিৎ কার্পেটের উপর শুয়ে আছে। আঁকো দেখি; যেই কার্পেটটি আঁকতে যাবে তখন আর অভিজিৎকে সাদা প্যাণ্ট সার্টে রেখে দিলে চলবে না। তাকে সাজাতে হবে কার্পেটের সঙ্গে মানিয়ে।

জানো, কী বলব দুঃখের কথা, আবার তার সঙ্গে আশ্চর্যও হই এই ভেবে, সেই যুগে যখন চার দিকে সকলে বিলিতি ভাবাপন্ন, বিলিতি সভ্যতার প্রাধান্য সর্বত্র, সেই সময়ে শুধু আমাদের বাড়িটা বেঁচে গেল কী করে! ওই একটি বাড়ি থেকেই তো দেশী ভাব ছড়াল দেশে।

আমি যখন সংস্কৃত কলেজে পড়ি, দীনু মল্লিক আমাকে তাড়া লাগিয়েছিলেন, সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়েছ— পণ্ডিত হবে। যাও যাও 'অমুক'কে বলে কাল থেকে সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হও গিয়ে। পণ্ডিতি করতে হবে না তোমার।

তিনি নিজে তাঁর ছেলেদের সাহেবী শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ করেছিলেন, পুরোদস্তুর সাহেব গড়ে তুলেছিলেন তাদের। এমনিই ছিল তখনকার আবহাওয়া।

তাই ভাবি, সে সময়ে যদি আমাদের বাড়ির সবাই এ নিয়ে না ভাবতেন তবে কোথায় গিয়ে ঠেকতুম আমরা, কে জানে!

রবিকা জ্যোতিকাকামশায় ওঁরা সকলেই যে-যাঁর লাইনে দেশের সম্পদ বাড়ানো যায় কী করে ভাবতেন। কত রকম ভাবে এক্সপেরিমেণ্ট করতেন।

রবিকা ঘর ছেড়ে বাইরে এলেন, শান্তিনিকেতন করলেন; জগতের বুকের মাঝে এখন তার প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু একটি-দুটি জীবন আর দেশকে কত সমৃদ্ধ করবে। এই তো আর্ট; দেখছি তো, শেষ হয়ে এল বলে। একে ধরে রাখবে কারা? নতুন করে কেউ আসে নি আর, আসছে— এমন খবরও যে পাচ্ছি নে।

ভারতবর্ষের লোক, তার প্রতিষ্ঠা হবে কোথায়? এই মাটির উপরেই তার ভর। অশ্বত্থ গাছ টবে রাখো, টব ভেঙে সে শিকড় গাড়বে মাটিতে। নিজের রস খুঁজে খুঁজে নেবে। দেখো-না, আঁকুপাঁকু করে শিকড় যায়, খুঁজে বেড়ায়। আসল শিকড় যেখানে দাঁড়ায় তা নাড়ানো বড়ো মুশকিল। আসল শিকড় না থাকলে তা কচুরিপানা, শেওলার মতো ভেসে বেড়াবে চিরকাল।

শিকড় মেলে খুঁজে খুঁজে ঠিক আত্মার রস যখন খুঁজে পেলুম তখন ছোট্ট ফুল ফোটাই তাতেও ক্ষতি নেই। আমি চাই তুমি— তুমি হয়ে ওঠো। ছোট্ট একটি ফুলগাছ হও— তাও ভালো।

হকুসাই বলতেন, সত্তর বছরে শিখলুম। আর দশ বছর যদি সময় পাই তবে ছবির মতো ছবি আঁকি।

দরদ থাকা চাই। এই দরদ ছিল বলেই তো খুঁজে পেয়েছিলুম। কী পেয়েছিলুম? পেয়েছিলুম আমাদের শিল্পকে। মোগল-আর্ট খানিকটা পরিমাণে বেঁচে ছিল বলেই না আমাদের আর্টকে চিনে নিতে পারলুম? এ যেন নিকট

আত্মীয়কে চিনে নেওয়া গোছের। মোগল আমলে জাহাঙ্গীর সাজাহানের সময়ে মোগল-আর্ট শেষ অবস্থায় এল। মন্দিরের মূর্তি, কারুকাজও। তার পরই ধীরে ধীরে সব তলিয়ে গেল। সেই তলিয়ে যাওয়া শিল্পকে তুলে বের করলুম, তার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করলুম। একটি শিকলে কড়া লাগিয়ে তা টেনে আনলুম। কিন্তু এখন দেখছি কড়ার জোড়া পাকা হয় নি, যাতে করে সে ভার বহন করতে পারে। ঝালাই দিয়ে জুড়েছি মাত্র।

সেইজন্যই ভাবি, এত করলুম, কী লাভ হল তাতে?

আমি চেয়েছিলুম এর ধারা চলতে থাকবে। এখানে একটা আর্টিস্টের পাড়া বসে যাবে।

চল্লিশ বছর আগে এই আমবাগানেই রবিকা একবার বলেছিলেন, এখন তোমরা ছবি আঁকছ, লোকে পয়সা দিয়ে কিনছে। কিন্তু এমন দিন আসবে যখন কেউ আর পুছবে না তোমাদের। পয়সা দেওয়া দূরের কথা, এমনি ছবি কাউকে দিলেও কেউ ঘরে রাখবে না। বলেই, বলেছিলেন, 'সেই দিন এলেই তোমাদের পক্ষে মঙ্গল।'

আমি নেমেছিলুম কম্‌পিটিশনে। মনে ছিল, বলেওছিলুম, তোদের দিয়েই তোদের মারব। ওদের আর্ট শিখেই ওদের গর্ব ভাঙব।

ব্লান্ট, উড্রফ্ ওঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, বলেছিলেন, এ হল কী? আমাদের আর্ট কেন আর আমাদের চোখে ধরে না!

তখন ইণ্ডিয়ান-আর্টের প্রতি মায়ার বশে তাঁরা এ কথা বলেন নি। এমন জিনিস তাঁদের দেখালুম, তাঁরা হার মানলেন। কিন্তু আমাদের দেশের লোক তখনো ঘাড় কাত করেন নি।

হাল ছাড়ি নি। একজিবিশনের পর একজিবিশন করে ভালো ভালো জিনিস চোখের সামনে ধরে তবে তাঁদের চোখ ফোটাতে হয়েছে, ফেরাতে হয়েছে। সেই যে আমাদের দেশের সম্পদ উদ্ধার, এ কেবল মনে দরদ ছিল বলেই। আর, এই দরদের জন্যই দেশ-বিদেশের সব শিল্প ঘেঁটে দেখতে বাকি রাখি নি। আশ্চর্যরকম সব হাতে এসে পড়ত। মন চাইত, ওই রকম একটি মূর্তি ভালো করে দেখতে চাই; চলে এল হাতে 'খণ্ডিতা রাধিকা'। অমুক জিনিসটা আর-একবার দেখলে হত; ঠিক ঠিক সময়ে হাতের কাছে আপনিই এসে পড়ত।

আমি যা পেয়েছিলুম ধরে দিয়ে গেছি আমার ছবিতে। কিন্তু কাগজ আর কতদিন টিকবে? মুছে যাবে, উইয়ে খাবে।

কী করি। দুঃখ হয়। বলে যাই। কোনো দিন হয়তো বুঝতে পারবে তোমরা।

বড়ো কষ্ট হয়। মনে হয় কিছুই করতে পারলুম না। নিজেকেই দোষী মনে হয়।

আর্ট এগিয়ে চলবে। নতুন নতুন জিনিস নেবে বৈকি! নিশ্চয়ই নেবে।

এই তো শাড়ি পরেছ, সুন্দর পাড়টি। 'গ্যাসলাইট' পাড় দেখেছ? আমাদের কালে ছিল গ্যাসলাইট পাড়। তখন সবে রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলছে— তাঁতীরা নিল তা। ডুম দেওয়া গ্যাসলাইট দিয়ে পাড় সাজাল, শাড়ির সারা গায়ে গ্যাসলাইটের বুটি তুলে বাজারে ছেড়ে দিল। দেখতে বেশ লাগত। ঢাকাই শাড়ির উপর গ্যাসলাইটের পাড়, বুটি; তখন কত ফ্যাশান ওই শাড়িরই।

হতে হতে কত এগিয়ে গিয়ে গ্যাসলাইট যখন শাড়িতে উঠল, তখন তুমি ফিরে যাবে সেই অজন্তায়? তা ঠিক নয়।

শোনো গল্প, ওই শাড়ির কথাই বলতে গিয়ে কম তাড়া খেয়েছিলুম রবিকার কাছে? তোমাদের মেয়েদের ব্যাপার আর বোলো না। কত বুঝে চলতে হয়।

কিন্তু সবাইকে তো আবার সব শাড়িতে মানায় না।

রবিকাও বুঝেছিলেন, তাড়া মেরে শেষে আবার ঠাণ্ডা করলেন।

আগে তো বরাবরই সব অভিনয়েই নামতুম, অভিনয় দেখা বড়ো হয়ে উঠত না। তবে ওই 'সাজ কি রকম হল' বলে এক-একটা ফাঁকে নন্দলালকে নিয়ে অডিয়েন্সের মাঝে ঢুকে পড়তুম। রবিকাও বলতেন, আচ্ছা দেখো, দেখে বলো কেমন দেখাচ্ছে।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, কাল বিকেলে বসে বসে ইণ্ডিয়ান-আর্টের কথা ভাবছিলুম।

পুবের আর্টের থেকে বিমুখ ছিলুম আমরা সবাই। ওর থেকে কিছু যে পাবার আছে মনেই আসত না। যখন পুবের আর্টের দিকে ছাত্রদের চোখ

ফেরানোর কাজ আমার উপরে এসে পড়ল, তখন ভাবতে লাগলুম কী উপায় করা যায়। জোর করে ঘাড় ফেরাতে গেলে নিজের দেশের আর্টের দিকে ছেলেরা না তাকাতেও পারে, জবরদস্তি করেছি সেইজন্য।

প্রথম প্রথম আমি, যেমন ছোটো ছেলেকে ভোলায়, একটু রঙ, একটু রূপ, একটু রস নিয়ে কারবার শুরু করলুম। এমনি করে ভুলিয়ে তাদের চোখ এক দিক থেকে আর-এক দিকে ফিরিয়ে দিলুম। আমার দাদা এসে দিলেন একটু ধাক্কা। তখনকার মডার্ন-ইউরোপীয়ান আর্ট যা এখন পুরোনো হয়ে গেছে, ভূকম্পনের একটা দোলার মতো নাড়া দিলে গুরুশিষ্য সবার মনকে। দুলেছিল মন, কিন্তু টলে নি পা নিজের পথ ছেড়ে।

তার পর রবিকা চিত্রকর্মে হাত দিলেন। রবিকা যা আঁকলেন তা নতুন নয়। যখন সবাই বললে 'এ-একটা নতুন জিনিস', আমি বললুম, নতুন নয় এ-জিনিস ; নতুন হতে পারে না।

রবিকা আমাকে একবার বললেন, আচ্ছা, অবন, এই-যে 'কিউবিজ্‌ম্' এল, এটা কিছু বুঝতে পারছি নে। তুমি এ বিষয়ে বুঝিয়ে বলো তো!

আমি বললুম, কী আর বলব রবিকা, রাধার প্রেমও প্রেম, আর কুব্জার প্রেমও প্রেম! 'কিউবিজ্‌ম্' তো নয়, কুব্জাইজ্‌ম্ বলতে পারো। শুনে রবিকা খুশি হয়ে উঠলেন, বললেন, কথাটা বলেছ ভালো অবন।

তাই বলছি, রবিকার আঁকা ছবিকে তো 'কিউবিজ্‌ম্' বলা যায় না, নতুনও বলতে পার না। রবিকার ছবিতে যা আছে তা বহু আগে থেকে হয়ে আসছে। যে-সব রঙ নিয়ে উনি কারবার করছেন, নেচারে সে-সব আছে।

মাঠের ডিজাইন, নদীর জলের ডিজাইন— দেখো, সব ছড়ানো আছে। রবিকার ছবিও এ-সব থেকেই হয়েছে। তাকে নতুন বলব কোন্ হিসেবে?

অর্থাৎ সবই ছিল, সবই আছে নেচারে। রবিকার ছবিতে নতুন কিছু নেই। কিন্তু ভাব নতুন। আমার শুধু এই-ই আশ্চর্য ঠেকে, কেমন করে এই মানুষের হাত দিয়ে এই বয়সে এই জিনিস বের হল। অতীতের কতখানি সঞ্চয় ছিল তাঁর ভিতরে। অতি গভীর অন্তরের উষ্মা ও তাপে এই রঙ রূপ সমস্তই যেন প্রকৃতির খেলাঘরের সামগ্রী— হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দ দিয়ে নির্মিত ; সহসা তার প্রকাশ ঘটল, রূপ পেল।

এই-যে একটা ভলকানিক ব্যাপার, এ থেকে শিখতে পারবে না, হবে না

তা। 'ভলকানিক-ইরাপশন'-এর মতো এই এক-একটা জিনিস হয়ে গেছে। এ থেকে আর্টের পণ্ডিতরা কোনো আইন বের করে যে কাজে লাগাতে পারবে, আমার মনে হয় না।

ভেবে দেখো, এত রঙ রেখা ভাব সঞ্চিত ছিল অন্তরের গুহায়, যার পুরোপুরি প্রকাশ সাহিত্যে হল না, গানে হল না, শেষে ছবিতে ফুটে বের হতে হল, তবে ঠাণ্ডা। আগ্নেয়গিরির ভিতরে ধাতু গলে টগবগ করে ফুটতে থাকে, যখন আর ধরে রাখতে পারে না, ফেটে বেরিয়ে পড়ে চার দিকে ছড়িয়ে যায়, তখনই পাথর ঠাণ্ডা হয়। এও ঠিক সেই একই ব্যাপার।

যা করে গেছেন রবিকা, তা এক-একটি ছোটো ছোটো লাভার টুকরো। ওঁর ভিতরে ছিল। সবাই এ জিনিস বোঝে না। আগ্নেয়গিরির কবল থেকে আগুন আহরণ করে আনা যে কত শক্ত ব্যাপার, সে কি সবাই পারে? আগে জ্বালা ধরুক তবে প্রকাশ পাবে। রবিকা বলতেন, আমার আঁকা ছবি যখন দেখি— যেন কোনো অতীত কালের জিনিস বলে মনে হয়। কত বড়ো কথা। কত এগিয়ে যেতেন যে কয়েক বছর আগের তাঁরই আঁকা ছবি নিজের কাছেই কোনো অতীত কালের ব্যাপার বলে মনে হত।

গাছগুলো যে বীজ থেকে ঠেলে উপরে ওঠে, ঝড়ঝঞ্ঝা সয়, কেন? মাটির নীচে থাকলেই তো পারত। পারে না ভিতরে থাকতে। মাটি ফুঁড়ে আলো আকাশের দিকে বেরিয়ে পড়ে। চার দিকে হাত বাড়িয়ে ডালপালা বিস্তার করে ফুলে ফলে পাতায় ভরে ওঠে, রূপ-রঙের ফোয়ারা ছিটিয়ে প্রকাশ পায়।

রবিকার জিনিসও তাই। এরকম কেউ পারে না, তা নয়। হয়ে গেছে, এই নেচারেই কত হয়ে গেছে। দেখছিলুম আজ একটা গিরগিটি; একটা গিরগিটি, একটা ছোটো ঝিনুকের মধ্যেও এই-সব রঙ আছে। এই-সব সঞ্চয় ছিল তাঁর। আমারও সঞ্চিত ছিল, দিতে পারলুম না। তাই আঁকুপাকু করি, ভাবি, কী করলে কোন্ সাধনা করলে শেষ পর্যন্ত দিতে পারি এই-সব জিনিস। আমি অল্প একটু দিতে পেরেছি— ছোট্ট চড়ুই পাখি তার ছোটো বুকে করে যেমন বাচ্চাকে মানুষ করে— ছোটো চঞ্চুতে করে খাইয়ে তাকে বাঁচায়। তবু, এখনো আমি যেটুকু দিতে পারি, যেটুকু জোর পাই তোমরা তাও পার না। না-দেওয়ার দুঃখ যে কত!

ছবির গোড়ার কথা হচ্ছে রূপভেদ। একটা গাছকে দেখছি, দেখি তার ভিতর হিউম্যান কোয়ালিটি। রবিকা গান গেয়েছেন, 'তুমি কে গো? আমি বকুল।' যেন কিশোরী মেয়েটি ঝরে যাবে দু'দিন বাদে। 'তুমি কে গো? আমি পারুল'— হাসিখুশিতে ভরা, সাজসজ্জার বাহারে উজ্জ্বল। তার যেন বিশেষ একটা গর্ব আছে। 'আমি শিমুল'— একটু লজ্জিত একটু কুণ্ঠিত, যেন সুকুমারী। তিনি তো শুধু ফুল দেখেন নি, দেখেছেন তার ভিতরে এই-সব হিউম্যান কোয়ালিটির রূপ। এই যে রূপভেদ, আমরা দুই-ই দেখি। মানুষের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা, তাই এসে যায় মানুষই। রূপ হল 'ফর্ম', চোখে দেখি, মনেও দেখি। রূপও দু রকম। মানুষের মনে যা দেখি তা মানুষিক ভাব, আর চোখে দেখি প্রকৃতির ভাব। এ দুই মিলিয়ে সৃষ্টির পরিপূর্ণতা। দুই-ই থাকা চাই। মনের দেখাও থাকা চাই, চোখের দেখাও থাকা চাই।

রবিকার গানে, কথায় ও সুরে প্রণয় হয়েছে। তার মাধুর্য আলাদা জিনিস। আবার এক রকম গান— তাতে সুর আছে শুধু। কিন্তু তাতেও একটা ফিলিং আছে। সুর মানে অ্যাকসেন্ট্। তাতে মনে, ভাব রাগ ও অনুরাগের ভাব ধরা দেয়, ভিতরে পৌঁছোয়। সাধারণ কথায় ও সুরের তফাতে মানে বদলায়।

শুধু রঙের বা 'ফর্ম'-এরও একটা 'অ্যাপীল' আছে বৈকি!

বর্ণের 'সিগনিফিকান্স'— যেমন নীল ফুলটি লাল ফুলটি, চোখে লাগে বেশ। অনেক সময়ে মনেও লাগে। মনটা বিক্ষিপ্ত আছে, কালো মেঘ করে এসেছে দেখে মনটা শীতল হয়। চোখের বেলাও তাই। সবুজ রঙ, খোলা বিস্তীর্ণ মাঠ— দেখে চোখটা জুড়োয়। আমরা যখন ছবি আঁকি, কালো রঙ বুলোই, তখনো আমরা রঙ দেখি। কালো শুধু কালো নয়। রাত্তির যেমন কালো হলেও সব রঙই থাকে, এও তাই।

আমাদের আগে তিন ধরনের ছবি হয়ে গেছে। মোগল ছবি, পার্শিয়ান ছবি, অজন্তার ছবি— এ তিনের তফাত আছে, কিন্তু তিনটিই ভালো। ছোটোবড়ো নেই।

মোগল ছবি একটু 'রিয়ালিস্টিক'। পোর্ট্রেট যা করেছে, 'লাইট শেড' পড়েছে, মানুষগুলি মানুষ-ঘেঁষা মানুষ। ফুলগাছ বা নেচারের অন্ত দিকটা

তারা বেশি নেয় নি; মানুষের পিছনে যা একটু-আধটু দিয়েছে— ওই পর্যন্তই। রেমব্রাণ্ট আর-একটু বড়ো, তিনি লাইট শেড-এর কোয়ালিটি বাড়িয়েছেন, কিন্তু মানুষের বাইরে যেতে ততটা সাহস করেন নি।

পার্শিয়ান ছবি— সেও একটা বড়ো জিনিস। তাতে রিয়ালিজম্-এর দিকটা চেপে গেছে। তারা চিত্র লিখে গেছে। তারা রেখার ভঙ্গিতে ভাব ফুটিয়েছে। মেয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছে, মাথার উপরে উইলো গাছটি ঝুলে পড়েছে— সেখানে রেখার ভঙ্গিই আসল। মানুষকে তারা পুতুল সাজিয়েছে। মুখের ধরনও বেশি এগোয় নি। তারা একটা ধারা বেঁধে নিয়েছে পুরুষে মেয়েতে। তার পর পুরুষের বা মেয়ের মুখে আর পার্থক্য বা বিশেষত্ব রাখে নি।

অজন্তা— আমার মনে হয় ওগুলো কেভ-এর ভিতর বুদ্ধের জীবনচরিত লেখার মতো। চরিত্রচিত্রণ, ভিত্তিচিত্রণ, সব বলতে পারো তার মধ্যেই আছে। যথেষ্ট রস নিয়ে কারবার নেই। সেটা পৃথক ধরনের ছবি, নয়তো এড়িয়ে যায় দৃষ্টি। ছবির দিক থেকে তাকে নেবে না। তারা সব-কিছু, এমন-কি, বুদ্ধকেও একটা ধারায় ফেলে নিয়েছিল; দু-একটি প্রিমিটিভ মেয়ে ছাড়া। বোধ হয় যখন ওঁরা কাজ করতেন, গাঁয়ের মেয়েরা এসে দাঁড়াত সেখানে, তাঁদের কাজ দেখত। শিল্পীর চোখে তা এড়ায় নি, তাদের ছাপ পড়ে গেছে ছবিতে। মুঙ্গেরে আমার হত এইরকম, ছবি আঁকতুম, পিঠের দিকে গাঁয়ের ছেলে-মেয়ের ভিড় জমে যেত।

হ্যাঁ, বুদ্ধের মূর্তির কথা বা নটরাজের মূর্তির কথা বলি। তাঁদের যা মূর্তি হয়েছে— মানুষ নয়, তা একটা টাইপ সৃষ্টি করেছে। সে-সব মূর্তির ভিতরে মানুষ পাচ্ছি, অথচ তা ছাড়িয়েও আর-একটা কিছু পাচ্ছি। কত বুদ্ধের মূর্তি ভেঙে গেছে, নাক মুখ নেই, হয়তো কোথাও কোথাও মাথাটাও নেই, তবু বুদ্ধ বলে মনে হয় কেন? তা হচ্ছে লাইনের ভঙ্গি। একটি লতা বেয়ে বেয়ে উঠেছে, লতানো একটা লাইন; তখনি তার ভঙ্গি রয়ে গেল। সেই ভাবেই অ্যাপীল করে জলের ঢেউ, হাওয়ার গতি, মেঘের খেলা। সোজা লাইন— তালগাছ সোজা উপরে উঠে গেছে, একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে। আসল রিয়ালিজম্ হচ্ছে এইখানে। কারণ নেচারের ল শাস্ত হতে হলে যা ভঙ্গি দরকার তা-ই তারা বুদ্ধমূর্তির জন্য নিয়েছে।

ভারতবর্ষ ওই যে-একটা টাইপ সৃষ্টি করেছে, তা এমনি এমনিই হয়ে ওঠে নি। তার ভিতরে আছে নেচারের ইনটিমেট স্টাডি। নিখুঁত স্টাডি করে তবে তারা এক-একটি ধারা তৈরি করেছে। যার জোরে ভাঙা মূর্তিতেও বুদ্ধকে পাই।

লাইনের গুণ নিয়ে রঙের গুণ নিয়ে কনভেনশন সৃষ্টি হয়েছে। চোখে পড়ে আপনিই সব। ফরম্-এর ভাষা আপনিই এসে আমাদের কাছে পৌঁছয়। বলতে পারো তবে এই-সব দেশের লোক নানা যুগে নানা ভাবে ছবি আঁকলে কেন? কথা হল, এদের প্রত্যেকেই যে যেভাবে পারে রস ঢেলে দিতে চেয়েছে। সেই-সব আর্টিস্ট তারা দেশ-কাল-পাত্রের বাইরের মানুষ। তারা উপাদান সংগ্রহ করে বাইরে দেয়। যেমন করে সংগ্রহ করে মধুকর মধু নানা ফুল থেকে বেছে বেছে। তারি মধ্যে যে জায়গায় যে ফুলের আধিক্য মধু যখন খাই তারি গন্ধ পাই। কোনোটা কমলালেবুর মধু, কোনোটা নিমফুলের মধু এমনি টের পাই। মোগল ছবি মোগলরা আঁকত বলেই না তাতে মোগলদের সৌরভ পৌঁচেছে। এটা উপাদানের আধিক্যে হয়।

রঙের অ্যাসোসিয়েশন আছে বৈকি। বাসরঘরে যখন কনে লাল শাড়িটি পরে ঢোকে—সেই লাল রঙটি কি মনে নাড়া দেয় না? আবার সেই লালই যখন আবার সাদা শাড়ি পরে বাপের ঘরে আসে, বুকের ভিতর সে যে কী করে ওঠে! চোখের জল চেপে রাখা যায় কি? রঙের অ্যাসোসিয়েশন তেমনি নাড়া দেয়।

তবে এই অ্যাসোসিয়েশন একেবারে পার্সোনাল জিনিস। কিন্তু সেটাই প্রধান জিনিস নয়। আমার ছেলেটা কালো হোক যাই হোক, তার সঙ্গে যেই আত্মীয়তা, তার কান্নার সুরটা যেমন কানে লাগে, অন্য ছেলেতে কি তা হয়? নিজের সন্তান মায়ার মতো জড়িয়ে রাখে। সেই ভাবেই জাল ছিঁড়ে অন্য যে মায়ারও অতীত জিনিস আছে তা নিতে হবে। বুদ্ধের ভাঙা মূর্তিতে অ্যাসোসিয়েশন ছাড়াও আর-একটা জিনিস আছে, যাতে সবাইকে সে একইভাবে নাড়া দেয়।

এই ধরো পাকুড়গাছটি, সেটি আমি লাগিয়েছি বলে আজ তোমার কাছে তার এত আদর। যখন তুমি আমি আর থাকব না তখন এই অ্যাসোসিয়েশন

—এই পাকুড়গাছ, এ তো আর কারো কাছে ধরা দেবে না। অ্যাসোসিয়েশন ছাড়া যে একটা জিনিস আছে তাতেই সবাইকে একদিন ধরা দেবে, ডালপালা মেলে বড়ো হবে, ছায়া ফেলবে। লোকে বসবে সেই ছায়াতে, পাখি বাসা বাঁধবে গান করবে। গাছ চায় পাখি, পাখি চায় গাছ।

অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে ঢুকে তা ছড়িয়ে উঠবে। নয়তো তুমি যা পাচ্ছ তা অন্যে পাবে না। ধরো-না, এই গাছ যখন হয় মাটিতেই হয়। মাটি ফুঁড়ে সে উঠে আকাশের গায়ে ডালপালা মেলে ধরে, চার দিকে শোভা বিস্তার করে। মাটিতে থাকে সে, কিন্তু মাটির কথা তার মনে থাকে না— অন্য জিনিসে চলে যায়।

এখন মানুষের পক্ষে রুচিকর কোন্‌টা সেটাই দেখতে হবে। মানুষের রুচি অনুসারে রস মিলিয়ে পরিবেশন করতে হবে। এই যে ছেলেমেয়েদের রবিকা এখানে ধরে এনেছেন, এই প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র, আলো বাতাস গাছপালা থেকে তারা কিছু পাবে, তাদের রুচি বদলাবে বলেই। মানুষের মন সহজে টানে একটু রিয়ালিজম্‌-এর দিকে।

যেটা চোখে দেখছি সেটা মনেও দেখতে হবে। কিন্তু হায়, মনে যা দেখছি চোখের দেখার সঙ্গে তাকে মেলাতে গিয়েও বারে বারে ঠেকছি; এই হল আর্টের খেলাঘরের আসল খবর। রঙ ও লেখায় রেখায় বাঁধা পড়েও পড়ছে না মনের মানুষ, এই চরম রহস্য আর্টের। এর ভেদ কেই-বা জানে, কেই-বা জানাবে!

সেই কথাই একদিন জিজ্ঞেস করলাম অবনীন্দ্রনাথকে, যখন ইণ্ডিয়ান-আর্টের কিছুই ছিল না, তিনিই শুধু কী করে এর মধ্যে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়লেন।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, জানতে চাও? কি ভাবে আমাদের বাড়ির কালচার তৈরি হল, এক-এক জন এক-এক দিকে গেলেন, কারো সঙ্গে কারো মিল নেই, আমিই বা অন্য লাইনে গেলুম কেন, শুনবে?

দাদার কথাই ধরো, তাঁকে নিয়েই বলি। তাঁর ছবি সম্বন্ধে নানা সমালোচক নানা কথা বলতে আরম্ভ করেছে, আরো বলবে। দুঃখ হয়, যখন আর্টের কিছু না জেনে কেবলমাত্র নিজেদের পাণ্ডিত্য ফলাবার, বিদ্যে

জাহির করবার জন্যে একটা কোনো উপলক্ষ ধরে নিজের মতো সমালোচনা শুরু করে দেয় গভীরে না গিয়ে। আর এই ভাবেই যখন নানা ভাগে-বিভাগে তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে রস বিলোতে চায় সবাইকে, রস যে তখন কোথায় চলে যায় সেই কথাই ভেবে আতঙ্ক হয়। তাই মোটামুটি আর্ট সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলি, তোমার জেনে রাখা ভালো।

দাদা বাড়ির বড়ো ছেলে। বড়ো ছেলেকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার যা কিছু ব্যবস্থা সবই হয়েছিল। ছবি আঁকা শেখাবার জন্য হরিবাবু আসতেন। লেখাপড়ার জন্য অন্য মাস্টার আসতেন। বাবামশায়ের শখ ছিল বাগানের, শখ ছিল পাখি পোষার। দাদাকেও সেদিকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। খাতা খুলে ছোটোপিসেমশায় দাদাকে জমিদারির হিসাবপত্র বোঝাতেন। ভালোমত শিক্ষা পেয়ে দাদা তৈরি হয়ে উঠবেন, এই ছিল মার ইচ্ছা।

কিন্তু কেন? না, ভালো ছেলে হবে, অন্য বাজে কিছুতে মন যাবে না। এই-সব ছিল তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্য, অবসরবিনোদনের জন্য। দাদাও তাই সব শিখেছিলেন।

বাড়ির অন্যরা, জ্যোতিকাকামশায় বাবামশায় ওঁরাও তাই। জ্যোতিকাকামশায় ছবি আঁকতেন, বাড়িতে যে-কেউ এলেই তাদের মাথার গড়ন স্টাডি করতেন, আর মুখ আঁকতেন। এক শুধু আশুতোষ মুখুজ্জের মুখ আঁকা হয়ে ওঠে নি। বলতেন তিনি, ওই একটি লোক বাদ পড়ে গেছে, নয়তো আর প্রায় সবাইকেই ধরতে পেরেছি।

বাবামশায়ও ছবি আঁকতেন বলেছি তো আগেই। পাখি পুষতেন বাগান করতেন চিত্তবিনোদনের জন্য, অবসরবিনোদনের জন্য।

দাদামশায়েরও ছবি আঁকার শখ ছিল। গৌরীশংকরবাবু প্রথম অয়েল পেন্টিং করেন, দাদামশায়ের সঙ্গে বোটে যেতেন।

বাড়িতে তখন ছবি আঁকার যুগ চলেছে। বাগচিমশায় মেজো জ্যাঠাইমাকে ছবি আঁকা শেখাতে আসতেন। হেম জ্যাঠামশায়ের কড়া লক্ষ্য ছিল, বাড়ির ছেলেমেয়েরা গানে বাজনায় ছবি আঁকায়— সব দিক দিয়ে তৈরি হয়ে উঠবে। এই ভাবে তিনি সবাইকে শিক্ষা দিতেন, রীতিমত স্কুল-মাস্টারের মতো। আমরা তাঁকে দেখে ভয়ে কাঁপতুম। তাঁর মেয়েরা— অভি, প্রতিভাদিদি; তাঁদেরও কেমন শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনি! কেন? কিসের

জন্ম শেখাতেন? এঁরা যে কোনো কাজ করবেন, টাকা উপার্জন করবেন তার জন্ম নয়। সবাই শিক্ষিত উন্নত হবে বলে শেখাতেন।

দাদাকেও সেইভাবেই শেখাবার জন্ম মা ব্যবস্থা করেছিলেন। বই পড়াতেন, অগাধ টাকা খরচ হত তাতেই। আলমারি-ঠাসা বই।

আমি ছিলুম সকলের অলক্ষ্যে পড়ে। ছেঁড়া বই, ছেঁড়া কাগজ, বাবা-মশায়ের টেবিল থেকে একটু রঙ— এই নিয়েই আমার শিক্ষার রাস্তায় চলা শুরু।

রবিকাও ছিলেন সেইরকম। সে সময়ে, তিনি ছবিও আঁকতেন। রবিকার একটি খাতা ছিল, ওমরখৈয়ামের ড্রইং; চমৎকার পেনসিল ড্রইং; অনেকরকম ভঙ্গির মুখ, কোনোটা হাসছে কোনোটা কাঁদছে। কোথায় যে গেল সেই-সব ড্রইং!

রীতিমত শিক্ষা ছিল দাদার। ড্রইং-এ পাকা, অয়েল পেন্টিং-এ পাকা, মাইক্রোসকোপে পাকা— সব ছিল শখের।

কিন্তু আমার, আমার তো আর মাস্টার ছিল না। আমি এর ওর কাছ থেকে দেখে দেখে চটপট সব শিখেছি। তবে শখ ছিল। কোথায় একটু ট্রেসিংপেপার পেলুম, শাসিতে আটকে ছবি আঁকতুম। ছবি আঁকা, এস্রাজ শেখা, প্রথমটায় আমিও চিত্তবিনোদনের জন্যই আরম্ভ করেছিলুম।

এইভাবেই আর্ট থাকে, আমারও ছিল।

সাহিত্যের দিক থেকে প্রথম ডাক দিলেন রবিকা। বললেন, 'ছেলেদের জন্ম লেখো, ছেলেভুলানো ছড়া সংগ্রহ করো।' ওঁর মাথায় ছিল পাবলিককে দেবেন।

এখন এই দেখো, তোমরা বলো কী করে কী হল, এ একটা রহস্য। বাড়ির অন্যরা যে লাইনে গেল আমি গেলুম না কেন? সবাই তো কিউবিজ্‌ম্ করে, আমি করলুম না কেন?

কেননা, সবাই আমরা নিজের নিজের চিত্তবিনোদনের জন্ম বসেছিলুম। আমার তখন চিত্তবিনোদনের মধ্যে ছিল এস্রাজ। গানবাজনার দিক দিয়েও চিত্তবিনোদন হল— কেবলমাত্র নিজের চিত্তের জন্ম। কিন্তু সংসারে আজ যেটা দিয়ে চিত্তবিনোদন হচ্ছে কাল সেটাতে হয় না।

ছবিও ছিল চিত্তবিনোদনের জন্মই— সিন আঁকতে হবে, স্টেজ সাজাতে হবে। সবেরই হয় প্রথম উৎপত্তি চিত্তবিনোদনের জন্ম। আমারও তাই।

শেষে এই ছবি আর লেখা আমার গানবাজনাকে মেরে দিয়ে তারাই রইল বেঁচে।

'হব একটা আর্টিস্ট', ইচ্ছে এল মনে, কেন এল তা জানি নে। দেখলুম চিত্তবিনোদন হয় তখনকার মতো; দাসীর মতো পান খাইয়ে গেল, গান শুনিয়ে গেল। কিন্তু মন ভরে না, হৃদয়কে স্পর্শ করে না। চিত্তের যে তাগাদা সে তো দাসীর জন্য নয়, রানীর জন্য। সে তাগাদা যে না অনুভব করছে তাকে কী করে বোঝাব।

সে কী তাগাদা! সামনে কিছু নেই, ইণ্ডিয়ান-আর্ট করতে হবে।

যেন এক অশরীরী আত্মা, সে বললে 'খুঁজে নাও'।

এ কথা আমার জীবনের কথা, সে তো বলেছি। হ্যাভেল আমায় নিলেন, তখনো বুঝি নি তাগাদা কতখানি। বুঝলুম, যখন ছাত্র পেলুম।

ছাত্র বলি নে, পথ চলার সঙ্গী। তাদের পেয়ে তখন অনুভব করলুম আমার ভিতরের তাগিদ।

আমার গুরু তো এমনি আসেন নি। আমার গুরু— মরা গুরু। অজন্তা কিছু শিখিয়েছে। মোগল-রাজপুত থেকেও পেয়েছি কিছু। একেবারে অন্ধকারে যারা পিদিম ধরেছিল তাদের ঋণ তো স্বীকার করতে হবে। তারা হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষ, একদিন যাঁরা আলো জেলেছিলেন।

আর ছিলেন রবিকা। তাঁকে বলেছিলুম, রস কোথায়? সেই রসের পথে চলার সন্ধান বলে দিলেন। এক মুহূর্তে চলা শুরু হয়ে গেল।

আমার আর্ট আমাকে অবসরবিনোদন করতে দিলে না। আমাকে খাটিয়ে মারলে অন্যের অবসরবিনোদন করাবার জন্য। এইখানেই তফাত। যারা গুরু হিসেবে ট্রেইন করে তাদের রাস্তা আলাদা, যারা চিত্তবিনোদনের জন্য করে তাদের রাস্তা আলাদা।

এই দায়িত্ব কারো ছিল না। তাগাদাও এল না আর কারো। গুরু-গিরির দায় এসেছিল এক আমারই। রাস্তা বাতলাতে হল, 'এই ভারতশিল্পের রাস্তা', 'এই ভুল রাস্তা'।

মুখে বলেছি, করেও দেখিয়েছি। তখন কিউবিজ্‌ম্ করো বলে ফেলে রাখলে চলবে না। এক জায়গায় তো রথ চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে!

মিথলজি করালুম— ছিল না। ওরা হাসে— যদি জানই, আগে কী ছিল

তা হলে দেখো তো কোথা থেকে কিসে তুলেছি। এক সময়ে শিবের দাড়ি হবে কি হবে না, কত তর্ক উঠেছিল। শাস্ত্র ঘেঁটে বের করতে হল আমায় 'দেবতারা স্থির যৌবনের প্রতীক'। দাড়ি তুলে দিলুম। দেখালুম ইলোরাতে ও বাঘগুহায় কেমন শিব গড়েছে। ধরে ধরে দেখাতে হয়েছে। কোঁচাসুদ্ধ কার্তিক বদলালুম। সুরেনকে দিয়ে কার্তিক আঁকালুম। তফাত বোঝো।

এ কি আর্টের দিক থেকে কিছু নয়? আর্ট স্কুলের লাইফ আমার ওই করেই গেছে। ছেড়েও দিয়েছি অনেক। সুজাতা বুদ্ধের জন্য দুধ দুইছে, সেখানে ছেড়ে দিয়েছি নন্দলালকে। ইচ্ছেমত সে করেছে।

বেটার ক্লাসের মিথলজি হল। উড্রফ বলতেন, 'তোমাদের দেবদেবীর ভালো ছবি নেই।' বেটার ফরম্-এ চোখ ওদের নিয়ে গেলুম। এইজন্যই মিথলজি সাবজেক্ট নিতে হল।

আজও সেই কথাই বলছি। পূর্বতন ধারার খানিকটা অবধি চলতে হয়। অতীত আর বর্তমানে মিলিয়ে তবে চলতে হবে।

গঙ্গা যদি আসতে আসতে এক জায়গায় আটকে যায়, যদি কেউ আবার তাকে বহাতে চায়, পাথর ঠেলে তাকে পথের বাধা মুক্ত করতে হবে। তবেই সে নানা ধারায় বইবে।

ড্রাজারি পিরিয়ডে একটা আছে। জোর করেই এদের চালিয়েছিলুম। এ করতেই হত।

কোপাই শুকিয়ে গেছে তাকে আনতে হবে, জোর করে কেটে তাকে আনবে, তবে তো? বলতে পারো— এ তো নালা। তা তো আমিও বলি। তা হোক। ইস্টার্ন-আর্ট করবে, সে দিকে মুখ ফেরাতে হবে তো? জোর করে কত ভুলিয়ে তাদের মুখ ফিরিয়ে রেখেছি। এতে দোষ আছে, কিন্তু উপায় ছিল না কিছু। কাউকে যদি পুবে চালাবে সে যদি পশ্চিমে মুখ করে চলে, তাকে তো জোর করেই চালাতে হবে?

যে জিনিস লুপ্ত হতে বসেছে সেই ফল্গুনদীকে আবার আলোতে বহাতে হবে, জোর করেই করতে হয়েছিল তা। তখন এই জোরটুকু না করলে আজ এ হত না।

এখন সবাই যে বলে 'এর গন্তব্যস্থান ছিল না'— নিশ্চয়ই ছিল। আজ

যে ইণ্ডিয়ান-আর্টকে পেয়েছ তোমরা, এটা কী করে পেলে? এইখানে চলবার জন্তই চলেছিলুম আমরা।

দাদা তো বিলিতি আর্ট কপি করেন নি; সেখানে তিনি বাঙালি। সবই জেনে নিয়ে নিজের মতো করে করলেন। আমিও যা পেয়েছি তা নিয়ে আমার চলে গেলে ছিল ভালো। কিন্তু তা তো নয়। আমাকে বললে, 'কী শিখেছ দাও।' হৃৎপিণ্ড উদ্‌ঘাটন করে দিতে হয়েছিল। এখন তা নিয়ে দুঃখ করলে তো চলবে না।

বললেন, আসল কথাটা কী জানো, ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরে গেল। আগের মতো তালে আর চলল না। তাল দ্রুত হয়ে গেল।

এক কাউণ্ট এসেছিলেন জোড়াসাঁকোয়, আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। প্যারিসে তাঁর বাড়ি, আমায় সেখানে নেমন্তন্ন করেছিলেন। তিনি আমার ছবি দেখতে চাইলেন। দু ঘণ্টা বসে একটি-একটি করে ছবি দেখলেন। উঠতে আর চান না। বলেন, জীবনে এই আমি প্রথম বসে বসে ছবি দেখছি।

বললুম, সে কী কথা? তোমাদের দেশে তো ছবির ছড়াছড়ি।

তিনি বললেন, সে কথা ঠিক। কিন্তু আমাদের দেশে বসে ছবি দেখার সময় কোথায়? তাই তো আমাদের ছবি সব বড়ো বড়ো করে আঁকে। আপিসে মোটর হাঁকিয়ে যাই, যেতে যেতে দেখি এক জায়গায় একজিবিশন হচ্ছে, হাতের ঘড়িতে পাঁচ মিনিট সময় আছে— নেমে পড়ি। এক চক্কর ছবিগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে চলে আসি। হয়ে যায় ছবি দেখা। কিন্তু আজ আমার জীবনে প্রথম শিক্ষালাভ করলুম, যে, ছবি কী করে দেখতে হয়।

সেই দেখো, ওদের দেশের লোকই ওই কথা বলে গেছে কতদিন আগে।

আমাদের দেশে এখন সেই সময় এসেছে ছবির জগতেও। বসে দেখবার যেন সময় নেই, বসে আঁকবারও নয়। কিন্তু এ শিল্পীর কথা নয়। শিল্পীর কাজে তাড়াহুড়ো নেই।

কত দিকের কথাই ভাবি। ভাবি, কিছুই হল না, কিছুই করতে পারলুম না। মিছে এতকাল ছবি আঁকলুম।

দেশী শিল্প, দেশী শিল্প করি, দেশী একখানা কাগজ কেউ বার করতে

পারলে না আজ পর্যন্ত। এখনো একখানা ছবি আঁকতে গেলে বিদেশীদের কাছে হাত পাততে হয় একটু রঙ একটু কাগজের জন্য। কত বলেছি, বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি 'ওরে দেশী ছবি আঁকবি, দেশী রঙ তৈরি করতে শেখ আগে, দেশী কাগজ তৈরি কর'। তা কেউ শুনলে না। কেউ এ কাজে লাগল না। এর জন্য একবার একটু ভেবেও দেখলে না। একি কম দুঃখের কথা?

মোগল আমলে দেখো, ছবি আঁকার কাগজ এক-একখানা, যেন আইভরি। এমনি চমৎকার কাগজ তৈরি করত তারা। নিজের জিনিস নিজে যদি রক্ষা না করতে পার, সে কি অন্যের দোষ?

আর্ট 'চলে গিয়েছিল, চলে গিয়েছিল' বল কেন? কিছুই যায় নি, সবই ছিল; কেবল সবার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছিল। নিজেদের জিনিস তারা চায় নি। সব 'সাহেব হব, তাদের মতো চলব'। তাদের আর্ট, তাদের ফার্নিচার, তাদের বোলচাল সব নিতে লাগল। এ দিকে নিজের জিনিস নিজের সম্পদ, দেশের সম্পদ চাপা পড়ল।

দেশে আর্ট ইন ইনডাস্ট্রি হবে, বিলিতি ছবি এনে গ্যালারি সাজানো হল। কী, না দেশের লোকের টেস্ট ইম্প্রুভ করা হবে। এই ছিল তখনকার অবস্থা।

নিজেরাই রাখলে না কিছু, আজ দোষ দিতে যাব বাইরে কাকে? তারা কী করতে পারে নিজেরা যদি ঠিক থাকি।

এই তো ঢাকাই মসলিন, আঙুল কেটে দিল তাঁতীদের, তবুও পারল কি বন্ধ করতে? আজও ঢাকাই মসলিন তৈরি হচ্ছে।

আমাদের দেশের আর্টও একেবারে মুছে যায় নি, নয়তো পেলুম কী করে? ওই তো যখন 'স্বদেশী ভাণ্ডার' খোলা হল, বলু বের হল, দেশের সব জায়গা ঘুরে দেশী আর্ট সংগ্রহ করে নিয়ে এল। পেল তো সে সবই খুঁজে। না-ই যদি থাকবে তবে সে পেল কী করে বলো?

আমরা বলি মুসলমানরা মন্দির ভেঙেছে, মূর্তি নষ্ট করেছে। তারা কটা মন্দির ভেঙেছে, কটা মূর্তি নষ্ট করেছে?

তারা মন্দির ভেঙেছেও যেমন, গড়েও দিয়ে গেছে। তাজমহল তারা দিয়েছে আমাদের। আর আমরা কী করেছি।

আরে, বুদ্ধগয়ার মন্দির ভেঙে গেল, বর্মা থেকে কে-একজন এসে টাকা দিয়ে তার চূড়া তুলে দিয়ে গেল, তবে হল। মন খারাপ হয়ে যায় এ-সব ভাবলে। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন হতাশ হয়ে পড়ছি।

নিজের আমোদ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে এই যে এতকাল ধরে এত আর্ট করলুম, আর্ট আর্ট বলে চেঁচালুম, সে শুধু এইজন্যই ?

কোথাও যে এক ফোঁটা আশার আলো দেখছি নে। মনে ধাক্কা লাগে, তবে কী করলুম এতকাল ? কিছুই করি নি। যে কাজের ফল নেই, তা মিছে।

একখানা বিলিতি বই দেখো, একখানা চীনে-ছবির বই দেখো— কী করে তারা তা ছাপিয়ে বাঁধিয়ে তুলে দিয়েছে লোকের হাতে। বসে বসে তা দেখলেও কাজ দেয়।

এই তো একখানা চীন দেশের সাধারণ স্কেচ বই, দেখো তো কী নিখুঁত। এই কাগজটি বের করতে কম খেটেছে তারা ? ওকাকুরা বলতেন, 'আমাদের দেশে ত্রিশ বছর ধরে এক্সপেরিমেণ্ট করে করে তবে ঠিক কাগজটি বের করতে পেরেছে।' আর আমাদের দেশে এ দিক দিয়ে কেউ ভাবেই না কিছু। কী ছবি আঁকবে তুমি এ দেশে ? কার কতটুকু ইণ্টারেস্ট আছে এ দিক দিয়ে ?

এই তো, 'বাগেশ্বরী' লেকচারে বলতুম যে, তা কটা লোক আসত শুনতে ? শেষের দিকে তো একেবারে কেউ নেই। আশুতোষবাবুকে বললুম, 'আর কেন, এবারে আমায় ছুটি দিন।' বুঝতে পারছি কিছু হচ্ছে না, কাউকে ইণ্টারেস্ট নেওয়াতে পারছি নে। কী হবে আরো লেকচারে ? বুড়োমানুষ, তাঁকে কষ্ট দিয়ে আর লাভ কি ! সারাদিন খাটুনির পর সাতটা অবধি বসিয়ে রাখা— মনে লাগে। তাই বললুম এই তো হল কিছু। এবারে ছুটি পেলেই ভালো। ঘরে গিয়ে ছবি আঁকায় মন দিই।

আশুতোষবাবু বললেন, তা হবে না। কেউ শুনুক চাই না-শুনুক, তুমি পড়বে আমি শুনব ; তবুও তোমার লেকচার চলবে। এ বন্ধ হতে পারবে না।

কম খেটেছি ওই প্রবন্ধগুলির জন্য ? ওই তখন থেকেই তো আমার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপল। এর আগে তো এর দায়িত্বটা অনুভব করি নি। ছবি

এঁকেছি, ছবি আঁকা শেখাচ্ছি; কিন্তু এর যে দায়িত্ব কতখানি তা তখন থেকেই বুঝতে লাগলুম। কত বই, কত শাস্ত্র পড়তে হয়েছে, স্টাডি করতে হয়েছে। ওই লেকচারগুলি তৈরি করা কি মুখের কথা ছিল? প্রথমে তো ভয়েই মরি। লর্ড রিচার্ড বলে পাঠালেন, এই তোমাদের প্রথম লেকচার, আমিও শুনতে চাই। আশুতোষবাবু বললেন, তোমাকে ইংরেজিতে বলতে হবে। শুনে আমি বললুম, তবে আমায় রেহাই দিন। ইংরেজিতে আমি লেকচার দিতে পারব না। যা পারব না তা স্পষ্ট বলাই ভালো।

আশুতোষবাবু বললেন, আচ্ছা, তবে তুমি বাংলাতেই বলো। আমি লর্ডকে বরং বারণ করে দিই।

আমি বললুম, সেই ভালো। লেকচার-টেকচার দেওয়া আমার আসে না একেবারে। কেবল আপনি বলেছেন বলে রাজী হয়েছি। তা প্রথম লেকচারটা আমি দিই, শুনুন; যদি পছন্দ না হয় থেমে গেলেই হবে।

প্রথম দিন লেকচার দেব, অনেকেই এসেছেন, আশুতোষবাবুও এসে বসেছেন একটি চেয়ারে। লিখে এনেছিলুম, ভয়ে ভয়ে পড়ে তো গেলুম, ভাবলুম পরে যা হবার হবে।

লেকচার শেষ হল। আশুতোষবাবু চেয়ারের হাতল চাপড়ে বলে উঠলেন, আমি এই-ই চাই। তুমি বাংলাতেই বলবে। ঠিক হচ্ছে, এমনটিই চেয়েছি।

লেকচার দেবার সময়ে বোর্ডে কত এঁকে এঁকে বুঝিয়েছি, বলেছি। লেখাতে তো সব ধরা নেই। তবু, ওর ভাষাটা একটা নতুন রকমের হয়েছে। আমাকে অনেকে, আশুতোষবাবুও জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি এই-সব নতুন নতুন কথা পাও কোত্থেকে?

বললুম, কী করে বলব? আমি তো সোজাসুজি মনের কথা বলে যাই শুধু।

সত্যিই তাই। ভাষা বের করব বলে তো ভাষা খুঁজি নি আমি। মনের কথা বলতে চেয়েছি সহজ করে, তাতেই যা বেরিয়েছে। তবুও কত আর বলা যায়। শেষে রবিকার কবিতা কোট করে করে কবিতায় ছবিতে মিলিয়ে বলে দিয়েছি।

রবিকা বলতেন, অবন, ও তো আমার কথা নিয়ে তুমি বলছ। তোমার কথা কই?

বললুম, কী করব বলো? কথা বলা তো আমার ব্যাবসা নয়, তাই কথা বলতে গেলে তোমার কথাই নিতে হয়।

শুনে রবিকা হাসতেন, আর কিছু বলতেন না।

আচ্ছা, সেই যে এত বক্তৃতা দিলুম, এত বোঝালুম, এত খাটলুম, কী লাভ হল? সবাই তখন বললে, এ খুব ভালো হল, ইউনিভার্সিটিতে আর্ট ঢুকল, পাবলিক এবার আর্ট নিয়ে ভাবতে শুরু করবে, আর্টের প্রচার হবে— কত কী। কিন্তু তাই কি?

বাগেশ্বরী লেকচারের পরে কী করলুম? তার পরেই কি 'আরেবিয়ান নাইট' আঁকি? মনে পড়ছে না ঠিক।

অবনীন্দ্রনাথ নিজের সুখদুঃখ হাসি কান্না নিয়ে খেলা করেছেন। তিনি হাসতেন না, হাসাতেন; তিনি কাঁদতেন না, কাঁদাতেন।

ছোটোমা মারা গেলেন। শান্তিনিকেতনে খবর এল। পরদিন ভোরের ট্রেনে রথীদা, বোঠান, আমার স্বামী ও আমি রওনা হলাম কলকাতায়।

জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বেলঘরিয়ায় 'গুপ্তনিবাসে' এলেন অবনীন্দ্রনাথ। এই গুপ্তনিবাসেও ছিল দোতলায় 'দক্ষিণের বারান্দা'র মতো এক বারান্দা, প্রায় তেমনি লম্বা চওড়া, তেমনিই দক্ষিণমুখী। সেই বারান্দায় তখন পর পর তিনখানি কৌচের বদলে একখানি মাত্র কৌচ পাতা থাকে, অবনীন্দ্রনাথ সারাদিন সেই কৌচে বসে থাকতেন, আর পাশে একখানি উঁচু কাঠের চেয়ারে বসতেন ছোটোমা। তখন ছোটোমার শরীর ভালো ছিল না, চলাফেরা বেশি করতে পারতেন না। অবনীন্দ্রনাথ কুটুম-কাটাম গড়তেন, ছোটোমা ওই চেয়ারে বসে বসে দেখতেন, অবনীন্দ্রনাথও দেখতেন, ছোটোমা বসে আছেন; দুজনে নিশ্চিন্ত থাকতেন, দুজনকে দেখে।

সুন্দরী তো ছিলেনই ছোটোমা, তার উপরে মুখখানিতে ছিল যেন সর্বদা হাসি ছড়ানো। 'শিল্পীর আঁকা ছবিতে কত পোরট্রেট ছড়ানো থাকে', একদিন এ কথা বলতে বলতে নন্দদা বলেছিলেন, 'অবনবাবুর ছবিতেও কত পোরট্রেট ছড়ানো আছে। ঋতুসংহারে আছে ছোটোমার ছবি, দেখো।'

শেষের দিকে ছোটোমাকে ছেড়ে অবনীন্দ্রনাথ কোথাও যেতে চাইতেন না, পারতেনও না যেতে। পাশাপাশি দুজন আছেন, দুজন দুজনকে দেখতে

পান, তার মধ্যে একজনকে না দেখে অন্যজন যদি খোঁজ করেন 'কোথায় গেল'; সে ভাবনা যে ভাবতেও বড়ো বেদনার।

আশ্রমের বিশেষ প্রয়োজনে একবার অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আসবেন, অনেক ভাবনা চিন্তার পর রাজী হয়েছেন আসতে। সকালে আমার স্বামী ও আমি তাঁকে আনতে গিয়ে দেখি অবনীন্দ্রনাথ সেই সাত-সকালে নীচে টুপি মাথায় দিয়ে লাঠি হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে বসে আছেন। বললেন, 'চলো, চলো, বেরিয়ে পড়ি। কখন হতে লুকিয়ে এসে বসে আছি। নীচে বসেই সাজসজ্জা করে নিলাম। নয়তো টুপি পরে উপর থেকে নীচে নামছি দেখে যদি অলকের মা জিজ্ঞেস করে বসত 'কোথায় যাচ্ছ', তা হলে আর যাওয়া হত না আমার। চলো, আর এক মুহূর্ত দেরি নয় এখানে।'

ট্রেন ছাড়বার বহু দেরি তখনো। আমরা অনেকখানি সময় হাতে রেখেই এসেছিলাম; কিন্তু তিনি ব্যস্ত হয়ে তড়িঘড়ি গাড়িতে উঠে বসলেন। যদি ছোটোমা তাঁর খোঁজ করেন, যদি সে কথা তাঁর কানে আসে!

সেই ছোটোমা চলে গেলেন!

গতকালই সৎকার হয়ে গেছে। পরদিন— তখন বেলা দশটা সাড়ে-দশটা, গুপ্তনিবাসের ফটকের সামনে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলেছি। ফটক হতে খানিকটা পথ, জমি, বাগান, পুকুর; তার পর বাড়ি। ধীরে অতি ধীরে চলেছি। ভাবছি অবনীন্দ্রনাথ হয়তো উপরের বারান্দায় তাঁর সেই কৌচেই বসে আছেন, যেখানে বসেন রোজ। ভাবছি, কী ভাবে দেখব তাঁকে। কী করে গিয়ে আজ তাঁর সামনে দাঁড়াব।

পথের দুধারে সুপারিগাছ, গাছের আড়াল সরে যেতে দূর থেকে দেখতে পেলাম পুকুরপাড়ে বাঁধানো ঘাটের উপরে চাতালের উপর বাঁধানো বসবার বেদীতে বসে আছেন অবনীন্দ্রনাথ।

তাঁকে দেখেই চলা আমাদের থেমে গেল। পা যেন আর নড়তে চাইল না। পুকুরপাড়ে একা এই মানুষ আজ, তাঁর কাছে যাব কী করে? একা তো অনেক সময়েই দেখেছি তাঁকে; কিন্তু আজকের এই একা— যেন বিরাট আকাশতলে নিঃসঙ্গ একাকী এক পর্বতশিখর। এখানে কথা নেই, গান নেই, সুর নেই, কান্নাও নেই।

নিঃশব্দে পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়ালাম। অবনীন্দ্রনাথ কোলের উপরে

আড়াআড়ি পা তুলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছেন, হাতে একটা কুটুম-কাটাম— নাড়ছেন, যেন কিছু গড়ছেন ভাব। লাঠিখানা আড়ভাবে রাখা পাশে।

বাঁধানো চাতালেই মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। করে বেশ খানিকটা তফাতে চাতালের নীচে সিঁড়ির ধাপে ধাপে পর পর আমরা বসলাম।

কারো মুখে কোনো কথা নেই।

আমরা যখন প্রণাম করি অবনীন্দ্রনাথ একবার মুখ তুলে তাকিয়ে আবার হাতের কুটুম-কাটামে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। চুপচাপ বসে আছি। পাথর হয়ে আছি। বুকভরা কান্না বুকে জমে যাচ্ছে।

একসময়ে অবনীন্দ্রনাথ কুটুম-কাটাম থেকে মুখ তুললেন।

বোঠান রথীদা ওঁরা দূরে দূরে বসেছেন, কাছাকাছি ছিলাম আমিই। আমাকে উপলক্ষ করে বললেন, তোমাদের ছোটোমা তো চলে গেলেন।

আবার স্তব্ধতা।

ছোটোমার মুখের কথা বড়ো মিষ্টি ছিল। সুন্দর আধো-আধো কথা ছিল তাঁর।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, ছোট্ট মেয়েটির মতো কথা কইত।

বোঠানরা বলতেন— ছোটো, ও ছোটো হয়েই রইল চিরকাল।

বললেন, বেশ কিছুদিন ধরেই শয্যাশায়ী ছিল।

অবনীন্দ্রনাথ চুপ করে থেকে থেকে একটি-দুটি কথা বলছেন, আবার থামছেন। আমরা রুদ্ধনিশ্বাসে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

বললেন, আমার এই কুটুম-কাটাম দেখতে সে খুব ভালোবাসত।

ইদানিং তো বাইরে এসে বসতে পারত না। কুটুম-কাটাম গড়া হয়ে গেলে ওর বিছানার কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাতুম। যেদিন পছন্দ হত— খপ করে আমার হাত থেকে নিয়ে বালিশের পাশে রেখে দিত।

সে স্মৃতিতে অবনীন্দ্রনাথ একটু হাসলেন। কান্নার অধিক এ হাসি। বললেন, আগের দিনও সকালবেলা কুটুম-কাটাম নিয়ে দেখাচ্ছি, তখন আর হাত নাড়তে পারে না। মুখের ভাবে বোঝালো ভালো হয়েছে।

বললুম, পছন্দ হয়েছে? আচ্ছা বেশ, এই রইল তোমার জিনিস, এইখান থেকে দেখো— বলে, টেবিলের উপরে রেখে দিলুম।

অকস্মাৎ অবনীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, অনেক বেলা হয়ে গেছে, তোমাদের স্নান খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। যাও, ওঠো, আর দেরি কোরো না। আমিও উঠি, বলে লাঠিখানা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

অবনীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির দিকে এগিয়ে চললেন। যেতে যেতে বললেন, তোমাদের ছোটোমা লাঠি ছাড়া চলতে পারত না। কিছুকাল আগে একদিন পড়ে গিয়েছিল, পায়ে চোট পেয়েছিল। তার পর থেকে সব সময়ে লাঠিখানা সঙ্গে সঙ্গে থাকত। লাঠি ছিল তার সঙ্গী। কাল খালি ঘরে ঢুকে দেখি লাঠিখানা পড়ে আছে খাটে। পারুলকে বললুম, যত্নে তুলে রাখো এখানা আলমারিতে।

চলতে চলতে অবনীন্দ্রনাথ থামলেন। পরম এক বিস্ময় তাঁর কণ্ঠস্বরে, বললেন, যে মানুষ লাঠি ছাড়া এক পাও চলতে পারত না, সে আজ এতখানি পথ একা কেমন করে গেল ?

বলেই অবনীন্দ্রনাথ পিছন ফিরে বাড়ির দিকে দ্রুত পা চালিয়ে দিলেন। যেন কী গোপন রাখতে ছুটে চললেন।

তাঁর সেই চলা, সেই পা ফেলা, আমাদের হুহু করে কাঁদিয়ে দিল সেদিন।

ছোটো ছেলেমেয়েরা ছিল অবনীন্দ্রনাথের বড়ো প্রিয়। তাদের জন্য কত ভাবতেন তিনি। বলতেন, যে দেশে শিশুদের জন্য কেউ ভাবে না, সে দেশে কি কিছু সম্ভব ? এই তো এত শিল্পী আছে, শিশুদের হাতে দিতে খেলনার কথা ভাবলে কেউ ? ছোটো শিশু— তার খেলনা নেই। তাকে সেলুলয়েডের পুতুল কোলে করে মানুষ হতে হয়। এই তো আমরা। আর ধর অন্য কোনো দেশ ; জাপানকেই ধর, পুতুলে পুতুলে ছেয়ে ফেলেছে দেশ। ছেলে বাঁচলে জাত বাঁচে।

বললেন, ছেলেদের পড়বার বই নেই। কেউ এদিকে মন দিল না। আমি নিজের হাতে যাদের তৈরি করেছিলুম তাদের মধ্যেও কেউ এ কাজে এল না। এখন শক্তি নেই, বয়স নেই ; সব প্রায় ফুঁকে দিয়ে এসে ঠেকেছি এখানে। শরীরের কল গেছে বিগড়ে, কেবলই জানান দিচ্ছে। এইতো অবস্থা। তাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে যাই, কারো যদি কানে লাগে।

থাকত শক্তি, থাকত সে বয়স, করে দেখিয়ে দিতুম আবার আর-একবার।

সেই তো সে সময়ে আমরা সবাই একসঙ্গে লেগেছিলুম শিশুদের চিত্তবিনোদনের জন্ত। সেই জোড়াসাঁকোর বাড়িরই বড়ো এডিশন এই শান্তিনিকেতন। এই সহজ কথাটা ভুলে থাকলে চলবে না। এখানকার দায়িত্ব অনেক। এখান থেকেই সব বের হবে ; এই তো তিনিও চেয়েছিলেন।

সেই সেবার কিছু শিশুসাহিত্য হয়েছিল। তার পর, আর কোথায় বই ? বই অবশ্য বের হয় গাদা গাদা, বাদশা এনে পড়ে, মাঝে মাঝে আমিও পাতা উলটোই। বইয়ের মলাটের ছবি কী এক-একটা— রাত্তির বেলা দেখে ভয়ে আঁতকে উঠি! বলি, নে, নে, এই বই সরিয়ে নে এখান থেকে। এই কথা মুখ ফুটে বলতে গেলে ঝগড়া বাধে, সবাই তেড়ে আসে। ওকি শিশুদের জন্তে বই! আমি পড়ে বুঝতে পারি নে অনেক সময়ে। আর কী ছাপা! বিলিতি নকল করতে যায়, অথচ তাদের দেশের একটা সামান্ত বই দেখো ছেলেদের জন্ত, কত যত্ন নিয়ে ছাপায়।

অবনীন্দ্রনাথ হাসলেন, বললেন, শোনো মজা। রাজকাহিনী লিখলাম, কোনো-এক পাবলিশার এসে বললেন, 'মশায়, ওই বইটা কোথায় পাওয়া যায় ?'

বললুম, কোন্ বইটা ?

তিনি বললেন, 'ওই যে, যা থেকে আপনি রাজকাহিনী লিখেছেন ? এটা একটা বই থেকেই তো অনুবাদ করেছেন ?'

বললুম, বই তো একটা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু কেন ?

তিনি বললেন, 'আমি 'টড্স্'-এর লেখা 'অ্যানাল্স্ অব রাজস্থান' পড়ে দেখেছি, তাতে তো এ-সব গল্প নেই। বলুন-না কোথায় পাওয়া যায় সে বই ?'

বললুম, তা তো আপনি পেতে পারেন না।

কেন ?

বাইরে সে বই নেই।

তবে কোথায় ?

বললুম, এইখানে, এই মনের মাঝখানে সে বই, তা থেকেই রাজকাহিনী লেখা।

দেখো তো কাণ্ড! কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। ভাবছেন কোনো একটা বই বুঝি আমি লুকিয়ে রেখেছি, তারই বাংলা অনুবাদ রাজকাহিনী।

জগদানন্দবাবু বললেন, ফটিং পাখিটা কিরকম দেখতে?

আমি বললুম, কী করে জানব? ওতো আমার গল্পের পাখি।

তিনি বললেন, সে কি! আমি যে আমার বইয়ে নাম তুলে দিয়েছি।

বললুম, তা থাক্‌-না। একদিন হয়তো ফটিং পাখি এসে যাবে দেখবেন।

তখন কত মজা ছিল ছেলেদের জন্য বই লিখতে।

নানা দিক দিয়ে ভাবতেন তিনি ছোটোদের জন্য। বোঠানকে বললেন একদিন, 'দেখো প্রতিমা, বড়োদের জন্য যেমন, তেমনি ছোটোদেরও একটা স্থান দেওয়া চাই, গান অভিনয় সব কিছুর ক্ষেত্রে। লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে এ-সবও থাকবে।'

খেলার মাঠ— সেখানে যদি হয় যে বড়োরাই শুধু খেলবে, ছোটোরা খেলবে না, তা তো চলে না। কবে ছোটোরা বড়ো হবে তবে ছাড়া পাবে অভিনয় করতে, তাও হতে পারে না। কেননা, গোড়া থেকেই অল্পবয়স থেকেই ছোটোরা অভিনয় করতে চায়, খেলতে চায় রঙ্গমঞ্চে চলাফেরা করে। করেও তাই। দেখো-না, মাথায় একটু কী বাঁধল, কাঠিকঞ্চির তীরধনুক হাতে নিল, রামলক্ষ্মণ সেজে পথের ধারেই রাবণ-বধে উদ্যোগী হল।

তাদের এই ইচ্ছেটুকু এই শখটুকু বজায় রাখার জন্য ছোটো থেকেই তাদের এই রাস্তা খুলে রাখা প্রয়োজন, এই-সব চারুকলায় উৎসাহ দেওয়া দরকার। তাদের খেলার মাঠও চাই, ঘরও চাই, স্টেজও চাই।

বড়োদের দেখাদেখি ছোটোদেরও শখ যায়, অভিনয় করতে চায়। সেদিকটা তো বন্ধ্ করে দেওয়া যায় না। এই যে রাস্তা মুক্ত করে দেওয়া হল, এতে ফল হয়; অনেক ছেলের প্রকাশভঙ্গি থাকে না, তার সে ক্ষমতা জাগবে। নাচবার ক্ষমতা জাগবে, স্ফূর্তি করবার ক্ষমতা জাগবে।

এখন এই যদি হল, জানলেম তাদের এই দরকার, তবে ব্যবস্থাটি করা যায় কী ভাবে। ভালো নাচতে গাইতে পারে এমন লোকের হাতে তাদের শিক্ষার ভার ছেড়ে দিলে, তাতে সুফলও আছে, কুফলও আছে। ছোটোদের প্রধান সম্বল 'অশিক্ষিতপটুতা'। তার মর্যাদা দিতে সুশিক্ষিত মাস্টাররা যদি ভুল করে বসেন? মাস্টারের দরকার ততটুকু, গানের এবং কথার ঠিক সুরটি তাদের গলায় বসিয়ে দিতে হবে শুধু। ব্যস্‌ ওই পর্যন্ত। তার পর যেখানে তারা অভিনয় করবে, নাচবে, সেখানে তাদের ছেড়ে দিতে হবে। এ কী

কখনো হয় যে, ছেলে ছুটোছুটি করবে কী করে তা শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে হবে ?

তাদের তালে মানে নাচ শেখালে হয়তো তারা শিখতে পারবে, তবে সেটা হবে পুতুল-নাচ। শিশুমনের সেই আনন্দরস পৌছবে না তাদের ভাব ভঙ্গি ধরে দর্শকের মনে। গানের সুর বেঁধে দিলুম, ছেলের হাত পা আপনিই সেই কথার ছন্দে গানের সুরে নড়ে উঠবে। এখানে অবকাশ নেই অন্য কোনো বিশেষ তালে ছন্দে তা বাঁধবার। নিজে নিজেই হাত পা তাদের চলতে থাকবে, দুলতে থাকবে। তার সৌন্দর্য ফোটে আপনিই স্বাভাবিক ভাবে।

ছোটো ছেলেকে কে শেখালে কথা ফোটাতে ? কে এমন গুরু আছে যে গোড়া থেকেই শিশুকে ডিক্সেনারি থেকে কথা বলতে শেখায়। আপনিই তার কথা ফোটে।

এও তাই। তাদের অভিনয়ে তাদেরই ছেড়ে দিতে হবে। এই-যে খানিকটা দিতে পারছে, খানিকটা পারছে না, এইখানেই তাদের সৌন্দর্য। মনে রেখো ওই আসল কথাটি, অশিক্ষিতপটুতা। ওই অশিক্ষিতপটুতার চমৎকারিত্তা উপভোগ করবার একটা বড়ো আনন্দ আছে।

বিবিদি ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'কালমৃগয়া' অভিনয় করাবেন। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র আগে গুরুদেব কালমৃগয়া লিখেছিলেন। বিবিদি উৎসাহ-ভরে ছোটো ছেলেমেয়েদের জড়ো করে রোজ উদয়নের পশ্চিমের বারান্দায় গানের রিহার্সেল দেন। নিজে পিয়ানো বাজিয়ে তাদের গান শেখান।

বিবিদি এসে বললেন, অবনদাদা, আমি তো গান শেখাচ্ছি, তুমি ওদের অভিনয়টা দেখিয়ে দাও।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, বিবি, সে কথাই তো হচ্ছিল এতক্ষণ এদের সঙ্গে। অভিনয়ের জন্যে ভেবো না মোটে। তুমি ওদের গলায় গানটা ঠিক বসিয়ে দাও, তা হলেই হবে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে সুর ও কথার ধাক্কা আপনিই অভিনেতাদের চালায়। গানের কাজই হচ্ছে, সুর আর কথা— এই দুটি ধাক্কা দেয় মনকে। বড়োদেরও, ছোটোদেরও। কথা বলতে গিয়ে হাত নড়ে ওঠে কেন ? না, কথা ধাক্কা দেয় শরীরকে। যেমন রেলগাড়ির স্টীম, স্টীমের চাপ অনুযায়ী গাড়ি আস্তে চলে, জোরে চলে। কথা ও সুর হচ্ছে সেই স্টীম, এরই ধাক্কায় এরা চলবে, প্লে করবে। এখানে অনেকটা স্বাধীন রাখতে হয় এদের।

বললেন, বিবি, অভিনয় ওদের কী শেখাব আমি। যখন ছোট্ট মেয়েটি এসে গান করবে—

ও দেখবি রে ভাই, আয়রে ছুটে,
মোদের বকুল গাছে
রাশি রাশি হাসির মতো
ফুল কত ফুটেছে।

তখন বকুলগাছ ডাইনে দেখালো কি বাঁয়ে দেখালো তাতে কী আসে যায়? থাক্-না কেন সে দশ ক্রোশ তফাতেই পড়ে।

মোরা ভোরের বেলা গাঁথব মালা,
দুলব সে দোলায়।

এই গানের দোলনা কোথায় আছে তার ঠিক নেই। গানের সঙ্গে হাত দুলছে তো দোলনা দুলছে দেখতে পাই।

এরা নিজেরা যা করবে তাই ঠিক। এ হচ্ছে অভিনয়-অভিনয় খেলা, খেলাঘর। সত্যিকার অভিনয়, রঙ্গমঞ্চের অভিনয়— তা এদের মাথায় ঢুকলে বিপদ। তখন আর খেলা করবে না, বই আওড়াতে থাকবে।

তাই তো বলছিলুম, আর নাচ যদি শেখাতেই হয় ছোটোদের, তবে আমি ডাকব বড়ো ওস্তাদকে। বলব, এই-যে ছোট্ট মেয়েটি 'ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা মৃদু বায়'— গানের সঙ্গে নাচবে, এর উপযুক্ত নাচ সৃষ্টি করে দাও। এই আমার মেটিরিয়েল। মাস্টারকে তখন অনেক মাথা ঘামিয়ে এই মেটিরিয়েলের উপযুক্ত নাচ বের করতে হবে। সেখানে মাস্টার এগিয়ে আসবে না।

বিবি, ছেলেরা কেমন শিকারের নাচ শিখছে, এ ক্ষেত্রে সে জিনিস দেখবার নয়। এরা কেমন 'শিকার শিকার' খেলছে, 'মুনি মুনি' খেলছে এই দেখবার জিনিস।

তবু একদিন অবনীন্দ্রনাথকে গিয়ে বসতে হল কালমৃগয়া রিহার্সাল দেখতে। একেবারে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের দল, যা করছে নিজেরাও হাসছে— আমরা যারা দেখছি আমরাও হাসছি। রাজা দশরথ না জেনে অন্ধমুনির ছেলেকে তীর ছুঁড়ে হত্যা করেছে। দশরথ এসে অন্ধমুনির কাছে মার্জনা ভিক্ষা করবে, অন্ধমুনি পিটপিট করে তাকায়, দশরথের সঙ্গে চোখোচোখি

হয়, তুই বালকই ফিক ফিক করে হেসে ফেলে। হাসি কিছুতেই আটকাতে পারে না।

বিবিদি বললেন, কী করি অবনদাদা?

অবনীন্দ্রনাথ উঠে গিয়ে দশরথকে বললেন, দেখ্, তুইও অন্ধ হয়ে যা ভয়ে। বাপরে, যদি অন্ধমুনি দুঃখে রাগে শাপমন্নি দেয় তোকে!

বালকটি বুঝল। দু চোখ বুজে ঘাড় গুঁজে রইল। হাসিও বন্ধ হয়ে গেল।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন— দেখলে? এখানে এর বেশি শেখাবার কিছু ছিল না।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, এ যেন ভোমরার পায়ে শিকলি দেওয়া, প্রজাপতিকে দাঁড়ে রাখা।

তিনি বিকেলের আলোচনার রেশ টানলেন আবার সন্ধেবেলা। বিকেলে বোঠান, নন্দদা ওঁদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল; বোঠান বলছিলেন, 'এই-যে আমাদের নাচগান অভিনয় হয়, এর একটা স্থায়ী স্টেজ হলে কেমন হয়?'

সেই কথাই ফিরে ফিরে মনে হচ্ছে তাঁর। বললেন, দেখো, স্টেজটা ঠিক জিনিস নয়। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ক্রমেই স্টেজ একেবারে উঠে যাবে। স্টেজ আর্টিফিসিয়াল মনে হবে। লোকে আর এতে আনন্দ পাবে না। একদল কষ্ট করবে, অভিনয় করবে, আর-একদল মজা করে বসে বসে দেখবে, তা হয় না।

যাত্রাতে তো এ কথা মনে হয় না। দেখেছিলেম এলাহাবাদে রামলীলা, হাজার ছেলেবুড়ো একত্রে বসে রামলীলা দেখছে। আমরাও দেখছি। মনে হল যেন সত্যি রামরাজত্বে এসে গেছি। এ ভাব এসেছিল মনে।

কিন্তু স্টেজে তা হয় না। এর দুঃখ আমি নিজে পেয়েছি কিনা। আমাদের কী একটা অভিনয় হবে, রবিকা বললেন, পর্দাটা একটু ফাঁক করে দেখো তো একবার, কী রকম লোক হয়েছে হল্-এ।

আমি পর্দাটা একটু ফাঁক করতেই দেখি বিরাট আকারের তিন ব্যক্তি বসে আছে সামনের সারিতে। টাকা আছে, টাকার জোরে সিট কিনেছে।

আমি তাড়াতাড়ি সরে এলুম। রবিকা বললেন কি, কী হল? বললুম, ও কথা আর জিজ্ঞেস কোরো না রবিকা।

যা-সব বসে আছে সামনে, তাদের জন্য অভিনয় করব? বন্ধ করে দাও এ-সব।

ভালো লাগে না ভাবতে। টাকা দিয়ে সামনের আসন দখল করে বসে আছে ওই-সব লোক, আর সত্যি যাঁরা সমজদার তারা হয়তো কোথায় পিছনে পড়ে আছেন।

স্টেজ উঠে যাবেই। এ থাকতে পারে না। এজন্য দেখো-না বিদেশে রিভলভিং স্টেজ হয়েছে। ঘুরে যায়, ছবি বদল হয়। ড্রপসিন-টিন সব তুলে দিয়েছে।

স্টেজ কি থাকতে পারে কখনো? এই তো তুমি আমি কথা কইছি, একটা তক্তার উপরে উঠে কথা কই; কেউ কি শুনবে?

আমাদের জীবনই তো স্টেজ। প্রকৃতিতে ছয়টা ঋতু। ফুল ফোটে, চাঁদ ওঠে, সূর্যোদয় হয়, পাখি গান গায়। একটু এদিক ওদিক হয়—হয়তো পাখিরা নানা সুরে গায়, মেঘে নানা দিন নানা রঙ লাগে, ফুলে ফুলে তফাত থাকে; কিন্তু মোটামুটি এই নিয়েই পৃথিবী। তার মধ্যে মানুষ এল তার ট্রাজেডি কমেডি নিয়ে। এই-যে বিশ্বব্যাপী স্টেজ, তার মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে দেখতে হবে নিজেকে। আলাদা কিছু নেই।

অনেক আগে একবার নন্দদার কাছে শুনেছি গল্প, অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে কেবল যাত্রাই লিখে চলেছেন। দুই-এক দিন নয়, কয়েক বছর ধরেই লিখেছেন। আর সেই লেখার পাশে পাশে নানা রঙিন বিজ্ঞাপন, কোরা কাপড়ের উপরে যে সোনালী-রুপালী কাগজের লেবেল থাকে, সেই-সব কেটে কেটে আঠা দিয়ে বসিয়ে যাত্রার ইলাসট্রেশন করতেন। এক-দিন নন্দদা দেখেন দেশলাই বাক্সের উপরে যে মেয়ের মুখ আঁকা থাকে তাই কেটে তিনি খাতায় জুড়ছেন। কি? না, অশোকতলায় সীতা বসে আছেন।

সেদিন নন্দদা মহা ভাবনায় পড়লেন। নন্দদার মুখেই শুনেছি সে কথা, নন্দদা বলেছিলেন, সেদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম— এই যদি হবে, তবে আমাদের অত করে ছবি আঁকা কেন শিখিয়েছিলেন আপনি? আমরা এখন কী করি।

অবনীন্দ্রনাথ আরো গভীরভাবে কাটা ছবি জুড়তে মন ঢেলে দিয়েছিলেন। নন্দদা এ প্রশ্নের উত্তর পান নি কোনো।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, ১৯৩৩ সাল থেকে পুরো দশটি বছর ধরে রামায়ণের যাত্রার পালাই লিখেছি খাতার পর খাতায়। কী করে যে এত লিখতে পারলুম তাই ভাবি! কত কাটাকুটি, কত ফেয়ার-কপি করতুম বসে বসে। কত খাতাপত্র চুরিও হয়ে গেল। বারান্দার টেবিলের উপর পড়ে থাকত খাতাগুলো, বাড়ি বদল করবার সময়ে দেখি একদিন সে-সব উধাও। কত কী লিখে যেতুম। এখন দু-চারটে যা ছেলেদের কাছে ছিল, মাঝে মাঝে কাগজে বের করে— দেখি বেশ রস আছে তাতে।

রবিকা বলতেন, 'অবন ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে কী সব লিখছে এত? ওতে কী কিছু আছে?' একদিন আমাকেই ডেকে বললেন, 'দিও তো অবন তোমার খাতাগুলি আমায়, পড়ে দেখব।'

সব কি আর দিই? ভয়ে ভয়ে একটি দুটি খাতা পাঠিয়ে দিলুম রবিকার ঘরে। তিনি পড়ে হেসেছিলেন, বলেছিলেন, অবন এতও লিখতে পার। আর কত কিছু সংগ্রহ করেছ। এর থেকে বাছাই করে ভালো ভালো গল্প বা পালা বের করা যেতে পারে। রেখে দাও। হারিয়ে ফেলো না যেন আবার।

সুরেন, প্রশান্ত ওরাও পড়লে, বললে, কোনো প্লট তো খুঁজে পেলুম না।

প্লট পাবে কোত্থেকে? আমি কি প্লট ভেবে ভেবে লিখেছি? ছোটো ছেলেরা মেয়েরা ফূর্তির সঙ্গে নাচবে গাইবে, এই তো যথেষ্ট। প্লট দিয়ে আমার দরকার?

একবার বাড়ির ছেলেদের দিয়ে নহুষের পালা করিয়েছিলুম। মোহনলাল অজিন ওরা সব সেজেছিল।

ওই আমার এক কীর্তি। যাত্রা করিয়েছিলুম। স্টেজ বাঁধানো-টাধানো কিছু না, বৈঠকখানা ঘরে বসে গেলুম ছেলেদের নিয়ে। রবিকা বসে বসে দেখলেন আর হাসলেন।

শহরের লোকদেরও নেমন্তন্ন করেছিলুম। আমি একটা ভাঙা ঢোলক নিয়ে, তার এক দিকে চামড়া অন্য দিকটায় ফুটো, শব্দ বের হয় না ঠিকমত। কিন্তু ঢোলক বাজাচ্ছি, অ্যাকটিং করতে হবে তো! সেই ভাঙা ঢোলক নিয়েই ঘাড় মাথা ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে মহা উৎসাহে বাজাতে লাগলুম। খুব জমেছিল। যামিনীকান্ত সেন তখন মডার্ন স্টেজ নিয়ে ভাবছেন, লিখছেন।

তিনি বললেন, মশায়, এ এক নতুন রকমের চমৎকার জিনিস হয়েছে। এই-রকমই আমাদের যাত্রাগান হওয়া চাই।

কোনো কিছুরই সাজেশন পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু অ্যাকটিং-এ সবই বোঝা যেত। একটা কাঠের বেঞ্চি শুধু পাতা ছিল পাশে। বন্যায় সব ভেসে যাচ্ছে চার দিক, অজিন হাঁটুর উপরে কাপড় তুলতে তুলতে পাহাড়ে গিয়ে উঠল। পাহাড় পাবে কোথায়, বেঞ্চিটার উপরে গিয়ে সেই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। সে যা চমৎকার! ওই বেঞ্চিটাকেই সবাই তখন পাহাড় দেখছে; আর সতরঞ্চির উপর জল থৈ থৈ করছে।

আত্মারাম পাখি এল, পাখির মতোই হাঁটতে হাঁটতে। সাজগোজ কিছু না, কেবল মুখের দুপাশে কার্ডবোর্ড কেটে সুতো দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলুম। ওই প্রথম মুখোশ ইনট্রোডিউস হল। বীরু হয়েছিল ছাগলছানা। আর-একজন কে যেন সেজেছিল ষাঁড়; সেই কার্ডবোর্ডের শিং বাঁকিয়ে কুতকুত করে কেমন চাইছিল— তা যদি দেখতে!

আসল কথা, ওরা নিজেরা খুবই এনজয় করেছিল। রক্তমূর্তি সেজেছিল কোকো, গালে মুখে লাল রঙ মেখে ছাগলছানা বলি দেবে— বন্‌বন্‌ সে কী নাচ!

এক আসরে ছেলে বুড়োর ওই সমান স্ফূর্তি দেখেছি। প্লট কিছু নেই, কিন্তু মজা ছিল। এখনো মোহনলাল অজিন ওরা বলে আর-একবার হোক না সে-রকম!

হ্যাঁ, এই প্লটের কথায় মনে পড়ল, 'নব-নাটক' পড়ে রামনারায়ণবাবুকে কে যেন বলেছিলেন, 'এতে প্লট নেই।' তার পর নয়রাত্তির ধরে সমানে যখন সাহেবসুবো নটনটী দেশী-বিলিতি নিয়ে নাটক জমজমাট, বুড়ো পণ্ডিত তখন বললেন, 'পলাট নেই বললেই হল? দেখে যা এসে পলাট কাকে বলে?'

আমি তো রবিকার কাছে স্পষ্টই স্বীকার করলুম, প্লট ভেবে তো আমি কিছু লিখি নি। ছেলেরা নাচবে, গাইবে, আমোদ করবে— এই ভেবেই লিখে গেছি। নয়তো নহবের পালায় 'ব্যাং সাহেব' এল কোত্থেকে? আমাদের কালো প্রশান্ত সেজেছিল ব্যাং সাহেব। ধুতির উপরে একটা টাইট পাতলুন পরে সে যখন দুপা ছুঁড়ে উদ্দাম নাচ নাচলে, হেসে বাঁচি নে সবাই।

এ দিকে আবার বুড়ি হরিদাসী, খুকির দাসী, সে দিলে কান্নাকাটি জুড়ে।

রামায়ণের পালা হচ্ছে, বাড়ির গিন্নীবান্নীরা ভক্তি গদগদচিত্তে বসে শুনছেন। মাঝে মাঝে 'হরি হরি' ধ্বনিও হচ্ছে ছড়া-পাঁচালিতে। মেজোবোঠান কানে কম শোনেন, তিনিও বললেন, 'ছোটো ঠাকুরপো, বড়ো সুন্দর হয়েছিল তোমার পালা কিন্তু।'

এখন এই পালায় এক বুড়ি দাসীও ঢুকেছে। ভৃত্যরা দাসী হরিদাসীর কানে গিয়ে লাগিয়েছে, বাবু তোকে নিয়ে ঠাট্টা করেছে। আর যাবে কোথায়! বুড়ি হরিদাসীর কান্না শুরু হল, ওমা কী কথা গো। বাবু আমাকে ঠাট্টা করে যাত্রায় ঢুকিয়ে দিলে। শেষে অনেক করে তাকে ঠাণ্ডা করি।

সেবার সত্যি ভারি মজা হয়েছিল। রবিকা আগাগোড়া বসে বসে দেখলেন। মাঠে, ঘাটে, ঘরে, পথে, গাছতলায় সব জায়গাতেই এই ধরনের যাত্রাগান হতে পারে। জায়গা বা আসবাবের কোনোকিছুর প্রয়োজন নেই। অভিনয় যারা না করছে তারাও তাতে সমানে যোগ দিতে পারে। দর্শক ও অভিনেতা সেখানে মিলে যায়।

চার দিকেই তো স্টেজ বাঁধা, কত ড্রামা হয়ে চলেছে সেই-সব স্টেজে। সেদিন দক্ষিণের বারান্দায় বসে আছি জোড়াসাঁকোয়, বাগানের দিকে চেয়ে। সেখানে খেলবার বয়েস বহুকাল পেরিয়ে গেছে, অথচ ইচ্ছে আছে। দেখছি, একটা বেড়াল চুপচাপ বসে রোদ পোহাচ্ছে দুটো পাম-টবের মাঝে মুখ বাড়িয়ে। একটা ছাগল চরছে আমতলায়, পাতা চিবোচ্ছে। একটা মেথরের ছেলে, বাচ্চা, সে এসে প্রবেশ করল মঞ্চে— যেন স্টেজে। প্রবেশ করেই অভিনয় শুরু করলে, ছাগলে ঘাস চিবোচ্ছে, সেও ছাগল হয়ে গেল, ঘাস চিবোতে লাগল। চিবোতে চিবোতে উৎসাহ বেড়ে গেল— কত লম্ফ ঝম্ফ দিয়ে ঘাস ছিঁড়ছে, দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছে, উলটে-পালটে পড়ছে; এও এক অ্যাকটিং-এর আর্ট। বড়ো একটা অ্যাক্টরের আর্ট দেখে যেমন আনন্দ হয়, তেমনি হল। আমিও বেড়ালটার মতো দেখছি। এমন সময়ে বেড়ালটারও যেন নাট্যমঞ্চে প্রবেশ করবার শখ হল, পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। ছেলের যেমন চোখ পড়া— ছাগল থেকে হয়ে গেল ছেলে। বেড়াল দেখে ছেলের অমনি প্যাঁ করে কান্না!

ড্রামার যবনিকা পড়ল।

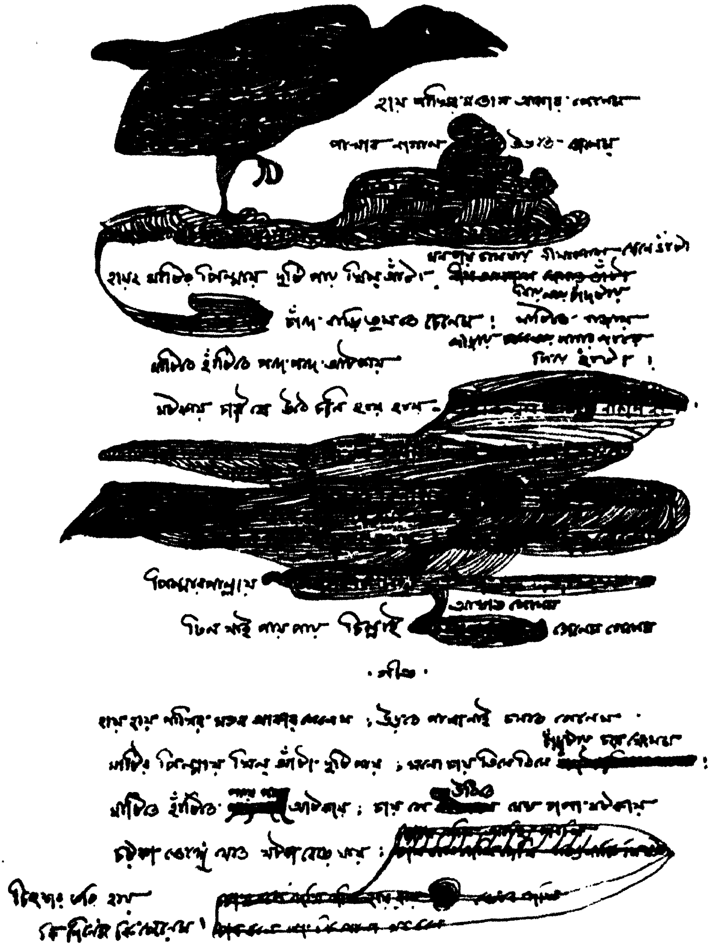

অবনীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি

সেই সেবার এসেছি শান্তিনিকেতনে। দু-চার দিন থেকেই ফিরে যাব। তখন ছিল ওই, আসতুম আর চলে যেতুম। এখনই হয়েছে, এলেই আটকা পড়ি।

তা সেবার যাবার দিন ভোরবেলা উঠে সব ঘুরে বেড়িয়ে দেখছি। ছোটো ছেলেরা যেমন এখন, তখনো তেমনি, রাস্তায় বের হলেই হাত ধরে টানত, বলত, 'আমাদের কাছে আসুন, আমাদের গল্প বলুন'। কয়েকটি ছেলে এসে টানতে টানতে আমায় নিয়ে গেল। তখন সবে শিশুবিভাগ হয়েছে। ওই তোমাদের কলেজ বাড়ির কাছেই ছিল তা। গেলুম।

কোন্ এক মেমসাহেব শিশুবিভাগের ভার নিয়ে আছেন। সেখানে ঢুকেই দেখি নীচের তলায় একটা ছেলে একটা তক্তাতে পেরেক ঠুকছে। ঠুকছে তো ঠুকছেই। পেরেক ঠুকতে ঠুকতে ছেলেটা গলদঘর্ম ; কিন্তু পেরেক ঢুকছে না তক্তাতে।

পেরেক ঠোকার কায়দাটা একটু দেখিয়ে দিতে হয়। অমনি এক টুকরো কাঠ আর হাতুড়ি ফেলে দিলেই তো হয় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক দেখে জিজ্ঞেস করলুম, কী করছিস ? ছেলেটি বললে, পেরেক ঠুকছি মশায়।

তখন এখনকার মতো দাদুটাদু ডাক ছিল না। তখন সবাই বলত 'মশায়'। বেশ ডাক ছিল। এখনই যত আদুরে নাম বের হয়েছে। তা ছেলেটিকে বললুম, কতক্ষণ ধরে পেরেক ঠুকছিস ? সে বললে, সকাল থেকে। কিন্তু হচ্ছে না যে মশায়, কী করি!

বললুম, এক কাজ কর দেখি নি। তালে তালে মার। এক হাতে পেরেকটা ধর আর বল—'এক দুই তিন'— মার হাতুড়ি। ব্যস্— ছেলেটি এক দুই তিন বলে যেই হাতুড়ি পেটা, বক্ করে পেরেক তক্তায় ঢুকে গেল। আর তাকে পায় কে, টপাটপ তক্তায় পেরেক ঠুকে চলল।

তার পর গেলুম অন্য ঘরে। সেখানে নানা রকম আয়োজন করে মেম ছেলেদের নেচার-স্টাডি করাচ্ছেন। খাঁচায় খরগোশ, টবে গাছ, শিশুশিক্ষার সরঞ্জামে ঘর ভর্তি। কিণ্ডারগার্টেন, যেমন ওদেশের শিশুদের জন্য করা হয়।

সব দেখে শুনে তো ফিরে এলুম। রবিকা তখন থাকেন উত্তরায়ণে, ঢুকতে মোড়ের মাথায় যে খড়ের বাড়িটা, সেই বাড়িতে। ঘরে বসে তিনি লিখছিলেন। দরজায় কাঠের রেলিং দেওয়া, যেন কুকুর বেড়াল ঝট করে না

ঢুকতে পারে। দূর থেকে দেখি, পোস্ট-অফিসের দরজায় যেমন তেমনি কাঠগড়ায় মাঝে বসে তিনি একমনে কী লিখে চলেছেন।

আমি আস্তে আস্তে গিয়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলুম। তিনি বুঝলেন, মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলেন, দেখলে সব ঘুরে ঘুরে?

বললুম, হাঁ।

বললেন, কেমন দেখলে, কী মনে হল?

আমার তো এইরকমই কথাবার্তা। বললুম, সবই তো ভালো, ভালোই লাগল। তবে একটা জিনিস দেখে এলুম, তোমার শিশুবিভাগের মূলে কিন্তু কুঠারাঘাত হচ্ছে।

বলতেই রবিকার চেয়ারটা ঘুরে গেল। কলম রেখে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালেন আমার দিকে। সে কী চাহনি! এখনো চোখে ভাসছে। শাবককে খোঁচা দিলে সিংহী যেমন কট্‌মট্‌ করে তাকায়, তেমনি।

রবিকা বললেন, তার মানে? কী বলতে চাও?

বললুম, সত্যিই আমার তো তাই মনে হল। তোমার এখানে শিশুরা মুক্তি পাবে, মনের আনন্দে শিখে চলবে, তা নয়, এক জায়গায় বন্দী করে কাঠে পেরেক ঠোকাচ্ছে। খাঁচার খরগোশ দিয়ে বন্য জন্তুর বোলচাল বোঝাচ্ছে। টবের গাছ দেখে ল্যান্ড্‌স্কেপ আঁকতে শেখাচ্ছে। একে মূলে কুঠারাঘাত বলব না তো কি?

রবিকা বললেন, তা ওদের তুমি কী বললে?

আমি বললুম, আমি ছেলেদের বলে এলুম, খাঁচায় তো খরগোশ রেখেছিস, খাঁচার দরজাটা খুলে দে, খোলা মাঠে কেমন দৌড়য় খরগোশ দেখবি। সে বড়ো মজা হবে।

রবিকা শুনে হাসলেন, বললেন, তুমি এ কথা বলেছ তো? বেশ করেছ। তা অবন, তুমি আজই যাবে কি, থেকে যাও-না। আমি নতুন গানে সুর দিয়েছি, আজ গাওয়া হবে। তা না শুনেই তুমি যাবে, এ কেমন কথা?

কিন্তু থাকা আমার হল না। রেলগাড়ি ধরে বাড়িমুখো হলুম। সে রাত্রে গ্রহণ ছিল। ট্রেনে আসতে আসতে দেখলুম— চাঁদে পূর্ণগ্রহণ লাগল। এটা যেন কোথায় কবে আমি লিখেছি মনে হচ্ছে খুঁজে দেখো।

সেইদিনই ওই গানে সুর দেওয়া হয় 'পূর্ণচাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে'।

তার পর আস্তে আস্তে আমি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে পৌঁছলুম, যেন ছাড়া পেয়েছিল যে একটা খরগোশ, সে এসে ঘরের খাঁচায় ঢুকে লেটুসপাতা চিবোতে বসে গেল।

গুরুদেব চলে গেছেন।

উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল।

বাইরের হাওয়া ভিতরের হাওয়া, মনের হাওয়ায় তোলপাড় তুলল। আগস্ট-আন্দোলনে জেলে গেলাম।

অবনীন্দ্রনাথ দুঃখ পেলেন শুনে। তিনি তখন কলকাতায়, আমার এক বন্ধুকে বললেন, রানী জেলে যেতে গেল কেন ? আমার কাছে এলেই তো পারত।

যাবার আগে বন্ধুর হাত দিয়ে তাঁর জন্য একটি বাটিকের লুঙ্গি, আর চামড়ার উপরে বাটিকের তালতলার চটি একজোড়া বানিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তাঁর জন্মদিনে পরবার জন্য।

জেলে বসেই শুনলাম দিদির চিঠিতে ; সে বছরে অবনীন্দ্রনাথ আবার যখন এলেন আশ্রমে, আমবাগানে এক উৎসবে বাটিকের লুঙ্গিটি চাদর করে গায়ে জড়িয়ে বসেছিলেন। দিদি লিখলেন, 'সে যে কী সুন্দর লাগছিল তাঁকে দেখতে !'

'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী' তার বেশ কিছুদিন আগেই ছাপা হয়ে বেরিয়েছে কলকাতা ইউনিভারসিটি থেকে। জেলে হঠাৎ একদিন এল সেই একখানা বই, অবনীন্দ্রনাথ নিজের নাম সই করে পাঠিয়েছেন আমাকে।

বইখানা হল আমার 'গীতা'। সেখানা সম্বল করে জেলের দিনগুলি কাটিয়ে দিতে লাগলাম।

মুক্তি পাবার দিন ঘনিয়ে এল। কোন্ পথে চলি ? সামনে যেন অনেকগুলি ধারা। কোন্ ধারায় জীবননদীর স্রোত বইয়ে দিই ?

এমনি সময়ে এল ছোট্ট একখানি চিঠি অবনীন্দ্রনাথের কাছ হতে। সঙ্গে ছোট্ট একখানি তাঁর আঁকা রঙিন ছবি।

লিখেছেন, 'নববর্ষে নতুন বন্ধুর জন্য বসে আছি, কবে এসে সে গল্প শুনবে আমার কাছে।'

ছবিখানা : দিবা অবসান, অন্ধকার নেমেছে চারি দিকে, ঘরের সামনে গৃহস্থ বধূ আলো দেখাচ্ছে সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে নিয়ে।

এল আহ্বান, এল ইশারা। মুহূর্তে মন ঠিক হয়ে গেল। ছাড়া পেয়ে সোজা এসে প্রণাম করলাম অবনীন্দ্রনাথকে।

তিনি তখন শান্তিনিকেতনে, মনে হল যেন আমারই জন্য অপেক্ষায় আছেন। সুবিশাল বটবৃক্ষের ছায়ায় পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয় আমার। সারাক্ষণ তাঁর কাছে বসে থাকি। দুজনেই চুপচাপ। যেন কিছু করবার নেই, যেন কিছু বলবার নেই।

আমার মনে একটু আশঙ্কা ছিল যে, আমার উপর তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করবেন। কিন্তু কিছুই বললেন না আমাকে। তাঁর কাছে এসে গেছি, তিনি যেন নির্ভাবনা হলেন আমাকে নিয়ে।

কিছুকাল আগে চার দিকে তখনো ধরপাকড়ের প্রবল উত্তেজনা, সেই সময়ে আম্বালাল সারাভাই তাঁর মেয়ে গীরাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথের কাছে ছবি আঁকা শিখতে। সেই গীরার কথা উল্লেখ করেই বললেন, গীরাকে বললুম এসেছ ভালোই করেছ। ছবি আঁকা আর রাজনীতি দুটো একসঙ্গে চলে না। তোমার মা বাবা ঠিক সময়েই তোমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বললেন, বললুম গীরাকে, যে, শিল্পীর কাজ আলাদা। সে তার জায়গায় স্থির থাকবে। গীরাকে বকে দিলুম। বললুম, রাজনীতি করো তো ছবি আঁকা ছেড়ে দাও। ছবি আঁকবে তো রাজনীতি ছাড়ো। শিল্পীর রাজনীতি আলাদা।

তিনি গীরাকে বলেছেন, গীরাকে বকেছেন, এইভাবে মাঝে মাঝে দু-চার কথা বলতেন। ওই দু-চার কথাতেই যা বোঝাবার তিনি বুঝিয়ে দিতেন আমাকে। আমিও বুঝে নিয়ে আরো চুপ হয়ে যাই। অবনীন্দ্রনাথ কখনো হাতে টুকরো-টাকরা কাঠকুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, কুটুম-কাটাম গড়েন। বেশির ভাগ সময়েই সিঁড়ির মুখে ছোট্ট জায়গাটিতে বসে থাকেন, চুরুট খান। আমি মাটির পুতুলের মতো পাশে বসে থাকি। কিছুদিন কাটল এইভাবে।

বছর-দুয়েক আমি ছবি আঁকি নি। নানা গোলমালে ছবি আঁকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আমার। ছবি আঁকার মনটাই যেন স্তব্ধ ছিল।

একদিন যেন আপন মনেই বললেন, চুপচাপ বসে আছি, একটু ছবি-টবি আঁকলে হয়।

যেন তাঁর নিজেরই ইচ্ছে জাগছে ছবি আঁকতে। অনেক কাল ছবি আঁকেন নি তিনি।

বললেন, কী আঁকা যায় বল দেখি নি? আচ্ছা, এই উদয়নই আঁকি। সকালবেলার রোদ্দুর এসে পড়ে, সে যে কী সুন্দর লাগে দেখতে!

কয়দিন এইরকম বলতে বলতে একদিন সকালে প্রণাম করে কাছে বসেছি, বললেন, আনো তো একখানা কাগজ; আজ মনে হয়েছে ছবি আঁকি।

কাগজ বের করলাম, রঙ তুলি সাজালাম। উদয়নের সামনের দিকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ছোট্ট একটি ঘর, ঘরে দেয়াল নেই, সবটাই কাচের জানালা দিয়ে ঘেরা। কাচেরঘর নামই হয়ে গেছে তার। সেই কাচেরঘরে তাঁর ছবি আঁকবার জল বোর্ড সব কিছু ঠিক করে দিলাম।

তিনি বললেন, বাড়িটার একটা স্কেচ্ চাই। বাইরে দাঁড়িয়ে ওটা তো আমি করতে পারব না, তুমি বাড়ির স্কেচটা করে নিয়ে এসো।

উদয়ন আঁকলাম পেনসিল দিয়ে কাগজের উপরে। নিয়ে এলাম অবনীন্দ্র-নাথের কাছে। তিনি তাতে রঙ দিতে লাগলেন। সারা সকাল ছবিতে রঙ দিলেন, ওয়াশ দিলেন। খাবার সময় হল, তিনি উঠলেন, বললেন, বিকেলে আবার বসা যাবে।

বিকেল তিনটে থেকে আবার ছবি নিয়ে বসলেন। ছবিটি শেষ হল, কোণায় নিজের নাম সই করলেন, আমার নামও লিখে দিলেন। বললেন, থাক তোমার নামও এতে, তুমিও তো করেছ কাজ।

পরদিন বললেন, ওই মাপের আর একখানা কাগজ নাও। আজ কী করা যায়? আজ শ্যামলীটা এঁকে আনো দেখি।

শ্যামলী এঁকে আনলাম। তিনি তাতে রঙ দিলেন, ওয়াশ দিলেন, ধরে ধরে ফিনিশ করলেন; শ্যামলীর ছবি হল একটি।

তার পরদিন আমবাগান। বললেন, যাও-না, ভয় কি? যেমন তোমার ইচ্ছে পেনসিলে এঁকে নিয়ে এসো।

এঁকে আনলাম। তিনি রঙ দিলেন, ওয়াশ দিলেন। বললেন, দাঁড়াও, একটু চুরুট খেয়ে নিই। তুমি ততক্ষণ গাছগুলিতে একটু রঙ দাও, ডাল কয়টা ফুটিয়ে তোলো।

একবার ছবিতে আমাকে দিয়ে কিছু করান, একবার নিজের কোলে

তুলে নেন বোর্ড, ছবিতে রঙ ওয়াশ দেন। হয়ে গেল আমবাগানের ছবি একটি।

আজ?

আজ সিংহ-সদন।

আজ?

আজ ঘণ্টাতলা।

আজ?

আজ দিনান্তিকা।

রোজ ছুটে যাই, সেই-সেই জায়গায় স্কেচ করে নিয়ে আবার ছুটে আসি। অবনীন্দ্রনাথ ছবিতে কিছু বাদ দেন, কিছু জোড়েন। তিনিও ছবিতে কাজ করেন, আমাকে দিয়েও করান। পেনসিলের স্কেচ ছবি হয়ে ওঠে। দুজনেই খুশিতে উপচে উঠি।

এ-যেন এক খেলা আমাদের।

দেখতে দেখতে এমনি করে আশ্রমের নানা-স্থানের এক সেট্ ছবি হয়ে গেল। দুজনের নামসইটা তিনিই করতেন ছবিতে। ওই তখনি একটু শিউরে উঠতাম। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না।

শান্তিনিকেতনের ছবি হয়ে গেল।

এবার?

বললেন, এবার তোমার যা মন চায় আঁকো। কাছের সাবজেক্ট্ই আঁকো। ওই তো বৌদ্ধ-ভিক্ষু—চীনাভবনের এক ছাত্র চলেছে মেহেদি বেড়ার পাশ দিয়ে। আঁকো ওই ছবি একখানা।

এবার?

এই নীলমণিলতার ছবি একখানা আঁকো। রবিকার প্রিয় লতা, নীলমণি-লতা; শখ করে নাম রেখেছিলেন তিনি। আঁকো দেখিনি।

এবার?

ওই কুয়োর একখানা ছবি এঁকে রাখো।

ওই দেখো, তিনটি মেয়ে কেমন চলেছে বইপত্র নিয়ে। তিন সখী। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলেছে, নিজেদের মধ্যে মনের কথা হচ্ছে। এই তো কত সুন্দর ছবি একটি। আঁকো, আঁকো।

পাশে বসে বসে আঁকি। অবনীন্দ্রনাথ সেই-সব ছবির উপর ওয়াশ দেন, রঙের খেলা খেলেন। বিস্ময়ে আনন্দে সে খেলায় ভরে উঠি।

একদিন বললেন, তুমি তো আঁকছ, আমাকেও একখানা কাগজ দাও, আমিও কিছু আঁকি।

আলাদা করে তিনিও আঁকতে শুরু করলেন। ছবির পর ছবি হতে লাগল। কাচের ঘরে তিনি বসে থাকেন, রোজ সকালবেলা এসে প্রণাম করতেই বলেন, দাও কাগজ একখানা, 'দুর্গানাম জপ' করি।

এই দুর্গানাম জপ করা আমাদের একটা ভাষা হয়ে গিয়েছিল। পরে আর কাগজ দাও বলতেন না, বলতেন, দাও দেখি, আগে দুর্গানাম জপ করে নিই।

সাইজ-করা কাগজ কাটা থাকত, তা হতে একখানা কাগজ এনে বোর্ডের উপরে দিই। তিনি বোর্ডখানা কোলের উপরে তুলে ছবি আঁকেন, আঁকা শেষ হলে বলেন, নাও দুর্গানাম জপ হল। এবারে আনো তোমার ছবি, দেখি।

অনেক ছবি আঁকা হয়ে গেল এই করে। ছবি আঁকা তো নয়, খেলা। হাসিতে গল্পেতে নানা মজা পেয়ে প্রাণের আনন্দে খেলা করে চলেছি। খেলতে খেলতে খেলায় ভুলিয়ে তিনি আমায় ছবির সঙ্গে আবার বেঁধে দিলেন কোন্ এক ফাঁকে।

সে-যাত্রায় বেশ কিছুকাল ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ আশ্রমে।

সেবারে কলকাতায় ফিরে যাবেন। স্টেশনে ট্রেনে উঠবেন, পাদানে পা তুলবেন; হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, এবার হতে আমার হয়ে তুমিই রোজ 'দুর্গানাম জপ' কোরো— কেমন?

নিজের পোরট্রেট যেন তাঁর মুখস্থ ছিল। তাঁর ছবি এঁকেছি, ছোটো বড়ো মিলিয়ে বেশ কয়েকখানাই এঁকেছি; তত সঠিক যখন হত না, তিনি তাতে এখানে ওখানে রঙের টাচ দিয়ে শেড দিয়ে তাঁর হুবহু পোরট্রেট এনে দিতেন। দেখে অবাক হয়ে যেতাম। ড্রইংএ কোথাও গোলমাল থাকলে বলে দিতেন, 'এইখানটা একটু বাড়িয়ে দাও', কি 'এইখানটা কমাও, দেখো ঠিক এসে যাবে গড়ন।'

তিনি নিজেও নিজের মুখ কথায়-কথায় স্কেচ করে দিয়েছেন কত।

কাছে বসে বসে তাঁর আঁকা দেখতাম রোজ। কত মজা পেতাম নিত্য

নতুন তাঁর আঁকা ছবিতে। মজা বলি, কিন্তু অন্তরে জানি এ কত বড়ো শিক্ষা, কতখানি সৌভাগ্য।

একদিন, তিনি একখানি ছবি আঁকছেন, আঁকতে আঁকতে এক সময়ে বলে উঠলেন 'অরূপরতন'-এর রাজা বেরিয়েছেন অন্ধকারের ভিতর হতে।

তখনো কিছু বুঝতে পারছি না, কী হল ছবিতে, কে বের হয়ে এল। বোঠানও ছিলেন তখন সেখানে। বললেন, এ কোন্ জায়গাটার ছবি বুঝতে পারছি না তো ছোটোমামা?

মানে, অরূপরতন নাটকের কোন্ জায়গার ছবি এটা।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, কোন্ জায়গা আমি কি ভেবেচিন্তে এঁকেছি? তালগাছ আঁকব আঁকব কতদিন থেকেই ভাবছি; বলছি যে, তালগাছ ঠিক মনের মতো আঁকা হচ্ছে না। মরমর করে বাজবে তালের পাতা হাওয়াতে, তবে তো? সেই তালগাছ আঁকব বলেই শুরু করেছিলুম, বেরিয়ে এলেন তার ভিতর থেকে রবিকা। বললুম, 'আবির্ভাব হল তাঁর।'

দেখো-না, পিছনের গাছপালা অন্ধকারে মিলিয়ে রইল, সামনের নীলফুলের গাছটিরও ঝিলমিলে ভাব অতটা সইল না— রঙের প্রলেপ নরম করে আনতে হল তাকে। এ পাশের বাড়ির আর্কিটেকচার তুলে দিলুম একেবারে, শুধু একটু ইশারা রইল। আকাশেও রঙ চলল না, অন্ধকারের নিঝুম ভাবটি নামাতে হল। এত কাণ্ডের পরে তবে তাঁর আবির্ভাব ঠিকমত ফুটল।

বললেন, দেখলে তো প্রথম থেকে? এই যে এত কাণ্ড, মজা পেয়েছি বলেই না খাটতে পেরেছি? সে কিসের মজা? আলোছায়ার মজা।

কয়দিন ধরেই কলাভবনে রেখা ও রঙ নিয়ে আলাপ হচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথ যেন সবাইকে ধরে ধরে দেখিয়ে দিচ্ছেন রেখা আর রঙের কার কী কাজ, কোথায় কার প্রাধান্য। কোন্‌টার কতখানি প্রয়োজন ছবিতে। বলেন, লাইন লাইন করো, কত রকমের লাইন আছে। চীনে-শিল্পী বেড়াল এঁকেছে, প্রতিটি লাইন যেন ছুঁলে নরম ঠেকবে, এমনি ভাব। লাইন প্রাচীর হিসাবে ব্যবহার করাটা ভুল।

অবনীন্দ্রনাথ এই নতুন-করা ছবিখানা হাতে নিয়ে বললেন, দেখ তো এই ছবিতে একটিও লাইন আছে কিনা? একটিও নেই কোথাও। অথচ সবই আছে। আলোছায়ায় খেলছে, মিলছে।

শুধু রেখা দিয়ে ধরতে গেলে এ জিনিস আসে না। ভাবের জিনিস রেখাতে ধরা দেয় না।

রেখায় ধরা দেয় রূপ। ভাব চায় রেখা থেকে ছাড়া। ভাব জাগাতে হলে রেখার বন্ধন থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে। বসন্ত— তাকে তুমি রেখায় রঙে ধরতে পার কতটুকু আর? বসন্ত— এ ভাবটা একটি মেয়ে এঁকে দেখাতে পারো, একটি নিশেনেও তা দেখাতে পারো। সে হচ্ছে সিম্‌বল। বসন্তকে বোঝালে, সেই কি যথেষ্ট? তা তো নয়। 'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে?' শুকনো পাতা ফুলেরও গান সেখানে। নতুন ফুল ফুটছে, শুকনো ফুল ঝরে পড়ছে; হাওয়ার এই খেলা দেখাতে হবে। বসন্ত কী ভাব জাগালো মনে, সেইটিই আসল। সেই জিনিসটিই দেখাতে হবে। সে ছবি দেখে যে দোলা দেবে, মনে একই ছবিতে বসন্ত জাগবে— বর্ষার ভাব উদয় হবে।

প্রকৃতিকে বুঝতে চেষ্টা করো; প্রকৃতির ভাষা শেখো। রবিকা বুঝতেন, তিনি শুনতে পেতেন আকাশ কী বলছে, বাতাসে কী সুর আসছে; গাছের পাতায় রবির আলো কী ভাব দিচ্ছে। সব পৌছত তাঁর কানে। তবেই না তিনি পেরেছেন তাদের রহস্য ব্যক্ত করতে। সেইরকম প্রকৃতিকে জানতে চাও, তার কাছে যাও। দেখবে তখন কী আনন্দ সেখানে।

দেখ, যে একবার ওড়া-পাখি ফাঁদ পেতে ধরতে শিখেছে, সে কি আর ভোলে শোলার পাখিতে? আলোছায়াকে ধরার যে আনন্দ, সে আর পারে না রেখায় আবদ্ধ রাখতে কিছু।

নন্দলাল আমায় বলেছিল, রেখার ভিতর কি আপনি কিছুই পান না? আমি বললুম, কি বলব নন্দলাল, রেখার ভিতর আমি দেখি যেন খাঁচার ভিতর বন্ধ পাখি।

বললেন, এই তো তোমার মুখ, রেখায় তার কতটুকু ধরবে? এই মুখে দুই পাখি; এক পাখি ঘুমচ্ছে, এক পাখি জেগে আছে। একদিকে রাত হচ্ছে, আর একদিকে দিন। কত আলো, কত ছায়া। এদিক ওদিক— দু দিক নিয়ে ঘুমের পাখি জাগার পাখি— দুইয়ে মিলে তবে পূর্ণ একটি মুখ। রেখায় সেখানে কী ভাব জাগাবে? কিছুই পারবে না।

আর্টের দুটো দিক; এক হচ্ছে রূপের দিক, মানে চোখের দিক। রেখা

দিয়ে সেখানে সেই চোখের রূপকে ধরতে পার। আর হচ্ছে ভাবের দিক, মানে মনের দিক। মনের সুরটি ছবিতে লাগাতে হলে রূপের বাঁধনে তাকে আর রাখা চলে না। সে তখন হাওয়াতে আলোতে জলেতে খেলে বেড়াতে চায়। যে হাওয়া জল আলোয় আমরা বেঁচে আছি, তারই মাঝে তাকে ছেড়ে দিতে হয়।

চোখের ছবি রেখায় রঙে রেখে দেওয়া চলে। কিন্তু ছবিতে মন কী চায়? সমুদ্রের গভীর জলে মন ডুব দিতে চায়। ডুব দিতে হলে সেই গভীর ভাবটা আনতে হবে।

খানিক আগে অভিজিৎ এসে আমায় জিজ্ঞেস করলে, অবুদাদু, সমুদ্র আর আকাশ আঁকতে গেলে আলাদা করব কী করে?

বললুম, কেন রে?

সে বললে, দুটোই তো নীল রঙের।

বললুম, কাঁচের গেলাসে নীল রঙ গুলে আকাশের গায়ে ধরে দেখগে যা। বুঝতে পারবি দুই নীলে তফাত কোথায়।

এই, এই-সব প্রশ্ন জাগে ছোটো ছেলের মনে। আমি খুশি হই এদের উত্তর দিতে। প্রশ্ন জেগেছে, দুই নীল আলাদা করা যায় কী করে।

সমুদ্রের রঙ ঘন, কেন? না, সেখানে 'তেপথ' আছে; মন সেই অতলে তলিয়ে যেতে চায়। ছবিতেও মন সেইরকম তলিয়ে যাবে, চলে যাবে ভিতর দিয়ে। মন চলতে না পেলে কি খুশি হয় কখনো? শাস্ত্রে আছে—মন জলে ডুব দেবে। জল মানে কী, রস। রসের সমুদ্রে মন ডুবে যাবে। সেই রস কি সহজেই পাওয়া যায়? তার জন্য খুঁজতে হয়।

সে খোঁজার আনন্দ আমি পেয়েছি। আজ যে এই ছবি আঁকছি, ধুয়ে মুছে ভাব জাগাচ্ছি, দেখতে সহজ; কিন্তু একি আর একদিনে হয়েছে? কতকাল আমায় এ পথে চলে চলে খুঁজতে হয়েছে, তবে না পেয়েছি।

এই খোঁজার আনন্দ তোমরা পেলে না, বড়ো দুঃখ হয়। ধরাবাঁধা রাস্তায় চলবে কেন? নিজে খুঁজে নিতে চেষ্টা করো, দেখবে তাতে কত আনন্দ। আমি তো কাউকে ধরাবাঁধা রাস্তায় ছবি আঁকা শেখাই নি। যে যে-রাস্তায় যে ভাবে চলতে চেয়েছে তাকে তাই ছেড়ে দিয়েছি। আমি শুধু তারিফ করে গেছি মাত্র।

নন্দলালকে তো আমি শেখাই নি। দেখলুম, ও এক রাস্তা ধরে চলেছে। সে ভাবেই ওকে চলতে দিয়েছি। আমার শেখাবার পদ্ধতি ছিল ওই। কিন্তু আজ বলছি আমি যে, নেচার'কে দেখো। নেচারকে না পেলে তো কিছুই পেলে না। এই নেচারকে পাওয়া সহজ কথা নয়। ইউরোপও পারে নি। তারা তো নেচারের কাছে পূজারীরূপে যায় নি, নেচারকে নিয়েছে তারা দাসীরূপে। তাই তাকে তারা পায় নি। আমরাও সবটা পাই নি। তার সঙ্গে ভাব করতে হয়। মোগলরা এঁকেছে রাগরাগিণী, নেচারকে ধরতে চেষ্টা করেছে তাতে; কিন্তু পুতুল সাজিয়েছে। তার মানে তারা নেচারকে ততটা ভালোবাসতে পারে নি।

বললেন, ওয়াশের ছবি যখন ফাঁকিতে এসে ঠেকল, সবাই ধোঁয়া দিয়ে ছবি ঢাকল; তখন নন্দলাল স্পষ্ট স্পষ্ট রঙ দিয়ে ছাত্রদের ছবি আঁকালো। ছোট্ট নীল রঙের ঘাসফুল এঁকেছিল, দেখে তোমাকে প্রাইজ দিয়েছিলুম কেন তখন? চোখে দেখে ভালো লেগেছিল, বলেছিলুম, 'বাঃ বেড়ে'।

সে-এক ঘটনা আমার জীবনে। তখন আমি কলাভবনের ছাত্রী। বড়ো বড়ো ছবি আঁকি। আমার বড়দাই শুরু করিয়েছিলেন বড়ো করে ছবি আঁকতে। একদিন নন্দদা বললেন, এবারে কয়েকখানা ঘাসফুলের ছবি আঁকো।

শান্তিনিকেতনের লালমাটিতে একটু জলের ছোঁয়া পেলেই হরেক রঙের হরেক রকমের খুদে-খুদে ঘাসফুল ফোটে। তারা মাটির সঙ্গে মিশে থাকে, মাথা তোলে না। যেন লালমাটিতে পাতা-ফুলের লাল কাঁকর-বোনা-বুটি। মনে পড়ে, সে সময়ে পথ চলতে কেবল পায়ের পাতায় দৃষ্টি ফেলে চলি, যে ঘাসফুলটি চোখে নতুন লাগে, সুন্দর লাগে, সেটিকে তুলে আনি, দেখি; পরে তারই একখানি ছবি আঁকি। একদিনের একটি মধুর ঘটনা না বলে থাকতে পারছি না। সে সময়ে শুধুই ঘাসফুলের দিকে নজর আমার, ঘাড় গুঁজে আমাকে পথ চলতে দেখে তেজেশদা ওঁরা, যাঁরা আমাকে স্নেহ করতেন, অনেকেই হাসতেন, ঠাট্টা করতেন; আমিও হাসতাম।

তখনকার দিনে মাটিতে বসে ছবি আঁকতাম আমরা। পাশে থাকত জলের গামলা। আমি ভোরের সংগ্রহ করা ঘাসফুল এনে সেই গামলার জলে রেখে দিই। একদিন সকালে কলাভবনে এসে দেখি, আমার আগেই কে যেন ফুল এনে রেখে দিয়েছে জলে। দেখি বাঃ, এ ফুল তো নজরে পড়ে

নি আমার। অতি ক্ষুদ্র ঝিরঝিরে পাতা, তার গায়ে গায়ে ক্ষুদ্রতর লাল ফুলের সারি। কী জেল্লা সেই লাল রঙের! গামলায় যেন একমুঠো হাসি ছড়ানো। আমি উপুড় হয়ে পড়লাম গামলায়, আরো নিচু হলাম, আরো অবাক হলাম, আরো মুগ্ধ হলাম সেই রঙের জলুসে। হাতে তুলে নিলাম ফুল। জানালার ও পাশ হতে নন্দদা হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন। এতক্ষণ দেখছিলেন আড়াল হতে। তিনিই রেখেছিলেন ফুল— লাল রাংতা দিয়ে পাতার গায়ে নকল ঘাসফুল গড়ে।

তার পর কী হাসি আমাদের তা নিয়ে।

সেবারে একসেট ঘাসফুলের ছবি এঁকেছিলাম। বছরের শেষে কলকাতায় যে একজিবিশন হত তাতে নন্দদা পাঠাতেন তাঁদের এবং ছাত্রদের সারা-বছরের কাজের বাছাই বাছাই ছবি একগাদা। সেই ছবি বাছাইয়ের সময়ে দেখতাম নন্দদা কতখানি সতর্ক থাকতেন। ছবি পাঠিয়ে দিয়েও নিশ্চিন্ত হতেন না, যতক্ষণ-না অবনীন্দ্রনাথের কাছ হতে খুশির খবর না পেতেন। এই ছবি পাঠিয়ে নন্দদা যেন অঞ্জলি দিতেন গুরুকে প্রতি বছরে। আর গুরুও বুঝতেন শিষ্য ঠিক পথেই চলছে কি না।

সেই বছরে নন্দদা আমার নীল ঘাসফুলের ছবিখানি পাঠিয়েছিলেন একজিবিশনে। দেখে অবনীন্দ্রনাথ খুশি হয়েছিলেন, আমাকে সোনার মেডেল পুরস্কার পাঠিয়েছিলেন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের তরফ থেকে।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, ডেকোরেটিভ আর্ট খানিকটা অবধি চলে, চোখ ভোলে। তবুও মোগল আমলে 'মোজেক পেন্টিং' করেছে, পাথরের ফুল বসাবে, যতটা পারে ফুলের কাছাকাছি নেচার-ঘেঁষা রঙিন পাথর বেছে নিয়েছে। মন খানিকটা ভুলল।

তোমার অভিজিৎ ছবি এঁকে আনে, 'বাহবা বাহবা' করি; কিন্তু যত বড়ো হবে ওর কাছ থেকে অন্য জিনিস চাইব। মন আর তখন এ ছবিতে ভুলবে না। আমাদের ছবিরও গোড়ার দিকে এমনি চলছিল; আমি কিন্তু ভবিষ্যতের কথা জানতুম, রবিকার কাছে তাই তো কথা তুলেছিলাম যে, এখন লোকে 'বাহবা' বলছে, কিন্তু পরে আর এতে তাদের মন ভুলবে না। তখন? রবিকা বললেন, সেইদিন এলেই তোমাদের পক্ষে মঙ্গল।

ছবির যুগ-পরিবর্তন হবে বৈকি? আমি তো চাই নে যে, ছবি একই জায়গায় আটকে থাকুক। আমি একভাবে ছবি এঁকেছি, নন্দলাল আর-এক ভাবে শুরু করল। এর পরে হয়তো আরো কারা আসবে, কৌতূহল জাগাবে, বিস্ময় জাগাবে। কিন্তু মন ভোলাতে ঘুরে ফিরে আবার সেই একই জায়গায় ফিরে আসতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছবিও ম্যাচিয়র করে। ব্লান্ট বলত, তোমার ছবি এখন ম্যাচিয়র করছে। তা সত্যিই। ম্যাচিয়র করে বৈকি। সেইজন্যই তো, খাঁটি কথা জেনেছি বলেই তো আজ এই-সব কথা এত জোরের সঙ্গে বলতে পারছি।

কেন বললে যে, 'আপনার এই ছবিখানা দেখে মন যেন কেমন করে।' এ যেন ওই কথাই 'যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম'। এ জানবার উপায় নেই। মনে তোলপাড় জাগে।

রস সঞ্চয় করে যাও। 'যো ঘটমে বিরহ ন সঞ্চারী— সো ঘট পাত্থর সমান।' যত পারো ঘট রসে পূর্ণ করে ফেলো। পরে আস্তে আস্তে পাত্র খালি করবে। আজকাল তাইতো আমি দেখি, শুধুই দেখি। কত ভুলেও যাই। তবু, যা মনে থাকে এক-এক সময়ে বের হয়ে কাজে লাগে। কত দিনের কত এফেক্ট জমা থাকে মনে। এই তো ওদিকের জানালা দিয়ে সন্ধের আলো দেখা যাচ্ছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে। এইটুকু আলোর এফেক্টই ধরতে যাও, দেখবে কত কষ্ট।

সকালের আলো দেয়ালে পড়ে, গাছের ডাল ঝিলমিল করে ওঠে; সে কী চমৎকার এফেক্ট। আহা-হা, এ-সব জিনিস ধরতে শিখলে না কেউ, কী হবে তোমাদের।

ছবি সম্বন্ধে দুটি মাত্র কথা আছে। প্রথম কথা হচ্ছে ফর্ম্, মানে গড়ন। গাছের গড়ন, মানুষের গড়ন, বেড়াল-কুকুরের গড়ন, কুঁড়েঘরের গড়ন; এই কুঁড়েঘরেরই আবার কত রকম গড়ন আছে— এক-এক দেশের এক-এক রকম। আমি করিয়েছিলুম একবার নন্দলালকে দিয়ে, বলেছিলুম, এই কুঁড়েঘরই কত রকম হতে পারে করো এক সেট্। হ্যাভেলকে দিয়েছিলুম তা, ওঁর বইয়ে ব্যবহার করেছেন বোধ হয়। তা, এইরকম সব-কিছুরই গড়ন

দেখবে দেখাবে, অর্থাৎ বোঝাতে হবে, এইটে এই জিনিস। সেখানে ঠিকঠাক যেমনটি, তেমনি গড়ন থাকবে।

তার পর হচ্ছে রূপভেদ। কোন্‌খানে কোন্‌ জিনিসটি বদলে যায়, যেমন ধরো-না, এই যে ধানের মরাই, এইখান থেকে দেখছি একভাবে, এই মরাই-ই আবার খোলা মাঠে দেখো— দেখবে এর আর-এক রূপ। চাষীর ঘরের পাশে দেখবে সে অন্য এক রূপ নিয়েছে। গেরস্ত বাড়িতে তার রূপ আলাদা।

জায়গা আলোছায়া বিশেষে একই জিনিসের রূপ বদলায়। একেই বলে রূপভেদ। এই রূপভেদটি ভালো করে দেখতে শিখতে হবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, রঙ। রঙে তুমি ভাব ফুটিয়ে তুলবে, যেটি তোমার মনে জেগেছে। এখানে ফর্ম্‌ মুক্তি পাবে। এ বড়ো শক্ত জিনিস। কিন্তু এইটিই হচ্ছে আসল কথা।

এই তো 'শ্রেষ্ঠদান' ছবি আঁকলে, শুধু ফর্মে তো ফোটাতে পারলে না। কত রঙের খেলা খেলতে হল এতে। জল দেখাতে হল, আকাশে চাঁদ উঠেছে দেখাতে হল; কত কিছুর পর তবে ফুটল ভাবটি। তবু বলব শ্রেষ্ঠদান-এর কিছুই হল না। সব জিনিস ছবিতে ফোটানো যায় না। কবির কলম যা লেখে অনেক সময়ে শিল্পীর তুলি তা বলতে অক্ষম হয়। অবশ্য বলা যে যায় না একেবারে তা নয়। বলা যায়, তবে অন্য ভাবে। অন্য জিনিসের ভিতর দিয়ে সেই ভাব ব্যক্ত করা যায়।

রবিকার ছবি আঁকলুম সেদিন, রঙ একেবারে বদলে দিলুম। সেকালের দিদি পিসিরা থাকলে তাঁরা বলতেন, ওকি হল, রবির রঙ কি অমনি? রবির রঙ আলো-করা রঙ। তাঁরা বলতেন নিশ্চয়ই এ কথা। কারণ তাঁরা রঙকে ওভাবে দেখতে শেখেন নি। কিন্তু আমি ওই ছবিতে রবিকার যে ভাব ফোটাতে চেয়েছি, যে কথা বলতে চেয়েছি, যে কথা বলাতে চেয়েছি— আমাকে এই রঙের ভিতর দিয়েই তা করতে হল। নইলে সম্ভব ছিল না।

রঙ হচ্ছে রাজা। কত রঙ, রঙের ছড়াছড়ি। অফুরন্ত কথা এর, অফুরন্ত ভাষা। এই ভাষা শেখো রানী। এ ছাড়া পারবে না কিছু প্রকাশ করতে। এই-ই হচ্ছে মনের কথা বলবার একমাত্র পথ।

আর্টের এই দুটি কথা; খাঁটি কথা। খাঁটি কথাই-বা বলি কেন? এই দুটি কথা ছাড়া আর অন্য কথাই নেই। এখন এই দুটি কথা শিখতে হবে,

জানতে হবে। বড়ো শক্ত। একদিনে দুদিনে হবার জো নেই। আমি এই দুটিমাত্র কথাই শিখছি তিয়াত্তর বছর ধরে। আরো যে কত বছর লাগবে কে জানে?

ক'দিন হতে কলাভবনে শিক্ষকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠেছে রেখা নিয়ে। রেখা দিয়ে কেন ধরা যাবে না ভাবকে? এই নিয়ে মৃদু তর্কের সুরও উঠেছে কিছু। আজ সকালে গিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ কলাভবনে। আলোচনা হয়েছে সেখানে। সেই সুরই চলছে আজ বাড়ি ফিরেও।

বললেন, না, রঙ ছাড়া ভাব দিতে পার না তুমি ছবিতে। আনো তো রঙ তুলি, বুঝিয়ে দিই রঙ-রেখার মর্যাদা।

অবনীন্দ্রনাথ মোটা তুলিতে নীল রঙ নিয়ে কাগজে সোজা একটি টান দিলেন, ব্রাউন-লাল রঙ মিশিয়ে আর-একটি টান দিলেন পাশে। বললেন, দেখো, সমুদ্র আঁকলে— দুটি লাইন, সমুদ্র আর সামনে বালির তট। সমুদ্রের ওপাশে দিলেন একটু ঘন রঙ, সামনে দিলেন তারই একটু হালকা শেড।

বললেন, হয়ে গেল সমুদ্র। আর এই একটু হালকা ইণ্ডিয়ান রেড-এর শেড, হয়ে গেল সমুদ্র আর তটভূমির ছবি। তার পর?

তার পরে এই ছবির উপরে ভাব জাগাবে কি করে? তখনই দরকার খেলার। রঙ নিয়ে তখন মন খেলবে। তবেই ভাব ফোটাতে পারবে ছবিতে। মন ডুব দেবে সমুদ্রের তলায়, নেচে বেড়াবে আকাশে বাতাসে বালির উপরে।

মনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যখন গাছ আঁকি, মন চলে যায় তার ভিতরে, খেলতে থাকে রঙ নিয়ে।

কাল দেখছিলুম বসে বসে, সন্ধে হয়ে এল, কোণের ওই রান্নাঘরের উপরে উঁচু হয়ে ওঠা পায়রার ঘরগুলি, পিছনে ঘন মেঘ, তার উপরে পড়েছে সূর্যাস্তের আলো। ঠিক মনে হচ্ছিল যেন পাহাড়ের চূড়ার উপরে মন্দির একটি রেখায় রঙে ফুটে উঠেছে নীল আকাশের গায়ে। মনে পড়িয়ে দিল মোরাবাদী পাহাড়ের মন্দিরের কথা।

আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে এল, রঙ-রেখা ঢাকা পড়ল, নীল আকাশ হালকা হয়ে গেল, তার গায়ে রঙ-রেখার মন্দিরটি বদলে গিয়ে সলিড একটা কালো পাথরের মন্দির ফুটে উঠল।

এই যে রূপের ভেদ, এ রঙ ছাড়া আর কিছু দিয়েই ফোটাতে পার না। রেখায় হয়, খানিকটা তুমি দেখাতে পারো, এই মন্দিরই তুমি দেখাতে পারো— হ্যাঁ, উঁচু পাহাড়ের উপরে এইরকম আরকিটেকচারের একটি মন্দির এটি। কিন্তু ঋতুর তো একটা প্রভাব আছে? তাকে ফোটাবে কী করে? ভাব জাগাবে কী দিয়ে? তখন রঙের খেলাতেই তোমাকে বোঝাতে হবে; এটা কী ভাব জাগায়।

বর্ণ মানেই বর্ণনা। মানুষ দেখে দুটো জিনিস দিয়ে। এক ইনটেলেক্ট্ দিয়ে, আর ফিলিং দিয়ে। এই দুটো মিলিয়ে তবে মানুষ দেখে। আকাশের গায়ে তারা ফুটেছে, মানুষ তা নিলে, শাড়ি বানালে নীল রঙে রূপালী তারা বসিয়ে। চোখের সামনে সেটা ঝুলিয়ে রাখলেই তো যথেষ্ট হত; কিন্তু মানুষ চায় সেই শাড়িটি পরে একটি মেয়ে আসবে, তবে শাড়ির সার্থকতা। এইখানেই ফিলিং। একে বাদ দিয়ে চলতে পারে না।

তোমরা শিখেছ রেখার ভিতর রঙকে ধরতে। শাড়ির পাড় করলে, দুপাশে সাদা রঙ দিয়ে মাঝখানে নীলকে ধরলে, লালকে ধরলে। সেই শাড়ি পরে বসো যখন, এ দিকে আলো ও দিকে ছায়া, মিলেমিশে গেল রঙ আর রেখা।

জানো তো রঙ বাস করে কড়া আলোতে আর ঘন ছায়াতে। ছায়ার ভিতরে যেমন রঙ দেখা যায় না, কড়া আলোতেও তেমনি। ওই যে তোমার বাল্মীকিপ্রতিভার ছবির ডাকাতের হাতের পাশে খানিকটা জায়গা সাদা ছেড়ে দিলুম, বললুম, রঙ নেই এখানে; তা ওইজন্যই।

রেখার ভিতরে রঙ দেওয়া চলে খানিকটা অবধি। মানে, রঙকে বাঁধা নয়, রঙ উপচে পড়া চাই।

বর কনে, হাতে তাদের লাল সুতো বাঁধা। মনে রঙ খেলছে সেখানে।

এক যে ছিল শেয়াল—
তার বাপ দিয়েছে দেয়াল,
বাপের নাম রতা
ফুরোলো আমার কথা।

এই বললেই তো হয়ে যেত। কিন্তু সাদা কথা মানুষ চায় না, চায় বর্ণনা। উত্তান বলেই ক্ষান্ত হওয়া যায় না। উত্তানে এইখানে পলাশ গাছ,

ওইখানে চামেলি গাছ, জুঁইয়ের সারি, অমুক-অমুক বলে তবে ব্যাখ্যা দিতে হয়। শোলাঙ্কীর রাজকুমারী দোলনায় দুলছেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে আমায় অত কথা বলতে হল, তবে খুশি মন আমারও, তোমারও।

রবিকার ছবিটি যে আঁকলুম আজ, 'বারান্দায় বসে আছেন', শুধু রেখায়ই তো ও কথা বলা হয়ে যেত। কিন্তু ওই যে একটু রঙের ছোঁয়াচ দিলুম এখানে ওখানে, লাল মেঘ, কত কথা বলা হয়ে গেল। কেমন একটা ভাবের সৃষ্টি হল।

জল আঁকলে রেখা দিয়ে; জলের গভীরতা দেখাবে কী করে রঙ ছাড়া? যেমন স্বচ্ছ হ্রদের জলের নীচ পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যায়, এও তেমনি। মন তলা পর্যন্ত ডুব দেবে। রঙের বাহাদুরি ওইখানেই।

তাই বলি, রঙের মর্যাদা দিতে শেখো। খেলতে না পারলে কি তার সঙ্গে ভাব জমানো যায়?

পিদিম ধরে কনের রূপ দেখায়। কিন্তু যখন দুজনে মিলে সংসার করে, নানা সুখদুঃখের ছাপ লাগে তাতে; তখন হল সেখানে ভাবের প্রকাশ।

মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে বিকেল থেকে। বোঠানরা কেউ নেই আশ্রমে। একলা আছেন অবনীন্দ্রনাথ উদয়নে; তাঁর কাছেই ছিলাম এতক্ষণ। আকাশে ঘন মেঘ করে আসছে দেখে কোণার্কে এলাম, দরজা জানালাগুলি বন্ধ করে দিতে। কিন্তু কোণার্কে এসেই আটকা পড়ে গেলাম। এলাম আর সঙ্গে সঙ্গেই ঝম্‌ঝম্‌ করে চেপে বৃষ্টি নামল।

সন্ধের দিকে বৃষ্টির জোর একটু কমতেই গেলাম উদয়নে।

অন্ধকার, তখনো আশ্রমের ইলেকট্রিক ডায়নামোটা চালায় নি; বাতি জ্বলে নি। অবনীন্দ্রনাথ সিঁড়ির মুখে তাঁর প্রিয় জায়গাটিতে বসে ছিলেন। জলের ছাট থেকে সরে যেতে যেতে কৌচটা ঠেলে নিয়ে গেছেন সেই কোণে, সিঁড়ি ঘেঁষে। হাতের চুরুটটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাইরে ঝাপসা বৃষ্টি, সিঁড়ির অন্ধকার কোণা, চুরুটের ধোঁয়া, সব মিলিয়ে যেন একটা রহস্যের অন্তরালে নিজেকে ঢেকে রেখে উপভোগ করছেন— দেখা-অদেখার জগৎকে।

গিয়ে কাছে বসলাম। খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বললেন, আলপনা, কত আলপনা আঁকা ছিল একটু আগে। ধারা বইয়ে দিলেন ভগবান,

জলেতে আলপনাতে মিশে এক হয়ে গেল। তারি মাঝে যখন থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকায়, হরিণের চোখ দেখি তাতে।

সাঁঝো পড়ে দিন বিতরে
চকোরী দিন্‌হ রোয়,
চলো চকোরা ওয়া দেশকো
যাঁহা রয়না না হোয়।

দুপারে চখাচখি কেঁদে আকুল। বলে, এমন একদেশে চলো যাই, যেখানে রাত্তির নেই।

এ শুধু ছবি নয়, কবিত্বে ভরা। কবীরের কবিতা তাই বড়ো ভালো লাগে। আমার লেকচারগুলিতে ওঁর কবিতা দিয়ে অনেক সময়ে আমার কথা ব্যাখ্যা করেছি। রবিকা বলতেন, ও তো হল আমাদের কবিদের কথা। তোমার কথা কিছু বলো শুনি।

বলতুম, আমার কথা, আর্টিস্টদের কথা শুনে আর কি হবে? ওই 'রূপভেদাঃ প্রমাণানি' মাথার কত মাপ, শরীরের কত মাপ, ও তো বলে ছেড়ে দিয়েছি। আর কিছু নেই বলবার। ছিল, প্রিমিটিভ আর্টের কথা কিছু বলতে বাকি। স্টাডি করছি, কী করে তারা আর্টকে দেখত, কোন্ অ্যাঙ্গল থেকে দেখত। তা টার্ম শেষ হয়ে গেল, আর বলা হল না।

দেখার কি শেষ আছে? শেষ নেই। বসেছিলুম বিকেলে, দেখছিলুম উদীচীর ও দিকে ঘন মেঘ করে আসছে। মনে গাঁথা হয়ে রইল, জমা থাকল ছবি; হয়তো একদিন কাজে লেগে যাবে। যত ছবি এঁকেছি তার শতগুণ দেখেছি। জমিয়ে রেখে দিই; সব কি দিতে পেরেছি? পারি নি। বেশির ভাগ মনেই রয়ে গেল।

দুপুরে বসে থাকি ঘরে, জানালার শার্সিতে এসে ছায়া পড়ে তালগাছটার। মনে হয় যেন জ্যোৎস্নারাতে দাঁড়িয়ে আছে কে! আলোছায়া জলজল করতে থাকে। দেখি, আর মনের সিন্দুকে তুলে রাখি। এমনিতরো কত জমা হচ্ছে দিন দিন।

আমার প্রায়-শেষ-হয়ে-আসা ছবিতে যখন এটা-ওটা বদলাতে যাই, পাশে বসে বসে দেখো আর 'হা-হা' করে ওঠো, বলো, 'থাক থাক'। মানি নে। ধুয়ে মুছে পালটে দিই। মনে যা জমা থাকে তা ফুটে বের হতে চায় কোনো-কোনো ছবিতে।

মনের ছাপ পড়ে বৈকি! না পড়ে পারে না। রঙই আসল। রঙেই ভাব ধরা দেয়। তুমি একই ছবিতে নানা রঙের শাড়ি পরাও, দেখবে ভাব বদলে যাবে।

শরতের নীল আকাশে রোদ্দুর দেখালে, তাতে একটু রঙের ওয়াশ দিয়ে দাও, হয়ে যাবে বাদলা দিন। আবার একটু কালোর ওয়াশ দাও রাত্রির আকাশ ফুটে উঠবে। এইখানেই রূপভেদ। এ কিসে হয়? শুধু রঙের খেলাতেই তো?

এই তো দেখছিলুম সামনের লাল কাঁকরের রাস্তাটি বৃষ্টির জলে ভরে গেল। তাতে আলো হাওয়া লেগে মনে হচ্ছে যেন নদীটি বয়ে যাচ্ছে সামনে দিয়ে। পথের ও পাশে গোলাপ-বাগান, তা যেন কত দূরে চলে গেল।

রঙ ধরা কি সহজ? এই তো দেখছ চোখের সামনে একটু লাল কাঁকরের রাস্তা, পাশে সবুজ মেহেদির বেড়া; এই রঙটুকুকে ফোটাবার জন্য পিছনে দেখো কী বিরাট আকাশের গায়ে নানা মেঘের আয়োজন!

সব অঙ্গে মিলে তবে ছবি। এই-ই রূপভেদের আসল কথা।

আমরা হচ্ছি কাঁচপোকা। যেখানকার যে রঙ সেই রঙে নিজেরাও বদলাতে থাকব। সেই রঙে ডুবে যাব।

সকালবেলা একটি কাঁচপোকা দেখলুম উড়ে বেড়াচ্ছে পাতায় পাতায়। রঙ কী, যেন বনের সমস্ত আনন্দ চুষে নিচ্ছে নিজের গায়ে।

রোদ্দুর উঠল, হাঁটতে হাঁটতে চলেছি ছাতিমতলা দিয়ে। দেখি, একটি ভ্রমর পড়ে আছে রাস্তার পাশে। লাঠিটা তার কাছে নিতেই পা দিয়ে আঁকড়ে ধরল। তুলে ধরলুম লাঠিটা উপর দিকে। আহা! কী পালক দুটি, ময়ূরের পালক কোথায় লাগে! কত ফুলের রঙ রস যেন নিংড়ে নিয়ে পাখা দুটি তার।

আস্তে আস্তে পাশের মেহেদিগাছে তাকে রাখতে গেলুম, থাকল না, পড়ে গেল। তার তখন শেষ অবস্থা।

অবনীন্দ্রনাথ ফিরে ফিরে ছবির কথা বলতেন, বোঝাতেন। কত অভয় দিতেন আমাদের।

বললেন, ডাক্তারি যে করবে, রোগ ধরতে হবে তো আগে? পূর্ণিমাকে

ডেকে এনে কাছে বসাই, আকাশের রঙ দেখাই। ছাত্রকে তৈরি করা, সে তো সহজ কথা নয়? সুতো ধরে বসে আছি, মাছ খাচ্ছে কি না খাচ্ছে। ছাত্র টেরও পায় নি। শেখবার যে কষ্ট তা না পেয়েই শিখেছে আমার ছাত্ররা। কিন্তু শেখার কি শেষ আছে? পৃথিবী এত বড়ো আর্টিস্ট, সারা জীবন তার সঙ্গে কাটাচ্ছি, এখনো শেখাই চলছে।

তবে জোর করে কিছু হয় না। জোর করে আমাকে স্কুলে নিয়ে যেত; পারলে কিছু শেখাতে? শিখিয়েছেন তিনি— রবিকা; চাবি খুলে দিয়েছিলেন। শিখলুম তখন। নিজে শিখি নি, নিজে চলেছি।

যেদিন মাস্টারমশাই বললেন, আমার যা বিদ্যে তা শিখিয়েছি, এবারে তোমার পথ তুমি দেখো, সেদিন চোখে অন্ধকার দেখেছিলুম। অন্ধ-বাউলের মতো পথে বের হলুম।

বললেন, আঁকতে শেখা এমন শক্তটা কি? যা-কিছু কাছে পাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখবে। গোরু দাঁড়িয়ে আছে, শুয়ে আছে চারটে পা মুড়ে, দেখবে আঁকবে। গোরু ছুটছে তার ভঙ্গি, কে আসছে দেখতে মুখ ফিরিয়েছে তার ভঙ্গি; পাখি ঝিমিয়ে আছে ফল খাচ্ছে উড়ে যাচ্ছে— সব আঁকবে। রূপের ভেদ ওইখানে। যে পাখি ঘুমচ্ছে, যে উড়ছে তার থেকে আলাদা। ফর্ম্ সবটুকু রেখে দিলে।

তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে সোজা, লাগুক হাওয়া, পাতাগুলি সব বেঁকে যাবে হাওয়ার গতিতে। তুমি শাড়ি পরো, সাবি মেমেনও শাড়ি পরে; নানা রূপের নানা ভেদ দখল করো তার পর আছে রঙ, রঙের ভেদ। সেও এই একই ব্যাপার। আমি এই করেই শিখেছি। হরিণ দাঁড়িয়ে আছে, নৌকো চলেছে; একপাশ দিয়ে দেখেছি, তার পর নৌকো এগিয়ে এল, ও পাশে ঘুরে গেল, সব অবজার্ভ করেছি। বেড়াল আঁকো-না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে আঁকো। বেড়ালের চোখেই একস্‌প্রেশন, সেই দিকে লক্ষ রেখে স্টাডি করো।

পূর্ণিমার ইচ্ছে মানুষ আঁকা শিখবে। দুটো কাঠি আর দুটো নুড়ি দিয়ে পূর্ণিমাকে মানুষের মাপ বোঝালুম। সে বলে মানুষ আঁকতে পারি নে কেন? বলি, মানুষ কি স্বর্গের পাখি? আশেপাশে মানুষ নানা ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাজ করছে; আঁকলেই হল। পার না কেন? তার মানে মানুষ তোমরা দেখো না। আর হতে পারে অতি কাছের জনকে আমরা দেখি না। আমি,

মা থাকতে মার ছবি আঁকি নি কখনো। আঁকবার কথা মনেও আসে নি। কোন্‌খানটায় এর বাধা? মানুষের সঙ্গে ঘর করি চিরকাল, এতখানি পরিচিত হয়ে গেছি, মানুষ দেখছি তো দেখছিই। কিন্তু—

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার মনের মানুষ যারে।

মনের মানুষ কাছেই থাকে, দেখি নে। পরে হায় হায় করে মরি। এত বিচিত্র ভেল দিয়ে মায়ার কুয়াশা দিয়ে আচ্ছন্ন থাকে, দেখা হয় না, জানা যায় না।

আমার মনে এই হয়েছিল, 'মানুষের ছবি আঁকব।'

কত জনের কত একস্‌প্রেশন মনে গাঁথা হয়, তাই-না আঁকতে পারি!

আমার গোয়ালার মেয়ে ছোটো ভাইকে কোলে নিয়ে যায়; দেখে দেখে মনে হয় আঁকি। ঠিক ঠিক হলেই বা দোষ কি? রবিকার কবিতায় হুবহু নেচারকে ফুটিয়েছেন। মানুষকেও তিনি কেমন দেখিয়েছেন— দেখছ জানছ তো প্রতিদিনই। এত করেও তাঁর মন ভরে নি। বারবার তাই বলেছেন, 'আমার হল না চাওয়া, হল না পাওয়া'।

স্বামীর সঙ্গে ঘর করছে, স্বামীকে চিনল না, তা কি হয়? যার সঙ্গে ঘর করলুম তাকেই জানলুম না?

প্রথমে উভয়ের পরিচয়, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ইত্যাদি; তার পর যখন তা ফুটিয়ে তুলবে, তখন তোমার প্রতিভার দরকার হবে। বড়ো শক্ত; কিন্তু তবু এই পথেই চলতে হবে। চেষ্টা করতে হবে।

আমি একদিনও না দেখলেম তারে!
আমার বাড়ির কাছে আরশিনগর
পড়শী বসত করে।

বাড়ির কাছে আরশিনগর, এক পড়শী বসত করে। মনের দর্পণে সেই পড়শীর ছায়া পড়েছে চোখে দেখতে পাই যে।

মুসৌরি পাহাড়ে এক ডাণ্ডীওয়ালা বড়ো সুন্দর বলেছিল। তাকে একদিন জিজ্ঞেস করলুম; ভাবলুম দেখি ওরা ছবিকে কী ভাবে দেখে। সে আমার ছবি দেখে বললে, 'যেন শার্শিকা ভিতর মানুষ, ছোনে নেহী পাতা'। আয়না হাতে ঠেকে। বড়ো সুন্দর বলেছিল, 'ছোনে নেহী পাতা'। সেই ছুঁতে হবে। এই দশ আঙুলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তবে কুটুম-কাটাম বের হয়।

কখন এক সময়ে নন্দদা এসে বসেছেন পাশে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন তাঁকে, পোরট্রেট-পেন্টিং ভয় করো, ফুল যখন আঁকো তার কি পোরট্রেট হয় না? আমি বলি খানিকটা সিমিলারিটি থাকলে ক্ষতি কি?

কাছের মানুষের এক-একটা পরিচয় মনে ধরে, তাতেই আটকা পড়ি। দূরে গেলে তবে দোষে গুণে মিলিয়ে পরিপূর্ণ মানুষটিকে দেখতে পাই। মানুষ ছড়াছড়ি যাচ্ছে, ফুল অজস্র ফুটছে, অথচ দেখা যায় কেউ নেই আঁকবার, এ কেমন করে হয়।

বললেন, এককালে মানুষের মূর্তি আঁকলে ভাবত মায়া করলে। খুব প্রিমিটিভ কালে ছিল সে-সব। কত রকমের জাদু ছিল। এক রকমের ছিল শুনেছি, মানুষ গড়ে গায়ে কাঁটা ফোটাত।

আমাদের এক সরকার কারো শূলবেদনা হলে একটি লেবু এনে মন্ত্র পড়ে পেরেক ফোটাত। পেটের শূলবেদনা সেরে যেত।

ব্রতকথাতেও আছে 'হাতা হাতা হাতা, খা সতীনের মাথা।'

মানুষ আঁকা নিষেধ হয়ে গেল, এর গোড়াকার কথাই এই।

আমার হয়েছিল একবার, আব্দুল খলিফ, কিউরিও ডিলার— বুড়ো হয়ে গেছে; চমৎকার ছবি আঁকলুম তার অ্যারাবিয়ান নাইটসের আলাদিনের ল্যাম্পের স্টাইলে। দোকানে বসে আছে, হুবহু তার পোরট্রেট ও সারাউণ্ডিংস্।

দেখে বুড়ো মহা খুশি। ছবিখানা চাইলে, দিয়ে দিলাম। বুড়ো ছবি নিয়ে বাড়ি গেছে, তার কিছুদিন বাদে সে গেল মরে। বুড়ো হয়েছে, মরবেই। তার ছেলে ভাবলে ছবির জন্যই তার বাপ মরেছে। ছবিখানা সে পুরাণচাঁদ নাহারকে দিয়ে দিলে।

'নজর লাগা' এখনো আছে। ছোটো ছেলেকে কালো ফোঁটা দেয়, নজরটা সেখানে গিয়ে পড়বে। এখন নজর এড়াবার জন্যই কেউ কেউ তোমরা মেয়েরা কপালে ফোঁটা দাও, কেউ দাও নজর আকর্ষণ করতে।

একটু খুঁত থাকা ভালো। শাস্ত্রও বলে, পারফেক্ট মূর্তি গড়বে না, নজর লাগবে, একটু খুঁত রেখো।

আর্টিস্ট রোঁদা ওই করত; ভালো ভালো মূর্তি গড়ে ভাঙত। ভেঙে চুরে দিয়ে যা থাকত, সেই নিভূষণ রূপই রেখে দিত।

ফর্ম্ ইটসেলফ্ কত সুন্দর। সেই ফর্ম্-এর উপরে পুঁতির মালা

জড়াও, কাপড় পরাও, সব ঢাকা পড়ে যায়। এই সামান্য বাঁশের ছোট্ট পাখিটি আজ বানালুম, তাতে একটু ভূষণ দেব, রঙ দেব, সকাল থেকে ভাবছি। সাহস হচ্ছে না। এক ফোঁটা রঙ তাও এতে সইবে কিনা কত ভাবতে হয় তার জন্য। একি সহজ? বললেন, রূপ কি কেবল আমরা চোখে দেখি? ছোট্ট ছেলে অভিজিৎ যে চাঁদের মাঝে বুড়ি দেখল, সে কি চোখে-দেখা-রূপ?

দুটো চোখ আমাদের, কিন্তু আরো একটা আছে। সেই তৃতীয় চোখ দিয়ে সে দেখেছিল।

চোখ বুজে দেখি নীল করবী ফুল, সাদা বটপাতা। সেটা ওই আর-এক চোখে দেখি; মানস চোখে, কল্পনার চোখে। চোখ বুজে কি দেখা যায় না? আমি তো দেখছি নীল করবী। সত্যিই দেখছি।

লাল করবী ফুল, করবীই-বা কেন বলব, শিশু নাম জানে না। যারা বোটানি জানে তারা জানে 'বিষাক্ত' ফুল। লাল করবী দেখেছিলেন রবিকা। নাটক লিখে তার রূপ দেখিয়েছেন। বইয়ের উপরে একটি রক্তকরবী ফুল আঁকলেই কি বোঝা যাবে? সেই যে একটি রক্তকরবী, বিষাক্ত ফুল, তা আকাশ এঁকে দেখাতে পারো, মানুষ এঁকেও দেখাতে পারো।

রঙ কোথায় যায়? মনে যায়। চোখেই কি রূপ আটকে থাকে? 'টকটক করছে লাল', বলে লোকেরা। লাল রঙ কি টকটক কথা কইছে? লালই এখানে গুণ। যে ঠিক রঙটি দিতে পারল না, সে করবী ফুলকে দিতে পারল না। এখানেই আর্টিস্টের কাজ।

তোমরা আজকাল আলংকারিক আর্ট করো, শোলার সাজানো পদ্ম যে প্রফুল্লতা জাগায়, আর আসল পদ্ম সাজানো ঘরে যে রস মনে জাগবে, সেই রকম তফাত আলংকারিক আর নৈসর্গিক চিত্রে।

শুধু লাল রঙ নয়, করবীর লাল রঙ যে শোভা দিয়েছে সেই শোভাটি ধরতে হবে আলংকারিক আইনে। গোলাপের লালে তো হবে না। তাজমহলে পপিফুল, লালমণি দিয়ে গড়ে দিয়েছে আলংকারিক চিত্রে। ফুল দেখে ভুল হয়, সত্যিই বুঝি।

'চাঁদের মালা' শুধু বললেই চলবে না। চাঁদমালার চাঁদ নয়, বাসর উৎসবের কথা মনে পড়ায়, সেই আসল চাঁদের সৌন্দর্য ধরতে হবে।

সবাই এখন তোমরা কাগজের সম্মান দিচ্ছ। কাপড়ের সম্মান দিচ্ছ কিন্তু সিল্কে যে সেলাই, খদ্দরে তা নয়। খদ্দরে শালের নকশা করো, খদ্দর শাল দুই-ই মাটি। সাদা খদ্দরেই তার মান।

আকাশের স্তেপ্‌থ্‌ দেখো, ঠেকছে না কোথাও। চলে যায় দূরে। চোখের সামনে আটকায় না।

কাগজে ছবি আঁকি, আঁকার যে আকাশ তাতে কাগজ আছে আকাশও আছে। এইখানেই সে সম্মান দেয়।

লক্ষ্মী-সরস্বতীকে মেলাবে কে? আর্টিস্ট মেলাবে। মেটিরিয়ালও থাকবে, ছবিও থাকবে। শুধু মেটিরিয়ালকে সম্মান দিয়ে হবে কি?

দেখো, আমি চাই ছবি। মিছে তর্ক করে লাভ কি?

পণ্ডিতে পণ্ডিতে যুদ্ধ সমস্যা পুরিয়া
মূর্খে নাহি বোঝে তাহা জুলজুল চাহিয়া।

ছবি করবে মনের আনন্দে, কারিগরের হাতে। লোক ভোলাতে অনেক কথাই বলতে হয়, আমিও বলেছি। ইউনিভারসিটিতে লেকচার দিলুম, বেশির ভাগ নানা কথায় ভরা।

বললেন, সব জিনিসের রস তো ছবিতে ধরা যায় না। কাঠের রস দিয়েছে তারা, যারা কাঠের বাজনায় সুর শুনিয়ে গেল। মাটিকে সম্মান দিল পোর্সিলিনের পেয়ালা, যেন ফুলের মতো ফুটে উঠল।

চায়ের রস তো ছবিতে কেউ ধরলে না, মানুষ পেয়ালাতে সেই রস ধরল।

মেটিরিয়ালকে সম্মান দিয়েছে কারা— তাজমহল যারা নির্মাণ করেছে। পাথরের পদ্মফুল করে গিয়েছে, চাঁদের কাছাকাছি তা যায়।

আজকাল অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্‌ আর্ট করে সব। দুধের অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্‌ কি মিল্‌ক্ অব ম্যাগনেশিয়া? দুধের সম্মান পায়েস ক্ষীরে।

আর্টিস্ট ধুলোমুঠোকে সোনামুঠো করে, সেইজন্যেই মেটিরিয়ালকে সম্মান দিলে। ছেঁড়া কাগজ পড়ে ছিল, তা তুলে তাতে একটু রঙ রেখা এঁকে দিল; হয়ে গেল দামি জিনিসের একটি টুকরো।

বললেন, সুররিয়ালিজ্‌ম্ জিনিসটা কি জানো? ধ্বজা। ঠেলে আকাশে তোলা। রাজা হয়েছে, বড়ো রাজা, তার প্রমাণ দিতে হবে, হাতির উপর বসেও হল না, তিনটে বাঁশ জুড়ে ধ্বজা তুলে দিলে আকাশ ফুঁড়ে। ওই

আকাশফোঁড়া আর্ট হল সুররিয়ালিজ্‌ম্‌। 'ভুঁইফোঁড়' মানুষ, 'আকাশফোঁড়' পাখি কথায় বলা চলে ; কিন্তু পাওয়া শক্ত। মূলে তফাত অনেক।

সুররিয়ালিজ্‌ম্‌ বলে চেঁচানো, ঠিক কচ্ছপের ওড়ার কল্পনা করা। ছিল কচ্ছপ জলে, উঠল ডাঙায়, তাতেও খুশি নয়, উড়বে আকাশে। মরে তবে জানল সুররিয়ালিজ্‌ম্‌ কাকে বলে।

রিয়ালিজ্‌ম্‌ ডিঙিয়ে উঠতে গিয়ে এই হয়।

এখন কল বানিয়ে মানুষ উড়ছে। এখানে বলতে পারো এ তো কখনো কেউ কল্পনা করত না। বস্তুর গুণ যা অর্থাৎ লোহার গুণ ভারী, হাওয়ার গুণ হালকা— সব জয় করে সে উড়ল। কচ্ছপের বুদ্ধিতে যা কুলোয় নি মানুষের বুদ্ধিতে তা হল।

হল, কিন্তু আর্টের কোঠায় পৌঁছল কি ? আর্টের কোঠায় পড়ল রাবণের পুষ্পক রথ, আরব্য-উপন্যাসের উড়ো-সতরঞ্চি।

আর্টের গুণ এইখানে, বস্তুর সম্মান কী, তা নয়। আংটি, একটি পিতলের পিদিম ; আংটি ঘষল দৈত্য এল, পিদিম ঘষল দৈত্য এল। বস্তুর গুণ কি একে বলে ? এ তো একেবারে উলটো কথা। আশ্চর্য ভাব আশ্চর্য রস দিল সেখানে সাহিত্য। ধাতুর গুণ চুলোয় গেল সেখানে।

আমাদের বেদে উপনিষদে বলেছে, 'অতৈলপূর প্রদীপ', যে প্রদীপে তেল দিতে হয় না। সেই জ্ঞানের প্রদীপ বহন করছে মানুষ।

শ্রীনিকেতনের এক শিল্পী-শিক্ষক একটি সেরামিক ফুলদানি করেছেন, এনে দেখালেন অবনীন্দ্রনাথকে। ফুলদানির গায়ে নকশা এঁকেছেন, ঠিক মনে হয় কাঠের ফুলদানি। শিল্পী বললেন, এই টেক্সচারটা অনেক কষ্টে তবে আনতে পেরেছি।

অবনীন্দ্রনাথ দেখলেন। মনে হল যেন ব্যথিত হলেন। কিছু বললেন না তখন। শখ করে দেখাতে এনেছেন হাতের-করা জিনিস, তাঁকে আঘাত দেন কী করে!

পরে বললেন, মাটির ক্যারেকটার মাটি। তাতে কাঠের ভাব আনলে মেটিরিয়ালের গুণ দেওয়া হয় না। পিঁড়ির ক্যারেকটার পিঁড়ি। তার নিজের রূপই যথেষ্ট ; অলংকারের অপেক্ষা রাখে না। যেন সোনামুখী মেয়ে, তার অলংকার না হলেও হয়। 'কপাল যেন কাঁঠাল-কাঠের পিঁড়ি', তাতে কি

কপালের সম্মান কমে? বিয়ের সময়ে যে পিঁড়িচিত্তির করে, তা পিঁড়ির সম্মানের জন্য নয়; যারা দাঁড়াবে তাদের জন্য। তার উপরে দাঁড়িয়ে তারা স্নান করে। সে অলংকার তুলে রাখবার জন্য নয়। বর-কনের মুখে অলকা-তিলকা দিয়ে দেয়, কিন্তু তার পরে? সে কি তা তুলে রেখে দেয়?

সাজ দিয়ে ঢাকতে হয় যার নিজের রূপ নেই। টেবিলটা ভেঙে গেছে, ভালো কাপড়ের টুকরো বিছিয়ে দিলে। পিঁড়ি আঁকা হল বর-কনে দাঁড়াবে, আলপনা তাদের পায়ের তলায় থাকবে। সেটা শুধু আলপনাই নয়, শুভ-ইচ্ছা আছে তাতে। বর-কনে দাঁড়িয়েছে, পায়ের তলায় ফুলের আলপনা; যেন তোমাদের পথ ফুলময় হয়।

কাঠের বাক্সে যখন নকশা করে ঘরে রেখে দাও তা কাঠের গুণ বাড়াবার জন্য নয়, দোষ ঢাকবার জন্য। এখানে মেটিরিয়ালের গুণ দেখালে কোথায়? এই তো কাঠের বীণা, যেখান থেকে সুর বের হয়, সাদাসিধে তুম্বটি। সেখানে কোনো কারুকার্য নেই। জানে, তা হলে সুর খারাপ হয়ে যাবে। হাতির দাঁতের নকশা বসিয়েছে অন্য জায়গায়—এ দিকে ও দিকে। বেহালাও দেখো; ওইখানে কাঠের সম্মান দিয়েছে। ওই এক বেহালা যন্তর, চেঁছে-চেঁছে কত যুগ গেছে কাঠের সঙ্গে ভাব করতে। আর্টের সঙ্গে কাঠের সম্মান একেই বলে। আর্টের জিনিস হচ্ছে, এক একটি বে-জোড় মোতি। জুড়ি মেলা ভার।

আজ একটি ফুল ফুটল, নিয়ে যাও। বিকেলে আর-একটি ফুটল। একটি-একটি ফোটে। উড্‌ব্লক, হাজার হাজার বের করে দেবে। সায়েন্সের কোঠায় গেল সে-সব। ওরিজিনাল হবে একখানি।

পৃথিবীতে পাথরের মর্যাদা দিয়েছে কচিৎ দু-চার জন আর্টিস্ট। একটি মূর্তি, এর আর জোড়া নেই।

অনেক মানুষ জন্মাল, মরল, অনেক যুগ গেল। একটি মানুষ এল। বুঝতে দেরি হল না যে, হাঁ, এই একটি মানুষ বেরিয়েছে!

এই তো হাজার পিদিম জলে দেওয়ালিতে, কিন্তু নিজের ঘরে যে ছোটো পিদিমটি জালো, তার জোড়া কোথাও পাবে না।

এইরকম প্রত্যেক জিনিসেই আছে। যেমন নানা ফুলের সৌরভ, কারো জোড়া নেই। পছন্দ বা রুচি অনুযায়ী যার যা ভালো লাগতে পারে।

প্রকৃতির সব কিছুই স্টাডি করতে হয়।

দেখো, মৌমাছিরা যে চাক করে, মধু সংগ্রহ করে আনে নানা ফুল থেকে, সে কি তুমি আমি সেই মধু খাব বলে? তা তো নয়। সেই কথাই আমি বলেছিলুম যে, যে দেশে হোমলাইফ নেই সে দেশে কলাকৌশল কাজে আসে না। ঘর নেই তো যত্ন করে ছবি আঁকবে, ঘর সাজাবে কার জন্য, কিসের জন্যে? দুদিনের বাসাবাড়ি হোটেল, সে কি কেউ অত দরদ দিয়ে সাজায়? মোগল-বাদশাদের ছিল সে ভাব; 'আমার রাজ্য', 'আমার প্রাসাদ'। সাজাত তারা তা ভালো ভালো শিল্পী কারিগর দিয়ে।

ওই যা এক কথা বলেছি আমি, শুধু বলেছি নয়, দেখেছি হোমলাইফ না থাকলে ছবি হবে না। নিজের ছেলের জন্য ছবি আঁকো, দেখবে, তখন আবার আলাদা রূপ নেবে।

বললেন, কেবল মনে রেখো, শাস্ত্রে বলে, যা দেখে হৃদয় মুগ্ধ হবে, সেই হচ্ছে আর্ট। শিশুকে সোনার ঢেলা দাও, সে রঙচঙে মাটির ঢেলাটির দিকে, লাল কাগজের ফুলটির দিকেই হাত বাড়াবে, তার হৃদয় দুলে উঠবে। এই তো আর্ট। বলো—

'মন দিল না সায়
কেমনে লিখা যায়'?

বললেন, তোমরা ভুল করো।

আলিম্পন আর আলিপনা এক কথা নয়। কত আর বুঝিয়ে বলব। দাও দেখি একটা কাগজ, লিখেই ফেলি। বলে, লিখলেন, আলিম্পন কথাটি পুরো সংস্কৃত আর আলিপনা কথাটি পুরোপুরি চলতি-বাংলা। আলিম্পন বোঝায় কিছুর প্রলেপ দিয়ে দেয়ালে বা মেঝেতে কিছু করা। যেমন কাদা দিয়ে ঘর নিকানো, চুন লেপে দেয়ালে চুনকাম করাও বোঝায়। ভিত্তিচিত্রণ এসে পড়ে এর ভিতর।

আলিপনা বোঝায় সখীপনা করে ঘরের শ্রীবর্ধন করা। মালা গাঁথা, পান সাজা, আরো কত কী করা বোঝায় আলিপনা শব্দটি। এর মধ্যে পাঁচ সখীতে মিলে আলপনা দেওয়া, পিঁড়ি-চিত্র করাও এসে পড়ে।

কাদম্বরীতে দেখি রাজা স্নান সেরে যে উত্তরীয়খানি পরবেন তার পাড়ে সখীরা চন্দনের রেখায় 'হংসমিথুন' লিখে দিয়ে আলিপনা বা সখীপনা করে প্রতিদিন।

কবি কালিদাস বর্ণনা করেছেন, ইন্দুমতীকে নিয়ে রাজকুমার অজ ফিরছেন খবর হল, সঙ্গে সঙ্গে নগরের অট্টালিকাগুলি রাজমিস্ত্রীর হাতের আলিম্পনে বা চুনকামে সুধা-ধবলিত হয়ে গেল। তোরণ-সমস্ত চিত্রকরের হাতের নানা বর্ণের প্রলেপ ও নকশাতে যেন ইন্দ্রধনুর শোভা বিস্তার করলে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আলিম্পনের কাজ চুকলো যখন তখন প্রসাধনের বেলা। পুরস্ত্রীরা প্রসাধনে রতা, শোভাযাত্রায় বাদ্যধ্বনিতে সচকিত হয়ে প্রসাধন অসমাপ্ত রেখে তারা ছুটল বরবধূ দর্শনে। তখনো শুকোয় নি পায়ের আলতা, বাঁধা হয় নি গ্রন্থি মুক্তাহারের। বরবধূ দেখার আবেগভরে চলে গেল পুরকামিনীরা; ছেঁড়া হার থেকে বিগলিত মুক্তাবিন্দু, সিক্ত চরণের অলক্তক রাগ তাদের গতাগতির পথে যেন অপরূপ আলিপনার শোভা বিস্তার করলে।

বললেন, বুঝলে? এই হল আলপনা।

নকশা নয়, আলপনা
সেটি বিনি সূত্রে ধরা মনের কামনা।
ছেলে-ভোলানো ছড়া যেন চাঁদ-ধরা ফাঁদ,
ব্রতচারিণীর আলপনার তেমনি ছিরি ছাঁদ।'

আলপনা হবে যেন ফুলের মালাটি ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ভুঁয়ে।

অবনীন্দ্রনাথ যখন লিখতেন, বানানের দিকে তাকাতেন না। 'ঘরোয়া'র ভূমিকা লিখে দিয়েছেন— তাঁর হাতের লেখাই ব্লক করে ছাপানো হবে। গ্রন্থনবিভাগ থেকে তাঁদের একজন এসে অতি দ্বিধা-সংকোচের সঙ্গে জানালেন, এতে একটু স্পেলিং মিসটেক আছে।

অবনীন্দ্রনাথ ধমকে উঠলেন, ও কারবার আমার নয়। বললেন, 'স্পেলিং' দিয়ে কি করব, আমি 'স্পেল বাউণ্ড' করি।

পরে অবশ্য ঠিক করে লিখে দিলেন; কিন্তু আশীর্বাদের তালব্য শয়ে হ্রস্ব ই-কারই থেকে গেল। দ্বিতীয়বার তা নিয়ে আর কেউ বলতে সাহস করলেন না।

সবাই তাঁকে বলেন, আপনার ভাষা এমন হল কি করে? এ যেন ধ্বনি এক-একটি।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, আমি যে ভাষা লিখি নে, ভাষা কানে শুনি।

সেখানেও ছন্দের সুর। 'এক যে ছিল রাজা', তেমনি তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে এসে গেল, 'তার ছিল এক রানী'। আমার গল্প বলাও তাই।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, রবিকার ক্ষুধিত পাষাণ কী থেকে লেখা হল জানো? লোকে তো জানে তিনি তখন শাহিবাগে ছিলেন, পুরানো একটা বাড়ি থেকে ইনস্‌পিরেশন পেয়েছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি সব। ভাবের একটা বিভাব থাকে, ভাবকে এক্সাইট করে একটা কিছু। সেই রকম এক্সাইট্‌ করেছিল তাঁকে যা, তা কেউ জানে না বড়ো।

দুখানি বড়ো এনগ্রেভিং; বেশ বড়ো; থাকত সিঁড়ির দুপাশে। স্টুডিয়ো সাজাতে এনেছিলুম খামখেয়ালির সময়ে। নাটোর খামখেয়ালির ঘর সাজালেন, ছবি দুটো রাখলেন সিঁড়ির দুদিকে টাঙিয়ে। বললেন, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বেশ দেখা যাবে। বললুম, তা বেশ।

ছবি দুটির একটি ছিল, এক অতি পুরাতন প্রাসাদের নীচে হাবশী সর্দারের মতো একটা লোক তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘাড় গুঁজে পাহারা দিচ্ছে। উপরে ছোট্ট একটি জানালার ভিতর দিয়ে সুন্দর একটি মুখ উঁকি মারছে, পালাবে, না ঠিক, দেখছে পাহারাওয়ালা কি করছে।

আর-একটি ছবি ছিল, স্নানের ঘাটের দৃশ্য। একদল মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে জলে।

ছবি দুখানা থাকে বরাবর সিঁড়ির দুপাশে। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় দেখতে দেখতে উঠি। খামখেয়ালির আসরে যাঁরা আসেন, তাঁরাও দেখেন। কিছুদিন বাদে ছবি দুটো স্টুডিয়োতে সরানো হল।

ইতিমধ্যে রবিকা কিছুদিনের জন্য শাহিবাগে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে একদিন এলেন খামখেয়ালির ঘরে; হাতে একতাড়া কাগজ। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময়ে বললেন, অবন, সেই ছবি দুখানা কোথায় গেল?

বললুম, স্টুডিয়োতে নিয়ে গেছি।

বললেন, ও, আচ্ছা। এসো তোমরা সব। একটা গল্প পড়ে শোনাব।

পড়লেন 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটা। হুবহু সেই দুখানি ছবির বর্ণনা।

কিসে কাকে কখন এক্সাইট করে কিছুই জানা নেই। সব সময়ে চোখ কান খুলে থাকবে। কিসের থেকে যে কী পেয়ে যাবে তা নিজেও জানবে না অনেক সময়ে।

রবিকা বললেন, অবন, তুমি সবরকম বই-ই পড়ো, একধার থেকে পড়ে যাও।

সেই যখন ছেলেদের জন্য গল্প লিখি, জানি নে, কি করে কী হল। মনে হত যেন পিঠের দিকে কানের পাশে বসে এক বুড়ি বলে যাচ্ছে, আর আমি লিখে যাচ্ছি। সে-মন এখন আর নেই। সেই সুর বদলে গেছে। তখন ছিল সুরের খেলা। রবিকা বলেছেন, 'তালের পাতা মুখর করে তোলে'। তিনি সেই সুর শুনতে পেয়েছিলেন সব কিছুতেই। তবে-না এত বড়ো কথা লিখে যেতে পারলেন।

বললেন, রবিকা মারা গেলেন এমন এক পুণ্য দিনে, রাখী-পূর্ণিমায় যেদিন চাঁদের আলোর সুতো দিয়ে সমস্ত বিশ্বকে বেঁধে দেয় এক ডোরে। এমন দিন বাদ দিয়ে ক্যালেণ্ডারের খটখটে দিন নিয়ে কারবার করবে? এই রাখীপূর্ণিমাই হচ্ছে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীর আসল উৎসবের দিন।

বাইশে শ্রাবণ। সকালবেলা উদয়নের বারান্দায় বসে আছেন অবনীন্দ্রনাথ। মন্দিরে যাবেন। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, গলায় চাদর। দূরে মন্দিরের ঘণ্টা বাজছে, ঢং ঢং ঢং ঢং। মহাদেব গোপ গেল সাইকেল-রিকশা বের করে আনতে। মহাদেবই রিকশা চালিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে মন্দিরে নিয়ে যাবে। ঝরঝর বৃষ্টি পড়ছে।

উদীচীর দিকে চেয়ে আছেন অবনীন্দ্রনাথ। হাওয়ায় উদীচীর ঘরে দরজার পর্দা দুলছে মৃদু মৃদু। অবনীন্দ্রনাথ যেন প্রাণের গোপন এক কথা না বলে পারলেন না, বললেন, জানো, মনে হচ্ছে যেন ওই পর্দা সরিয়ে এখনি বেরিয়ে আসবেন রবিকা।

বললেন, বসে বসে ভাবছিলুম, যতকাল আছি, প্রতি বছর এই দিনটি কী আসবে কেবল দুঃখই দিতে? মনে করতে হবে তিনি আর নেই এ পৃথিবীতে? তা কেন? কেন মনে হবে না তিনি আছেন, আছেন আমাদের অন্তরে। কেন পারব না সেইভাবে গ্রহণ করতে এই দিনটিকে? পারব, যেদিন তাঁকে সত্যিই অন্তরে নিতে পারব। সেদিন আর দুঃখ থাকবে না। বাইরে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি নে বলে আর কাঁদব না। মিছে বলা রানী, 'না' বললেই কী আর পারা যায়, থামে কান্না? এ যেন ছোটো ছেলের কান্না। ভোলাতে গেলে আরো বেশি করে কাঁদে।

মন্দির থেকে ফিরে এলেন। আবার পুবের বারান্দায় তেমনি ভাবে বসে রইলেন। মন্দিরে অনেক গানের মধ্যে এই গানটাও হয়েছিল, 'দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?'

বললেন, উত্তর তো পেলে? ওই হল, আসল কথা। দুঃখ পেয়ে দুঃখকে শেষ করতে হবে। অনেক দুঃখ পেয়ে বুঝেছি আজ এ কথা। তবে, আগুনে তো হাত পুড়বেই। কত আগুন ভিতরে, বাইরে তা জ্বলে যখন— হাত পোড়ে। উপায় নেই।

সংগীত-ভবনের একটি মেয়ে এসে প্রণাম করল। তিনি বললেন, গা দেখি নি একটা গান।

মেয়েটি পর পর কয়েকটি গান গেয়ে শোনাল।

তিনি বললেন, এই গানই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। গান গেয়ো, থেমো না। এই গান তোমাদেরও বাঁচিয়ে রাখবে সবাইকে। তাঁর চিঠিতেও বারে বারে এই গানের কথা উল্লেখ করতেন। এক চিঠিতে লিখলেন, কাল বিকেলে ঝড়বৃষ্টির ঝাপটা ফুলপাতার সঙ্গে আমার পুতুলগুলো উড়িয়ে পুকুর জল শিউরে দিয়ে চলে গেছে যখন, তখন বেতারে এই গান এই নির্জনে শুনে মনে যে কী হল তা কেমন করে বোঝাব। 'দিনের পথিক মনে রেখো, আমি চলেছিলেম রাতে সন্ধ্যাপ্রদীপ নিয়ে হাতে।' তার পরে স্বপ্ন দেখছি গানের দল নিয়ে আমায় যেতে হবে বিদেশ যাত্রায়। ভয় হল, ঘুম ছুটে গেল।

আনন্দবাজার পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের লেখার একজন সমালোচনা করেছেন। অনেকে বলছেন এটার একটা জবাব দিতে। অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন,'…ছেড়ে দাও তাদের কথা। প্রতিবাদের ঢেলা সশ্রদ্ধভাবে কেবল আমারি লেখা কাগজের উপরে 'পেপারওয়েট' হয়ে থাক, এতে আপত্তি কেন করব? আমার মনের কৌটোর সিঁদুর যেটুকু তা তোমাদের জন্যে থাকলেই আমি সুখী। হায় রে, 'শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে অতল জলের আহ্বান। মন রয় না, রয় না রয় না ঘরে, চঞ্চল প্রাণ।' তোমাকে যে গাছ আঁকতে বলেছি সেটা এই সুরে বেঁধে ফেল, দেখবে ঠিক হয়ে গেছে ছবি।'

লিখলেন, '…সূর্য অস্ত গেছেন, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, চোখ আর চলে না। সেখানে থাকলে চাতালে বসে দুটো গান শুনতেম।'

গুরুদেবের গান ছিল অবনীন্দ্রনাথের সুখ শোক, সকল ভাবের আশ্রয়।

থেকে থেকে তিনি গান শুনতে চাইতেন, গাইয়েদের ফরমাশ করতেন, 'গা দেখিনি ওই গানটা একবার।'

গুরুদেব চলে গেলেন। যাবার আগে তিনি অবনীন্দ্রনাথকে বাংলা দেশে সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান করে গেলেন। বলে গেলেন, 'অবনীন্দ্রনাথ দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন।··· একে যদি দেশলক্ষ্মী বরণ করে না নেয়, আজও যদি সে উদাসীন থাকে তবে এই যুগের চরম কর্তব্য থেকে বাঙালী ভ্রষ্ট হবে।'

কলকাতার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান গুরুদেবের শেষ ইচ্ছা যথাসাধ্য পালন করলেন। অবনীন্দ্রনাথ সেই অনুষ্ঠানে গাইয়েদের দিকে তাকিয়ে করুণভাবে অনুরোধ করলেন, আমাকে সেই গানটা একবার শুনিয়ে দাও 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে।'

একদিনের ঘটনার দুঃখ আমি এ জীবনে ভুলতে পারব না। উদয়নে অবনীন্দ্রনাথ বসে আছেন দোতলায় উঠবার সেই সিঁড়ির মুখে। এক চিলতে স্থান। এক দিকে সিঁড়ি, এক দিকে দরজা, এক দিকে মোটা থাম, পুব দিকটা শুধু একটু খোলা। সরু চৌকো খুপরিমত জায়গা। এইখানে বসে থাকতে তিনি খুব পছন্দ করতেন।

সেদিনও বসে আছেন। বাদলা দিন, আবছা আলো, বেলাশেষের ক্ষণ। স্তব্ধ মুহূর্ত। পাশে স্থির হয়ে বসে আছি। এক সময়ে অবনীন্দ্রনাথ বললেন, গাও দেখিনি সেই গানটা, 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই, প্রহর হল শেষ।'

চুপ করে রইলাম।

বললেন, গাইতে পার না তুমি? একটুও পার না?

কী বলব! এ যে কী গভীর বেদনা আমার এ জীবনে, গাইতে পারি না বলে।

তিনি বললেন, যা পার, যেমন তেমন করেই গাও-না; কথাগুলি একবার শুনি

কী কাতর অনুরোধ তাঁর একটু গানের জন্য। বুক আমার ব্যথায় ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল। উদয়নে সেই মুহূর্তে গাইয়ে কেউ নেইও ধারে-কাছে, কী করি!

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, তা হলে মুখে বলে যাও গানটা। শুনি।

মুখে বলে গেলাম, 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই।'

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, এরা গান মনে রাখে না দেখি। এমন গান, ভোলে কী করে? সেদিন একটি মেয়েকে বললুম গাইতে, বললে কথা মনে নেই। বললুম, সে কি রে? আমরা সেই কবে কোন্‌কালে গাইতুম, এখনো তার একটি কথা ভুলি নি। কত সময়ে বসে মনে মনে আওড়াই। আর তোরা এখানকারই ছেলেমেয়ে হয়ে গানের কথা ভুলে যাস?

এই এখনো আমি তাঁর গানের মধ্যে কত কিছুর জন্য হাতড়ে বেড়াই। সেদিন দিদিমণির জন্য মন কেমন করছিল, কেবলই মনে হচ্ছিল, আমায় সে ভুলে যাবে না তো? রবিকার গানের একটা লাইন মনে পড়ছিল, 'মনে রবে কি না রবে আমারে'। কাকে যেন বললুম, গা দেখি সেই গানটি একবার, দেখি তার মধ্যে খুঁজে কিছু পাই কি না— সাহস সান্ত্বনা!

এর পর হতে মাঝে মাঝে সন্ধের পর যখন কোনোদিন অবনীন্দ্রনাথ একলা চুপচাপ বসে থাকতেন, আমি গীতবিতান নিয়ে পাশে বসে পড়ে শোনাতাম।

কতকগুলি গান সইতে পারতেন না। যেমন, 'আরো আঘাত সইবে প্রভু, সইবে আমারো, আরো কঠিন সুরে জীবন তারে ঝংকারো'। বা, 'আরো আরো প্রভু, আরো আরো, এমনি করে আমায় মারো'। যদি পড়তে পড়তে পড়ে যেতাম 'মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল, আজি ঘিরিল তোমার পদতল'। তিনি বলে উঠতেন, না না, ওটা না। ওটা বাদ দাও, অন্য গান পড়ো। রবিকা পারতেন বলতে, তাঁর সেই বুক ছিল। আমি পারি না। আমি বলি, অনেক তো হল, এবার আমায় তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ কর।

বলতেন, তোমরা সব রবিকার জীবনী খুঁজছ, রবিকার গানই তো তাঁর জীবনী। গানের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে দিয়ে গেছেন। তাঁর জীবনের প্রতি মুহূর্তের সব ভাব তিনি সুরে সুরে ধরে দিয়ে গেছেন। অনেকের গান শুনেছি তাতে গাইয়ে-মানুষটিকে তো কাছে পাই নে। রবিকার গানের এই বিশেষত্ব গানের কথায় সুরে জড়িয়ে পাই মানুষটিকে অমৃতরূপে। এ-সব গান শুনে তোমাদের মনে কী হয় জানি নে। গানের মধ্যে রবিকার সারা জীবন ধরা আছে। সুর ও কথার অন্তরে তাঁর জীবন্ত ছবি ওইখানেই পাবে।

কর্মজীবনে ধর্মজীবনে আংশিকভাবে আছে, কিন্তু গানের মধ্যে তিনি পূর্ণভাবে বিদ্যমান।

দেখো, রবিকার গান বুঝতে সংগীত-বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করলে যে সবটাই পাবে তা নয়। কোথায় সুর খাদে নামল, কোথায় কোমলে আঘাত করল, এ বুঝুন-গে পণ্ডিতেরা, রসিকেরা নয়। রসিকদের এসে সুরটি লাগে কোন্ খানে? এইখানে, ঠিক বুকের মাঝখানে।

ধরো-না পাখি ডালে বসে গান গাইছে, পাখিতত্ত্ব নাই-বা জানলুম, তার সুরটি অ্যাপীল করছে, এই তো যথেষ্ট। মাছরাঙা, তার কোথায় বাসা, কিভাবে বাসা তৈরি করে, কতদিন বাঁচে, এ-সবের আর-একটা দিক আছে, তা থাক। আমাদের কাছে সে তার নানা রঙ-বেরঙের পাখা দুটি মেলে জলে পড়ে আবার বনের দিকে ঝট্‌পট্‌ উড়ে পালায়, দেখে মনটা খুশিতে নেচে ওঠে। যেন পান্নার টুকরোটি উড়ে গেল।

শুধু সুর নয়, মনের সুরে আর গানের সুরে যখন এক হয়ে মিলে যায়, সে এক অপূর্ব জিনিস। সবাই বলে রবিকা কথায় ও সুরে পরিণয় ঘটিয়েছেন। পরিণয় কোন্‌খানটিতে? সে সবাই ধরতে পারি কি? সুরের রূপ নেই। সুর রূপ ধরে মনের ভিতরে। ছবির বেলায় চোখ রূপকে ধরে, তার পর, যখন মনে যায় তখন তার রসমূর্তি প্রকাশ পায়। এইখানেই চিত্রে ও গানে তফাত। সুরের বাহনে গান মনে আসে, ছবি মনে আসে রূপের বাহনে। কত রঙ দিয়ে যখন নিজের মনের রঙটি লাগবে ছবিতে তখনি ঠিক জিনিসটি হবে।

গানে সেইখানেই রবিকা সুরে ও কথায় পরিণয় ঘটিয়েছেন। ধরো, একটা স্রোত বয়ে চলেছে, তার মধ্যে এক গোছা পদ্ম। স্রোত হচ্ছে সুর, পদ্ম— কথা, রূপ। সেই সুরের স্রোতকে রবিকা বেগে চালান নি। তা হলে পদ্ম আছড়ে-পিছড়ে উলটে-পালটে একাকার হত। তিনি স্রোতের উপর পদ্মকে দোলা দিয়েছেন। স্রোতের উপর পদ্মটি ধীরে ধীরে দুলছে, পদ্মের ছায়াটিও দুলছে। রবিকা এইভাবে কথায়-সুরে পরিণয় ঘটিয়েছেন। তিনি আঘাত করেন নি, দোলা দিয়েছেন। সুরের সুমন্দ স্রোতে কথাগুলি যেন স্বচ্ছন্দে দুলছে।

এবারে আসবার সময়ে অজয়ের কাছে দেখলুম একটি লাল জলের ধারা

বয়ে চলেছে, সবুজ একটি গাছ ঝুঁকে পড়েছে তাতে। গাছের ছায়া পড়েছে জলে, সেটি কাঁপছে স্রোতের গায়ে। কী সুন্দর মিলন তাদের।

গুপ্তনিবাসে আমার শোবার ঘরের নীচে একটি ঝিল। এক-একদিন গভীর রাতে উঠি, দেখি, আকাশে শুকতারাটি জ্বলজ্বল করছে, তারই আলো পড়েছে জলে। ঝিলের জল কাঁপছে থরথর করে। মনে হয় শুকতারার ছায়াটি যেন ঝিলের জলে স্নান করতে নেমেছে। আকাশের তারাতে জলের ছায়াতে কোথায় একটা মস্ত যোগ।

একদিন অবনীন্দ্রনাথ উদয়নের সামনের বারান্দায় বসে আছেন। পিছনে পশ্চিমের বারান্দায় 'চণ্ডালিকা'র রিহার্সাল হচ্ছে। বোঠান আছেন, দেখিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছেন। পশ্চিমের বারান্দার নাচ-গান ঝম্‌ঝম্‌ করে এসে পৌঁচচ্ছে পুবের বারান্দায়। অবনীন্দ্রনাথ সেখানে বসে বসে শুনছেন। শেষে এক সময়ে আর স্থির থাকতে পারলেন না। একরকম ছুটে পিছনের বারান্দায় গিয়ে হাজির হলেন, বললেন, আহা! কী গানের সুর, আমায় মাতিয়ে দিলে। ওরে প্রতিমা, আশ্চর্য এই সুরের খেলা তিনি করে গেছেন এই চণ্ডালিকা নাটকে। একি যে-সে সুর? সুর নিয়ে তিনি খেলেছেন। আশ্চর্য জিনিস। এক শুনেছিলুম মায়ার খেলা, ওঁর প্রথম বয়সের। বাল্মীকিপ্রতিভা, আরো কত কত নাটক হয়ে গেছে, তারা সব একটা ধারা ধরে একটা বিশেষ বিশেষ জায়গায় পৌঁচেছে। আর এই চণ্ডালিকা— ওঁর শেষ বয়সের নাটকে উনি সব ভেঙেচুরে ওই মাঝ-দরিয়ায় তোলপাড় করেছেন।

পরে আবার পুবের বারান্দায় এলেন। বললেন, সেই তোলপাড়ের আনন্দ পেয়েছি বলেই না তোমাদের বলি, পারের থেকে মুক্তি পেয়ে এসো মাঝ-দরিয়াতে।

আর-একদিন, বর্ষামঙ্গলের নাচগানের রিহার্সাল হচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথ সেখানে বসে দেখছেন। তাঁর এক পাশে ক্ষিতিমোহন সেন মশায়, পিছনে নন্দদা। মাঝে মাঝে তাঁদের মধ্যে গানের কথা হচ্ছে। নন্দদা বললেন, সুর সবার গলায় আসে না।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, তা নয় নন্দলাল। সুর সবার গলাতেই আসে। সা রে গা মা, সাতটা সুর গলা সাধলে তোমার গলাতেও আসবে। চেষ্টা করলে কালোয়াতি গানও গাইতে পারবে। কণ্ঠে সুর সবারই আসে। কিন্তু

মনের সুরই আসল। এই মনের সুর সবার আসে না।

ক্ষিতিমোহন সেন মশায় তখুনি দুটি লাইন আউড়ে দিলেন,

মন সাধে তো সব সাধে,
তন্ সাধে তো সব ছোড়ে।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, এ কথা ঠিক। সেই সুর লেগেছিল এই একটি লোকের মনে। গানে গানে ছেয়ে দিয়ে গেছেন, অমৃত ঢেলে দিয়েছেন। কতকাল চলবে এখন এই অমৃত পান করে। বেঁচে যাবে লোকেরা যুগ যুগ ধরে।

কুটুম-কাটাম আর ছবির ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে অবনীন্দ্রনাথের কাছ হতে গল্প সংগ্রহ করছি। তবে এবারের গল্প আমাদের আগের মতো জমছে না মোটেই। কোথায় যেন সুর কেটে গেছে। সেই শখ করে গল্প ঢেলে দেওয়া— সে আর হয় না। তাই তাঁর অজান্তে যেটুকু পারছি গল্প ধরে রাখছি।

একদিন ভয়ে ভয়ে এনে কিছুটা গল্প পড়ে শোনালাম তাঁকে। তিনি চুপ করে রইলেন। পরের দিন খুব ভোরে নিজেই চলে এলেন কোণার্কে। তাঁর চলায়-বলায় বিরক্তি-ভাব। বললেন, দেখো, যা লিখেছ ছিঁড়ে-কুটে ফেলো। এখন আমার গল্প পড়বে কে? যিনি পড়ে খুশি হতেন তিনি চলে গেছেন, বলে উঠে চলে গেলেন।

কিছুদিন পরে কী মনে হল, বোধ হয় আমার প্রতি অনুকম্পা হল, বললেন একদিন, আচ্ছা থাক্ ওগুলো। চলতে থাকুক। দেখি কতটা যায়, সেই বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে পরে।

এর পর হতে তাঁর মনের গতিক বুঝে তাঁকে গল্প পড়ে শোনাই। এই-সব গল্পই পরে 'জোড়াসাঁকোর ধারে' নাম দিয়ে বই বের হয়। এই বইয়ে তাঁর বলা গল্প দিয়েই তাঁর জীবনের নানা ঘটনা, নানা দুঃখসুখ, অনেকটা ধরে দেওয়া হয়েছে। এ বই তাঁরই জীবনকাহিনী বলতে পারা যায়।

তা এদিনও গল্প পড়ে শোনাচ্ছিলাম তাঁকে। শুকনো তালপাতার আধ-পোড়া একটি ছোটো ডাঁট কুড়িয়ে এনে রেখেছেন ঘরে কবে কোন্ দিন। তালপাতা যেখান থেকে বের হয় ঠিক সেই জায়গাটা। মালী বা দারোয়ান

কেউ হয়তো জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করেছিল তা, শুকনো পাতাগুলি পুড়ে গেছে, শক্ত ডাঁটের কাছটা ছিল অমনি পড়ে। সেটা কোথা থেকে কোথা দিয়ে, গড়াতে গড়াতে এসে পড়েছিল পথের পাশে। বেড়াতে বেরিয়ে নজর পড়ল অবনীন্দ্রনাথের, তুলে এনে রেখে দিলেন ঘরে।

আমার পড়া শেষ হলে বলে উঠলেন, কানে শুনছিলুম তোমার লেখা আর চেয়ে দেখছিলুম কোনায় ওটিকে— ওই তালপাতার ডাঁটটিকে। দিব্যি একটি পাখি। আনো দেখি কাছে।

এনে দিলাম।

বললেন, এই দেখো পাখির লেজ, ডানা, সবই ঠিক আছে। কেবল একটি মুখ বসিয়ে দিলেই, ব্যস্ ময়ূরটি।

সরু ডালের টুকরো একটি সঞ্চয়-করা-সামগ্রী হতে তুলে নিয়ে জুড়ে দিলেন তাতে। চমৎকার একটি ময়ূর হয়ে গেল নিমেষে পোড়া-ডাঁটের।

বললেন, আনো একখানা কাগজ, এঁকে ফেলি এর ছবি।

ছবি আঁকতে লাগলেন। আঁকতে আঁকতে বলতে লাগলেন, এ যক্ষপুরীর ময়ূরী। যক্ষের বিরহে পুড়ে পুড়ে রঙটঙ এর কোথায় চলে গেছে।

বলছেন আর আঁকছেন। ছবিতে রঙ দিলেন না মোটে। হালকা একটু ব্রাউনের টাচ দিলেন এখানে-ওখানে শুধু। যেন সাদা ময়ূর মলিন হয়ে আছে ভাব।

বললেন, একে দেখে প্রথম থেকেই আমার কেমন মনে হল এ যক্ষের ময়ূরী।

অভিজিৎ যখন-তখন আসে অবুদাদুর কাছে। অবুদাদুর কুটুম-কাটাম গড়ার সাথী সে। অবুদাদু ছবি আঁকলে উবু হয়ে দেখে একপাশে দাঁড়িয়ে।

অভিজিৎ এল, দেখল। বলল, অবুদাদু, ময়ূরের রঙ কই? গলায় রঙ দাও। উত্তরায়ণে বাগানে পোষা ময়ূর ঘুরে বেড়ায়, পেখম ছড়ায়; রঙে ঝলমল করে সর্বাঙ্গ তার। ময়ূর দেখে রোজ অভিজিৎ। তাই ময়ূর বলতে ময়ূরের রঙটাই বোঝে সে আগে।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, সে-একটি পরে তোমায় এঁকে দেব, কার্তিকের ময়ূর। এর গলায় রঙ চলবে না, এ যে রঙ-ছুট্ ময়ূরী।

এই রঙ-ছুট্ ময়ূরীই 'নট ফর সেল' ছিল আমাদের দুজনের সেই সাজানো

একজিবিশনে। বলছি সে কথা পরে।

এক অবাঙালি মহিলা, কলাভবনেরই প্রাক্তন ছাত্রী, সে বললে, আমি হলে ওই পোড়া কাঠটাই হুবহু রাখতাম।

আঘাত না পায় সে, এইভাবে অবনীন্দ্রনাথ বললেন, হুবহু কাঠটি এঁকে যাওয়াও মন্দ নয়। ভালো করে ড্রইং করে আঁকতে পারলে ভালোই তো। তবে কী জানো, ওটা চোখের দরজা পর্যন্ত এসে ঠেকে গেল। এই কাঠটি দেখে তোমার মনে কী ভাবের সৃষ্টি করল, সেটা আরো বড়ো জিনিস। চোখের দরজা পেরিয়ে মনের ভিতরে গিয়ে তবে তা ফুটে আসে।

এ-বেলা ও-বেলা রোজ অবনীন্দ্রনাথ ছবি এঁকে চলেছেন। কিছুদিন আগে কোণার্কের বারান্দায় এসে বসেছিলেন। পাশে মৃন্ময়ীর চাতাল; দেখে দেখে বললেন, এই চাতালের কোণটি এঁকে দিয়ো তো, বড়ো ভালো লাগছে। চাতালের উপরে একটি ফিগার বসিয়ে বেশ একখানি ছবি হবে।

ভুলে গিয়েছিলেম সে কথা। সেদিন সকালে এসে দেখি উদয়নের কাচের ঘরে একটি কাগজ নিয়ে ওই ছবিটি আঁকবেন বলে বসেছেন।

আমি তাড়াতাড়ি ‘আমাকে অপরাধী করবেন না’ বলে দৌড়ে এসে একটা সাদা কার্ডে চাতালের কোনাটা এঁকে নিয়ে এলাম।

ততক্ষণে কাগজে একটি মেয়ে বাজনা হাতে বসে গিয়েছে মশগুল হয়ে।

অবনীন্দ্রনাথ ছবির নীচে চাতালের কোনাটা এঁকে দুপাশে কয়েকটা গাছ দিলেন। চাতালের নীচে কয়েক ধাপ সিঁড়ি দেখালেন। বললেন, নয়তো উঠবে কোথা দিয়ে?

নিখুঁত মিহি লাইন দিলেন সব। বললেন, একবার দেখিয়ে দিই মিহিকাজ এখনো করতে পারি। বললেন, মোগল-পেন্টিং কাকে বলে দেখে নাও।

ছবিতে খুবই ডেলিকেট রঙ লাগালেন। পিছনে পাহাড় হল। চুলে দিলেন সোনালি আভা। পাহাড়ের গায়ে বনের ভিতরে, যেন মন্দিরের চাতালের এককোণে বসে মেয়েটি— শ্বেতপাথরের মূর্তি একটি।

বললেন, মূর্তি বোঝা যাচ্ছে তো? তবেই দেখো বুঝতে পেরেছ অনেকটা, আমি কী করতে চাইছি।

চুলের দুপাশে ছোটো ছোটো সোনালি জটা ঝুলিয়ে দিলেন। বললেন, এখনো ধরতে পারছ না? তবে থাকো খানিক বসে। এত সহজে ধরা

দিচ্ছি নে।

স্নানের জন্য তাড়া দিল বাবুলাল এসে।

ছবিখানা হাতে নিয়ে বললেন, এবারে তবে বলে যাই কাকে আঁকছি। এ হচ্ছে 'মহাশ্বেতা'। পড় নি গল্প ? কবি এর গৌর রঙের কত বর্ণনাই দিয়েছেন ; যেন চাঁদের আলোয় ধোয়া মূর্তি, যেন সাদা মেঘ, যেন গজদন্তের তৈরি সে রাজকুমারী। কত শুভ্রের সঙ্গেই তুলনা করেছেন তাকে। দেখি হয় কি না। বলে তো ফেললুম আগে হতেই।

বিকেলে ছবিখানা নিয়ে আবার বসলেন। দুপাশের গাছগুলি আরো ফুটিয়ে দিলেন। গাছে গাছে লাল হলুদ ফুল ভরে দিলেন। আকাশে সূর্যাস্তের নানা রঙ লাগালেন। অভিজিৎ ঘরে ঢুকে দেখে বলে উঠল, বাঃ।

দেখতে দেখতে ছবিখানি প্রায় শেষ হয়ে এল।

অবনীন্দ্রনাথ হেসে উঠলেন, বললেন, ও অভিজিৎ, এ যে কেমন ক্রিসমাস কেক-এর ছবি হল।

আরো খানিক পরে নিজের মনেই বলে উঠলেন, এ যে ঢাকার মিছিলের চৌকি সাজানো হল।

বসে বসে দেখছি আর ভাবছি— এ-সব কী কথা ! ভাবছি, একবার নাম সই করে দিলেই ছবিটি সরিয়ে রাখি। নয়তো রকম-সকম যেরকম দেখছি, শেষ পর্যন্ত কী হয় কে জানে !

অবনীন্দ্রনাথের কোলে বোর্ডের উপরে ছবি। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি ছবির দিকে। এমন সময়ে বললেন, একটু কালি গুলে দাও।

চাইনিজ ইঙ্ক-এর কেক ঘষে কালো রঙ গুলে দিলাম। একেবারে জেট ব্ল্যাক রঙ।

অবনীন্দ্রনাথ বড়ো তুলিতে টস্‌টসে করে কালি তুলে নিয়ে মহাশ্বেতার চার পাশে লেপে দিলেন।

বসা মহাশ্বেতা উঠে দাঁড়াল বীণা হাতে সেই অন্ধকারে।

ছবিসমেত বোর্ডখানা তখন আমার হাতে দিয়ে বললেন, নাও, তুলে রাখো এখন। কাল দেখা যাবে কী বের হয় এ থেকে। বলে, অনেকক্ষণ আগে মুখে ধরে থাকা চুরুটটি ধরিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসলেন।

বললেন, লেখার একটা ধরন থেকে গেছে, কিন্তু ছবির বেলায় তা তো

হচ্ছে না। যে-প্রথায় তখন এঁকেছি, আজকে সে-প্রথা ধরে থাকা চলল না। সেখানে সঙ্গে এখানেই ছবি আঁকার মজা। আজ ভেবেছিলুম আগেকার স্টাইলে ছবি আঁকব। পারলুম না কেন? করলুম অবশ্য সবই আগের মতো, শেষে কালি ঢেলে দিলুম কেন তাতে? বোধ হয় মন খুশি হয় না আর আগের মতো কাজে।

বেশ ছিলুম; ছবি আঁকা তো ছেড়েই দিয়েছিলুম বহুকাল। পুতুল গড়তুম, যাত্রা লিখতুম, দিন কেটে যেত। তোমাদের জন্য আবার রঙ তুলি বের হল। এখন ভাবি, কোথায় গিয়েছিল আমার সেই ছবি-আঁকা মন। কেনই যে চলে গিয়েছিল তাও জানি নে। সেই কালটা যেন মনেই আসছে না। দাদার অসুখ হল, অলকের মাও অসুখে পড়লেন; নানা ঘটনায় মন থেকে কখন এক সময়ে ছবি-টবি সব চলে গেল। রঙ তুলি বিলিয়ে দিলুম। বরাবর দাদা আমি বারান্দার পুব দিকে পাশাপাশি বসে ছবি আঁকতুম, অসুখের পর দাদা ছবি আঁকা ছেড়ে দিলেন, আমিও ঠাঁই বদল করলুম, কোচটা বারান্দার মাঝখানে সরিয়ে আনলুম; এটাও একটা কারণ হতে পারে। আমার নিজেরও ডান হাতে বাত ধরেছিল, সবাই ভেবেছিল আমার হাত বুঝি গেল এবারে। সেই হাত এখন পর্যন্ত কেমন চলছে দেখো। বরং বাঁ হাতেই জোর কম আমার।

পরদিন মহাশ্বেতার ছবিতে একটু সাদা রঙের টাচ দিলেন, মুখ হাত একটু ফুটিয়ে দিলেন। ছবিটি শেষ হয়ে গেল। দেখো, কত কমেই হয়ে যায়, ব'লে ছবিতে নাম সই করে গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন—

গাও বীণা—বীণা, গাও রে।

ছোটো বলে অনাদর নেই, বরং তার জন্য অবনীন্দ্রনাথের বেশি যত্ন।

সবাই অবুদাদুর কাছে ছবি আঁকা শেখে। সেদিন সকালে আমি আসতে অবনীন্দ্রনাথ বললেন, অভিজিৎ এসেছিল একটু আগে। বললে, অবুদাদু, আমাকে একটা জিনিস আঁকা শিখিয়ে দেবে?

বললুম, কী জিনিস?

সে বললে, আগে বলো শিখিয়ে দেবে কি না?

আমি বললুম, তুই বলই-না, কী শিখতে চাস? দেব শিখিয়ে।

অভিজিৎ বললে, আমি মানুষ হাতি ঘোড়া গাছ পাখি সবই আঁকতে

পারি। কেবল একটা জিনিস পারি না, আকাশ। দেবে শিখিয়ে কী করে আঁকতে হয়?

আমি বললুম, তা বেশ তো। এই তো দেখ-না আকাশে কেমন মেঘ করেছে, আঁক-না? আঁক দেখিনি একটা ছবি, পরে আমি তাতে দেখিয়ে দেব।

সে বললে, কি করে আঁকব?

বললুম, আচ্ছা বেশ, বলে দিচ্ছি শোন। ধর, সকালের আকাশ আঁকবি, নীচে আলো দিবি, উপরে কালো। 'নীচে আলো উপরে কালো'। রাত্রের আকাশ—'নীচে কালো উপরে আলো'। উপরে আলো কেন? না, চাঁদ উঠেছে সেখানে। এই হল আসল কথা, বুঝলি? ধরতে পেরেছে কথা ঠিক, মুখ দেখেই বুঝলুম।

বললেন, আকাশ আঁকা সত্যি বড়ো শক্ত। অভিজিতের মনে ঠিক জায়গাতেই খটকা লেগেছে। তাই তো আমায় বললে, 'আমি হাতি ঘোড়া সব আঁকতে পারি, কেবল আকাশ আঁকতে পারি নে।'

এই আকাশ আঁকা সহজ কথা নয়। এখনো আকাশকে ধরতে পারি নে সব সময়ে। সকালের আকাশ, সন্ধের আকাশ, দুই তো একই রকম, কিন্তু তফাত বোঝাবে কী দিয়ে? একবার ট্রেনে যেতে যেতে এই কথা মনে হয়েছিল, তফাতটা কোথায়? বাড়ি এসেও দু-চারদিন ভাবলাম, শেষে বের করলাম উপায়।

আজকাল কাচের ঘরে জোর ছবি আঁকা চলছে। অবনীন্দ্রনাথ নিত্য নতুন ছবি আঁকছেন। দৈনন্দিন জীবনের চলা-ফেরাই কত সুন্দর হয়ে ধরা পড়ে তাঁর কাছে।

পুজোর ছুটি আরম্ভ হতেই আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি যাবার তাড়া লেগে গেছে। চার দিকে সকলেই ব্যস্ত জিনিসপত্র গোছাতে, দেখা-সাক্ষাৎ সারতে। মায়া, আমাদের বন্ধু-কন্যা, কচি কিশোরী মেয়ে, সে শ্রীভবন থেকে বিছানা-বাক্স নিয়ে ছুটিতে চলে আসছে আমাদের কাছে। অবনীন্দ্রনাথ বেড়িয়ে ফিরছিলেন, পথে দেখতে পেলেন তাকে।

এসে বললেন, দেখলুম মায়া সাঁওতাল মেয়ের মাথায় টিনের বাক্স চাপিয়ে নিজেও বইখাতাপত্রের বোঝা কোলে-কাঁধে নিয়ে আসছে। সামলাতে পারছে না, কোনোরকমে ধরে নিয়ে চলেছে, টুপ-টাপ পড়েও যাচ্ছে দু-চারটে

তার থেকে, আবার কুড়িয়ে নিচ্ছে। ছুটি হয়েছে, বাড়ি আসবে, দেরি আর সইছে না। বড়ো ভালো লাগল দৃশ্যটি। আঁকব একটি ছবি।

একটু লম্বালম্বি ধরনের কাগজে সেই ছবিটি আঁকলেন অবনীন্দ্রনাথ। পাশে একটি লতার মতো গাছ বেয়ে উঠেছে বাড়ির উপরে। দরজা দিয়ে ঢুকছে মেয়েটি ভিতরে।

ছবিখানা আঁকা শেষ হয়ে এল। বিকেলে এসে দেখি, ছবি কোলে নিয়ে বসে আছেন। বললেন, নাও, এবারে এর উপর দিকটা এতখানি কেটে ফেলো দেখিনি।

গাছ দেয়াল সব এমন সুন্দর মানিয়েছে ছবিতে যে, এর থেকে খানিকটা কেটে বাদ দেবার কথায় অবাক হয়ে গেলাম। তবু কাটলাম ছবির মাথা খানিকটা— যতটা চেয়েছেন।

বললেন, আচ্ছা এবারে এসো, ছবিখানি তোমায় বুঝিয়ে দিই। এসে বোসো এইখানে।

কেন উপরের অংশ বাদ দিলুম? শোনো সে কথা। ছবিতে যা কিছু আঁকবে, গাছ দেওয়াল আকাশ এমন-কি, একটি ঘাস সেটিও কিছু বলবে, ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করবে। কেউ সাহায্য করে কাছে থেকে, কেউ করে দূরে থেকে। দূরের মাঠ, দূরের আকাশ, তারা বহুদূর থেকে ছবিকে সাহায্য করছে। আবার পায়ের তলায় ঘাসটি, পাশের গাছটি— তারাও সাহায্য করছে।

থিয়েটারে দেখো-না, আসল ক্যারেকটার থাকে দু-একজন, আর-সব থাকে সেই ক্যারেকটারকে ফোটাবার জন্য। ক্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানেরও সেখানেই দরকার। স্টেজ সাজানো হল, বাতি জ্বালল, সিন আঁকল, অ্যাকটরদের সাজিয়ে দিল; এত সব আয়োজনের মধ্যে আর্টিস্ট যে, সে এসে অ্যাক্‌ট্‌ করে গেল।

ছবিতেও তাই। ঠিক যে জায়গায় স্পট্‌লাইটটুকু এসে পড়ে ঠিক সেইটুকু নিয়েই থাকো। তার পর পিছনে, অন্ধকারে কী আছে, সে-সব থাক-না সেখানেই। তারা সেখান থেকেই সাহায্য করবে যে। স্টেজের ভিতর থেকে গানের সুর ভেসে আসে, অন্ধকারেই সে বসে থাকে। সেইখানে যাবে কল্পনা। চোখের সামনে এনে ধরবার জিনিস তা নয়।

এই যে ছবিতে উপরের গাছ বাড়ি কেটে ফেললুম, আসলে তা বাদ

যায় নি। আছে সবই। কল্পনায় তুমি যাবে সেখানে। নয়তো আমি যা চাচ্ছি— মেয়েটি তাড়াহুড়ো করে ছুটিতে বাড়ি এসেছে, ঠিক সেই ভাবটি তত ফুটত না। দৃষ্টি অন্যদিকে আকর্ষণ করত। তার পর দেখো মেয়েটির কাঁধের থলির মুখ খোলা আঁকলুম, বন্ধ করলুম না কেন? ওইখানেও কল্পনা চলবে। এত তাড়া ছিল তার বাড়ি চলে আসতে, ভালো করে থলির মুখও বন্ধ করবার দেরি সয় নি! ছবির দরজা গাছ সিঁড়ি, যেখানে যেটুকু দিয়েছি ওই কথাটুকুই ফোটাবার জন্য।

ছবি আঁকবে, সঙ্গে সঙ্গে গল্প তৈরি হবে। ওইটুকু মনে রাখবে, যেটুকু দেবে ছবিতে, শুধু ওই ক্যারেকটারকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য।

গাছের এই দিকটা আমি ঝাপসা করে দিলুম, কেন? না, ও দিকে আমার মন নেই। মেয়েটিরও নেই। সে ছুটে এসেছে বাড়িতে, দরজায় ঢুকে থমকে দাঁড়িয়েছে; তাকে দেখছে— এ-এই, আমার নামের সই। এখানে দাঁড়িয়ে আমি দেখছি তাকে। আর-সব অস্পষ্ট। ছবির সিক্রেট হচ্ছে এইখানেই।

ফোটাবে একটি-দুটি জিনিস। আর যারা থাকবে তারা সাহায্য করবে। তারা সাহায্যকারী। অনেক সময়ে তারা অন্ধকারে অদৃশ্যে থেকেও সাহায্য করে। পড় নি ন্যায়শাস্ত্র? পড়ে দেখো। তাতে পাবে অনেক আর্টের কথা। তোমরা পড়বে না শুনবে না কিছুই। আরে, ছবির সঙ্গে আগে ভাব করতে হবে তবে তো, তবে তো সে তোমায় ধরা দেবে। ছবি হচ্ছে ভাবের জিনিস।

ভাবোন্মাদ হয়ে তবে ছবি আঁকবে। তখন আর টেকনিক স্টাইলের দরকার হবে না। তখন যে ছবি আঁকবে, সেই রঙের টাচ যেখানে গিয়ে লাগবে, সে আলাদা জিনিস।

ভ্যান গগের ছবি দেখে এখনকার আর্টিস্টরা ভাবে ওই বুঝি একটা স্টাইল। ও স্টাইল নয়। খুপো খুপো করে রঙ দেওয়া, সে তো অতি সহজ। ও হচ্ছে ভাবোন্মাদনার কথা, ভাবোন্মাদনা না থাকলে অমন রঙ বের হয় না। এই কথাটাই বুঝল না এরা।

না, দেখছি আবার আমায় তোমাদের একপালা লেকচার দিতে হবে। বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলীতে যা বলেছি তা পুরোনো জিনিস। নতুন করে বলতে হবে এবারে। পঁচাত্তর বছর বয়স হল প্রায়, এতখানি বয়সের অভিজ্ঞতা

তো আছে একটা? সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে যা বুঝেছি, পেয়েছি, তাই বলে যাব তোমাদের।

ছবির ভিতরের কথা— সে বলে কিছু। আয়না ঘরের দেয়ালে টাঙানো আছে, তাতে অনেক লোকের ছবি ধরে; কিন্তু তা ছবি নয়। আয়না ছবি ধরে কিন্তু বলে না কিছু। ছবি বলে। এইখানেই ছবিতে আয়নাতে তফাত।

'আয়নার মতো সরোবর', সে কিছু বলে। 'আয়নার মতো আকাশ', সেও অনেক কথা কয়। শুধু আয়না, সে কেবল ছবি ধরে মাত্র। ছবি নয়।

মায়ার ছবিখানার নাম হল 'ছুটি'। ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে মায়া, কচি কোমলতায় ভরা তার মুখখানি; ছোটো ছবি, ছোট্টতর মুখ এঁকেছেন ছবিতে, সেই ছোট্ট মুখখানায় মায়ার পোরট্রেট হুবহু ফুটে উঠেছে। মায়াকে দেখেছেন আর কতটুকু? আজই বেড়িয়ে ফিরবার পথে দেখলেন মায়া আসছে, ভালো লাগল, ছবি আঁকলেন। মায়া কাছে এসে বসে নি, তার স্কেচ করেন নি, অথচ ছবিখানা যে-ই দেখে, বলে ওঠে, 'এ যে মায়া'।

আশ্চর্য!

অবনীন্দ্রনাথ হাসেন। বলেন, আমি তো তোমাদের মতো করে দেখি নে। একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম, মনের মানুষ হয়ে গেল। তোমরাও ওই চালাকিটুকু ধরো।

কী করে চোখ বুলিয়ে নেন, কী চোখে দেখেন, সেইটাই তো ধরতে পারি না। সাবি মেঝেন, সাঁওতাল মেয়ে, বাড়িঘরের কাজ করতে করতে দোরের পাশ দিয়ে চলে গেল, অবনীন্দ্রনাথ তার পোরট্রেট এঁকে ফেললেন জল রঙে। মাথার খোঁপায় দিলেন লাল জবা। পাঁচ পাপড়ি মেলে ফোটা ফুলটা মুড়ে অর্ধেকটা অবধি গুঁজে দিয়েছে যেন সাবি খোঁপার ভিতরে।

এইটেই বিস্ময়ের ব্যাপার।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, ওরা কি আর তোমাদের মতো ধীরে সুস্থে গুছিয়ে ফুল পরে? কাজ করতে করতে ফুলটা তুলে খোঁপাতে গুঁজে নিলেই হল।

সাবিকে ধরে এনে মিলিয়ে দেখি, ঠিক তাই। পাপড়ির ভাঁজ যেমন এঁকেছেন ছবিতে, ঠিক তেমনিই। সাঁওতাল মেয়ের খোঁপার চুলের প্যাঁচটুকু পর্যন্ত ঠিক।

কাছে বসে আছি, সাবি গেল সামনে দিয়ে। অবনীন্দ্রনাথ কাগজ চাইলেন, ছবি আঁকলেন, সব আমার সামনেই ঘটল। তাই তো ভাবি, একটি পলকে সব তিনি দেখে নিলেন। কি করে দেখলেন?

পরদিনও অবনীন্দ্রনাথ আর-একটি মেয়ের মুখ আঁকলেন, খোঁপায় দিলেন করবী। ফুলটি আমিই এনে রেখেছিলাম তাঁর ছবি আঁকার জলের গামলায়। তিনি বললেন, এমনি রোজ একটি করে ফুল এনো তো। 'ফুলদানি'র ছবি এঁকে ফেলি একসেট।

পর পর বেশ কয়েকদিন চলল এইরকম একটি করে ছবি আঁকা। আমি এনে রাখি জলের গামলায় রোজ গুলঞ্চ দোলনচাঁপা অশোক নাগকেশর—এক-একদিন এক-এক রকম ফুল। অবনীন্দ্রনাথ নানা ভঙ্গির মুখ আঁকেন মেয়ের, খোঁপায় দেন সেদিনের আনা সেই ফুলটি তুলে। এমনি করে হয়ে গেল একসেট 'ফুলদানি'র ছবি, দেখতে দেখতে। মেয়ের মাথার খোঁপাটিই হল 'ফুলদানি'।

দেখেছি, অবনীন্দ্রনাথ চোখ দিয়ে দেখতেন, আবার কান দিয়েও দেখতেন।

একবার কলকাতা থেকে আসছি আশ্রমে তাঁকে নিয়ে, পথে ট্রেনে আমি বসে আছি বার্থের এ মাথায় স্টেশনের দিকের জানালার কাছে, অবনীন্দ্রনাথ বসেছেন ও ধারের জানালার পাশটিতে, যেদিকে সবুজ মাঠ খোলা ধানখেত, দূরে দিগন্ত।

গুসকরা স্টেশন, সামনের একটা কামরা হতে প্ল্যাটফরমে নামল একজোড়া অল্পবয়সী স্বামী-স্ত্রী। এখনো 'লাজে-রাঙা' ভাব মেয়েটির। দেখছি চেয়ে; কাছাকাছি গ্রামেই হয়তো বাড়ি, চলেছে বাপের ঘরে তাই মাথার ঘোমটা পড়েছে খসে। স্টেশনে নেমে মেয়েটি স্বামীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এটা-ওটা কী কথা বলছে, হয়তো-বা কুলিকে ডাকতে বলছে, কী আর-কিছু অকারণ কথাই; বলছে আর খিলখিল করে হেসে উঠছে। কী মধুর ঝংকার সে হাসির! যেন গোছা গোছা রেশমি চুড়ি-পরা দুখানি হাতে জলতরঙ্গ বাজিয়ে চলেছে।

কতটুকুই-বা সময়। ট্রেন ছাড়ল। অবনীন্দ্রনাথ জানালার বাইরে দিগন্ত-জোড়া সবুজ ধানখেতের দিকে তাকিয়েছিলেন, সেদিকে তাকিয়েই বললেন, ওই হাসিটুকু ধরতে পার ছবিতে, তবে তো বুঝি। মুখে তাঁর স্নেহকৌতুক মেশানো চাপা হাসি।

অবাক হয়ে গেলাম। তিনি দেখলেন কখন? যেখানে বসে আছেন

সেখান থেকে দেখতে পাবার কথা নয়। আমি যদিও দেখেছি মেয়েটিকে, আমার নজর ছিল অবনীন্দ্রনাথের প্রতি। দেখেছি তিনি অপর দিকে বাইরে দৃষ্টি মেলে বসে ছিলেন। তবে? মেয়েটির সুখ-আবেগ-ভরা উছলে-ওঠা হাসির রেশটুকু শুধু শুনেছেন তিনি কানে, চোখে ফুটে উঠেছে ছবি।

তাই বোঝালেন, এই ছবিখানি আঁকতে হলে ওই হাসিটি ধরতে হবে আগে, তবে হবে এ ছবি— ছবি।

দেখেছি কতবার, ছবি আঁকার সময়ে আঁকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছবিও যেন নড়ে বেড়াত।

একদিন, অবনীন্দ্রনাথ যেমন রোজ বেড়াতে বের হন, তেমনি সকাল বিকেল বেড়াতে যান। উত্তরায়ণের গেটের কাছে আছে এক বনজুঁইয়ের গাছ। বয়স হয়েছে গাছটার, কাঁটায় ভরা ঝিরঝিরে ডালপাতা নিয়ে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে আছে সে। গরমের সময়ে অদেখা খুদে খুদে ফুলের সৌরভে মাতিয়ে রাখে স্থানটা। এখন শীতকাল, পাতা ঝরে গেছে সব। দেখে মনে হয় যেন কাঁটারই গাছ শুধু।

পর পর কয়েকদিন বিকেলবেলা একটা সময়ে অবনীন্দ্রনাথ এসে থামেন সেই বনজুঁইয়ের কাছে, গাছের ভিতর দিয়ে পশ্চিম আকাশের লালরঙের অস্তরবি দেখা যায় ঠিক সেই সময়ে, তিনি তাকিয়ে থাকেন সেইদিকে চেয়ে।

একদিন বললেন, যাও তো, ওই গাছটা স্কেচ করে নিয়ে এসো। যা পারো তাই করবে। ওখানে বসে বসে করতে সময় লাগবে, তুমিই করে আনো।

একখানা ছবি আঁকার কাগজে বনজুঁইয়ের স্কেচ করে আনা হল। অবনীন্দ্রনাথ সেই স্কেচখানার উপরেই নিজের মতো করে এঁকে রঙ দিতে লাগলেন। ডালে রঙ দিলেন, মাটিতে রঙ দিলেন, গাছের পিছনে আকাশে রঙ দিলেন, আকাশে সূর্য ফোটালেন; পরে ফ্ল্যাট-ব্রাশ দিয়ে ওয়াশ দিলেন। ওয়াশের পর আবার ছবিতে কাজ করতে লাগলেন, রঙ দিতে লাগলেন, ওয়াশ দিলেন; ওয়াশের পর শুকনো তুলি দিয়ে গোল করে রঙ জল মুছে নিয়ে সূর্য ফোটালেন।

দেখছি চেয়ে চেয়ে। অবনীন্দ্রনাথ বারে বারে ছবিতে কাজ করছেন, ওয়াশ দিচ্ছেন, আর ওয়াশে ঢেকে যাওয়া সূর্য শুকনো তুলি বুলিয়ে ফুটিয়ে তুলছেন।

সূর্য গাছের মাঝখানে। যতবার তিনি ওয়াশের পর সূর্য ফোটাচ্ছেন, সূর্য তার স্থান হতে যেন কিছুটা করে নেমে আসছে নীচের দিকে।

প্রতি ওয়াশেই ছবি ফিনিশের দিকে এগিয়ে চলল। শেষ ওয়াশ দিয়ে যখন সূর্য ফোটালেন মাঝখানে ডালের ফাঁকে আটকে থাকা সূর্য তখন গাছের গোড়ায় এসে ঠেকল।

অবনীন্দ্রনাথ ছবিতে নাম সই করে তুলির রঙটা মুছে নিতে নিতে বললেন, এতক্ষণে সূর্য ডুবল।

অবনীন্দ্রনাথকে দেখতাম ছবি আঁকছেন, আঁকতে আঁকতে কাগজের এ পাশে ও পাশে খানিক ভাঁজ ফেলে দিলেন; বললেন, এতটা কেটে আনো গে, চলছে না।

সেদিন সুহাস একখানা ছবি এঁকে আনল, 'বিম্ববতী'র ছবি। সুন্দরী সৎ-কন্যার উপর রানীর ঈর্ষা। রানী সযত্নে সেজে আয়নায় নিজেকে দেখছে, জাদু আয়নাকে জিজ্ঞেস করছে, বলো আয়না, 'ধরাতলে সব-চেয়ে কে আজি সুন্দরী'।

খুব খেটেছে ছবিখানায় সুহাস। টেম্পারা ছবি। সূক্ষ্ম কারুকাজ করেছে ঘাগরার বর্ডারে, ওড়নার আঁচলে, পায়ে নূপুরে নানা অলংকারে।

অবনীন্দ্রনাথ দেখলেন। দেখে পেনসিল দিয়ে ছবির এ পাশে লম্বা দাগ দিলেন, বললেন, কেটে ফেলো। কাঁচি দিয়ে কেটে ফেললাম। ও পাশে লম্বা দাগ দিলেন, বললেন, কাটো। কাটলাম। উপরে দাগ দিলেন, নীচে দাগ দিলেন; উপর-নীচ কাটলাম।

অবনীন্দ্রনাথের ছবি-কাটা আমি দেখেছি, দেখা আমার অভ্যাস আছে কিছুটা। সুহাস বেচারা দেখে নি কখনো, সে তো হতভম্ব হয়ে বসে রইল এক পাশে। ওর অবস্থাটা খুব বুঝতে পারছি। তার এত যত্নের ছবি; জানালার পাশে ফুলে-ভরা শাখা কাটা পড়ল। ফরাশের পাশে তাকিয়া প্রদীপ কাটা পড়ল। অলংকারের বাক্স, প্রসাধনের থালা সব কাটা পড়ল একে একে। সর্বশেষ নূপুরসমেত পা দুখানিও আলগা হয়ে গেল ছবি থেকে।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, নাও, এবারে হল ছবিখানা। আয়না আর রানীর মুখ, এই হল ছবির সাবজেক্ট। এ দিকে ও দিকে চোখ গেলে ছবিতে যা

বলতে চাইছ তা ব্যাহত হয়।

সুহাস বুঝল, খুশি মনেই ছবি নিয়ে চলে গেল।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, জানো, সবেতেই তাই। সংগীতেও সংবাদী বিবাদী অনুবাদী— এই তিন সুর। ছবিতেও আছে।

সেদিন শান্তিকে সেই কথাই বললুম, ও এসে দাঁড়িয়েছিল কাছে। বললুম, সুরের খেলা করিস, জানিস তো সংবাদী বিবাদী অনুবাদী কাকে বলে? ছবির বেলাতেও আমরা এই কাজ করি। ছবিতেও নানা আইন আছে। বিবাদী মানে— বেসুরো। বেসুরোকে সুর করবার আইন আছে। তাও করে এসেছি আমি।

ওকাকুরার কাছে দেখেছিলাম 'বিছে কম্পোজিশন'। বিছেকে যেমন যেদিকে কেটে দাও সে সেইটুকু নিয়েই চলতে আরম্ভ করে, অনেক ছবিতেও আছে তেমনি।

দেখলে-না সেদিন, সীতা একখানা ছবি এঁকে আনল, সেটি কেটে আমি তা থেকে সাতখানি ছবি বের করলুম কাঁচি চালিয়ে। ছবি বহুমুখী হয় না। ছবি হবে একমুখী ; একখানি একমুখী রুদ্রাক্ষ।

হাটের মুখে চলেছে ছবি, যদি বাটের দিকেও মন টানে তবে ব্যাঘাত ঘটে ছবির।

আর সবেতেই সংগীত। ছবিতেও। গোরুর গাড়ি চলেছে, তার শব্দ শোনানো চাই। ছবি হচ্ছে সাইলেণ্ট মিউজিক। সংগীতে সুর যা কাজ করে, আমাদের ছবিতেও তাই।

সুর আছে ; সকালের সুর লাগল আকাশে বাতাসে গাছের পাতায়, দুপুরের সুর প্রখর মধ্যাহ্ন, আবার সন্ধের শান্ত সুর আছে। সব ধরা চাই। চোখে দেখার রাস্তা খুলে যাক সবার, মনে আনন্দ পাক। যাবার আগে এইটে যেন দেখে যেতে পারি।

চোখ খুলে রাখো, দেখতে শেখো। নেচারের মতো বড়ো মাস্টার আর নেই। কী শেখাব আমরা? কী রঙ দেখাব তোমায়? চেয়ে দেখো, দুচোখ মেলে নেচার কত রঙ কত ঐশ্বর্য নিয়ে তার ভাণ্ডার এনে ধরেছে সামনে। কত রস। কোথায় যেতে চাও রসের সন্ধানে? ঘরের দোরে তোমার যে রসের ছড়াছড়ি। তা ফেলে যেতে চাইছ কোন্ অজানায়? দেখো, দেখো,

দেখতে শেখো। তোমাদের চোখ খুলছে না কেন? বড়ো কষ্ট হয়। ভগবান যে দুটি চোখ দিয়ে দিলেন, সে দুটির মূল্য বুঝলে না।

ও রানী, এই চোখ দেখেই একদিন ভুলেছিলাম আমি। ছাদনাতলায় কনের মাথার কাপড়টি সরে গেল, শুভদৃষ্টি হল। চোখ আমার, চোখ দেখেই ভুলল।

আমার বড়দা নিজের নতুন আঁকা ছবি একখানা নিয়ে এলেন অবনীন্দ্রনাথকে দেখাতে। ছবির সাবজেক্ট— তীর্থযাত্রী। স্ত্রীপুত্র ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে চলেছে পুরুষ তীর্থের পথে। বনপথ, রাত্রিবেলা ; পুরুষটির হাতে লণ্ঠন, সেই লণ্ঠনের আলোয় পথ চলেছে সবাই।

অবনীন্দ্রনাথ তুলিভরা কালো রঙ তুলে বন, পথ, আকাশ সব ঢেকে দিলেন।

বড়দা তখন কলকাতার আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে বসবাস করছেন। তাঁর প্রৌঢ় বয়সের ফিনিশ করা ছবি, তার উপরে অবনীন্দ্রনাথ কালি ঢালছেন, আর বড়দা নিঃসাড়ে পাশে বসে দেখছেন। যেন পাঠশালার বালক ধমক খেয়ে থতমত হয়ে আছে।

অবনীন্দ্রনাথ কালো রঙ দিয়ে সবকিছু ঢাকছেন আর বলছেন, লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিলেই বুঝি হল? আলো বোঝাবে কী দিয়ে? কালো করো আগে চার দিক। যেখানে আলো সেখানেই অন্ধকার। অন্ধকার নইলে আলো ফুটবে কী করে?

অবনীন্দ্রনাথ ছবিখানা ঠিক করে দিয়ে বড়দার হাতে ফিরিয়ে দিলেন, বললেন আলো ফুটল এবারে, আর-একবার ফিনিশ করো গে ভালো করে।

বড়দা খুশি প্রাণে হাসতে হাসতে প্রণাম করে চলে গেলেন।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, রঙ দিতে ভয় পায় কেন? কত রঙে তবে একটি রঙ তৈরি হয়। রঙ দেবে ছবিতে। খেলা করতে শেখো। কাগজের উপরে রঙ দিয়ে খেলা করবে, তবে না ছবি হবে। রঙ দিয়ে ফুটিয়ে তুলবে শাড়িটিকে, গাছটিকে ঠেলে সরিয়ে দেবে দূরে— তাও রঙ দিয়ে। একটির গায়ে আর-একটিকে ফুটিয়ে তুলবে রঙের পোঁছ লাগিয়ে। এই তো ব্যাপার। এতে ভয়ের আছে কি?

শুধুই রঙের খেলা। এর ভিতরের কথা জানলে আর 'মিষ্ট্রি' ঠেকবে না কিছুই। কী রঙের পর কী রঙ মানায়, জেল্লা খোলে, এ জানতে হবে। কেন বললুম, তোমার বুড়োর ছবিটায় যে, 'পিছনে নীল রঙ দাও'; নীল রঙ

পিছিয়ে দেয়, লাল সামনে আনে। গ্রীনের পাশে ব্রাউন দাও, গ্রীনের জেল্লা খোলে। আছে, এ-সবই নেচারে আছে। দেখো-না, সবুজ পাতার চার দিকে আশে পাশে ডালে কত ব্রাউন রঙ। বইও আছে এ সম্বন্ধে। তবে, বই পড়ে সব হয় না। এ-সব জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই দেখবে এসে যাবে সব। তবে বলি কেন, 'খেলতে শেখো'।

আর কিছু নয়, শখ। ছবিও যে এঁকেছি, আঁকছি তাও ওই শখেই। এঁকেছি, খেলা করেছি। রঙ তুলি কাগজ নিয়ে খেলেছি।

আমি যে তোমাদের ছবিতে হাত দিই, সে ওই, তোমাদের নির্ভয় করবার জন্য। দেখাবার জন্যে যে কত সহজে ছবি হয়ে যায়। এর জন্য আবার ভাবনা।

অনেকে বলে আমি অন্যদের ছবিতে হাত লাগাই কেন? দেখি যদি একটা ভালো ইমারত গড়ে উঠছে, অল্প একটুর জন্য ঠেকে আছে, আমি তাতে হাত দেব না? অল্পের জন্য একখানা ভালো ছবি হবে বুঝতে পেরেও সেখানে চুপ করে থাকব? হলই-বা অন্যের ছবি। আমি তাকে দেখি না, আমি দেখি ছবিকে।

আমি যখন কারো ছবিতে হাত লাগাই তখন তাকে শেখাই। আমার শেখাবার পদ্ধতিই ওই। না দেখলে সে বুঝবে কী করে! আঁকো বললেই তো কেউ আঁকতে পারে না। সে হত আমাদের ছেলেবেলায়, মাস্টার বলতেন, 'পড়্ দেখি পড়্', 'লেখ্ দেখি লেখ্'। আরে বাবা, পড়বে কী, শিখিয়ে দাও। তা নয়, ক্লাসে এসেই বলবেন, 'পড়্ দেখি পড়্'।

বললেই যদি সব হয়ে যায় তা হলে আর কথা ছিল কি? নাচ শেখ, নাচের মাস্টার তালবোলগুলি একটা কাগজে লিখে দিলেই তো নাচ শেখা হত। কিন্তু মাস্টারকে নেচে দুলে তবে শেখাতে হয়।

গাছ তো মাটিতে পুঁতলেই হয়ে যেত। কিন্তু তা হলে গাছ বাঁচে না। তাকে ঠিকমত জল দিয়ে যত্ন করে তবে বাঁচাতে হয়। তবে সে একদিন নিজের উপর নির্ভর করতে পারে। মালীর দরকার হয় গাছ বাঁচাতে।

নেচারেরও মালী আছে। একটি ঘাস, তাকে বাঁচাতে সেই-মালী জল ঢালেন উপর হতে। তবে সে বাঁচে। ওই একটি ঘাস, কী তার ডিমাণ্ড। আকাশ থেকে তার জল আসে। দেবতারা কেউ দেয় জল, কেউ খাবার,

কেউ ছায়া, কেউ হাওয়া, তবে সে মাথা উঁচিয়ে বেঁচে থাকবে। রাবণের মতো। রাবণকে আমার ওইজন্ত ভালো লাগে। তার চাই; এই চাওয়াটা একটা মস্ত জিনিস। রামায়ণ পড়ে রাবণই আমার মন টেনেছিল বেশি। সবাই তাকে কেমন অন্তভাবে দেখে। কিন্তু আমি পছন্দ করি বেশি রাবণকেই। ভারি শক্ত ওর ছবি আঁকা। কেউ পারে নি।

বললেন, যাক ও-সব এখন। তোমার ছবির কী হল। আনো তো দেখি।

বললাম, আপনি ক্লান্ত আছেন আজ।

বললেন, না, তা হোক। আজ হাত চালিয়েছি, দেখে নিই সব একসঙ্গে।

ছবিখানা আনলাম। তিনিই দেখিয়ে দিয়েছিলেন একদিন, বলেছিলেন, কি আঁকবে ভেবে মরো! এই দেখো কত ছবি চার দিকে। আঁকো দেখি, এই বাতাবিলেবু গাছটিই? পিছনে বাড়ির লাল সিঁড়ি, ও দিক থেকে তাল-গাছের মাথা উঁকি দিচ্ছে, যেন গাছটির খোঁজ নিচ্ছে, 'কেমন আছিস ভাই'? যেন বাড়ির মেয়েটি আঙিনায় এসে নাচছে আকাশের দিকে হাত তুলে।

ছবিখানা হাতে নিয়ে বললেন, বেশ হয়েছে। তবে সিঁড়িতে আলো লাল দিতে হবে। বলে, বেশ করে টকটকে ভারমিলিয়ান তুলিতে নিয়ে লাগালেন সিঁড়িতে। মাটিতেও দিলেন কয়েকটা টাচ গাছের গোড়ায়ও। ছবিখানা ঝলমল করে উঠল। বললেন, এই হল। এখন এইখানে তোমার নাম লেখো।

বললাম, তা কী করে হয়?

বললেন, নাম তো একটা লিখতে হবে ছবিতে। আমার নামও লিখতে পারি নে। আচ্ছা, একটা নাম বের করা যাক। 'বোম্বেটে' ছেলেবেলায় পাওয়া খেতাব আমার, এইটেই চালু করে দেওয়া যাক। যে ছবি খানিক তোমার খানিক আমার সেই ছবিতে এই নাম সই করা থাকবে; কেমন?

তিনি হাসেন। বেশ একটা মজার ব্যাপার হবে যেন। আমিও বলি, তাই বেশ হবে।

অবনীন্দ্রনাথ কালো রঙ নিয়ে ছবির কোনায় 'বোম্বেটে' সই করলেন। বললেন, এই নামের এই হল আমাদের প্রথম ছবি।

সকাল হতে খানিক রোদ্দুর খানিক মেঘলা, আকাশে আঙিনায় থেকে থেকে আলো-ছায়ার খেলা চলছিল! অবনীন্দ্রনাথ বললেন, দাও, আমাকেও

একটি কাগজ দাও ; ছবি আঁকি।

তিনি আঁকলেন, একটি নারকেল গাছ মেঘের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে, মেঘের ফাঁক হতে রোদ্‌দুর পড়ে পাতাগুলি ঝলমল করছে।

আঁকলেন, বসে বসে দেখলাম।

শান্তিনিকেতনে যখন আসতেন, থাকতেন ; ছোটো ছেলেমেয়েদের উৎসাহের অন্ত থাকত না অবুদাদুর কুটুম-কাটাম নিয়ে।

তিনি কত ধৈর্যের সঙ্গে তাদের দেখাতেন, 'এই দেখ, এটি ইঁদুরে গাড়ি টানছে। বাঁশের গুঁড়ি থেকে বানিয়েছি। আর এটি ; এটি হল সাহেব-খেলোয়াড়, পা দিয়ে ফুটবল খেলছে ; আচ্ছা আমি দেখাই' বলে তার মাথার উপরে বাঁধা সুতোটা ধরে নাড়া দিলেন। বললেন, কেমন ঘুরে ঘুরে বল্ ছোঁড়ে দেখ। পায়ের কাছে একটা সুপারি দিলে কেমন হয় ?

সাহেবের বল্ খেলা দেখে হেসে কুটিকুটি সবাই।

তিন দিকে ছড়ানো একখণ্ড শুকনো ডাল, দু দিকের দুটো হল পা, অন্যটা ধড়। সেই ধড়ের উপরে আলগা একটা টুকরো কাঠ, সেটা হল মাথা। সাহেব-মানুষ, মাথায় টুপি থাকা চাই— মাথার উপরে আর-একটা ছোট্ট কাঠের টুকরো বসিয়ে দিয়েছেন, টুপি হয়ে গেছে। সাহেব-মানুষ, সে পাইপ খেতে খেতে বল্ ছুঁড়ছে।

ছেলের দলের ফুর্তি দেখে কে এই সাহেবকে নিয়ে!

পাশে রাখা মাটির বাটি একটি তুলে নেন হাতে অবুদাদু, বলেন, দাঁড়া, হাত দিস নে তোরা, এতে অনেক-কিছু আছে।

একটুকরো সরু কাঠ তুলে বলেন, এই দেখ একটি পা, কারো সঙ্গে জুড়ে দেবার অপেক্ষা শুধু। একটা মেমসাহেব-খেলোয়াড় বানালে হয়, তা হলে সাহেব খেলোয়াড়ের জুড়ি হবে। দুটিকে একসঙ্গে বেঁধে নাচানো যাবে।

হাতে হাতে সেই পা-টা ঘোরে। বলেন, রেখে দে, রেখে দে, এটিতে মেমসাহেবের পা বেড়ে হবে। এই দেখ, একটি ছোট্ট পাখি, একটু রঙ দিয়ে দিলেই হয়। এইটি ভুঁশুড়ি ভূতের কান। এইটি দেখছিস ? বল তো কি ? এটি মুক্তো-দন্তী-রাজকন্যার মুখ। মুক্তো দিয়ে একটি নথ করে দেব গালের পাশে, এখন থাক— বলে একটা তালের আঁঠি সযত্নে একধারে রেখে দিলেন।

এমনিতরো হরেকরকম কাঠ পাথরে মাটির-বাটি ভরা। ধীরে ধীরে তারা রূপ ধরবে যার যার সময়মত।

এখানে ছোটো বড়ো, সকলেরই যেন একটা দিকের দৃষ্টি খুলে গেছে। সবাই এখানে ওখানে পড়ে থাকা তুচ্ছ জিনিসে একটা কী খুঁজে পায়, দেখতে পায়। যত্নে তুলে এনে ঘরে রাখে।

ছোটোরা চলতে ফিরতে পাথর কাঠ যে যা জিনিস পাচ্ছে ছুটে ছুটে নিয়ে আসছে, অবুদাদু এটা কী হবে? ওটা কী হবে?

অবুদাদু বলতেন, এটা তো দিব্যি একটা খেঁকশেয়াল রে। এটা ভাল্লুকছানা, দেখ গুটি গুটি কেমন গাছে উঠছে। আর, এত শালিকপাখি, পেটে আপনা হতেই একটা ফুটো হয়ে আছে। নিয়ে যা, এই ফুটোর মধ্যে একটা পেরেক ঢুকিয়ে দেয়ালে বসিয়ে রাখ গে।

কাচের ঘরে স্তূপীকৃত জমে ওঠে তাদের আনা কাঠকুটো। সকালে বিকেলে হাঁটতে বেরিয়ে তিনি নিজেও কুড়িয়ে আনেন কত। একদিন এক-খণ্ড পোড়া কাঠ কুড়িয়ে আনলেন, বললেন, দেখ, কী সুন্দর কবুতর একটি।

সেই কবুতর তিনি কোলে নিয়ে বসে রইলেন ক'দিন। ছবি আঁকেন, কবুতর কোলে থাকে। বিকেলে বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকেন, চুরুট খান, লোকজন আসে কথাবার্তা বলেন; কবুতর কোলে ঘুমোয়। মাঝে মাঝে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। কয়েকদিন পরে কবুতরটিকে কাচের ঘরের দরজার মাথায় লিনটেল-এর উপরে বসিয়ে রাখলেন, 'থাকুক এখানে, এই-ই এর ঠিক জায়গা।'

মনে হত সত্যিই যেন একটি কালো পায়রা বুক ফুলিয়ে বসে আছে দরজার উপরে।

পোড়া-কাঠ এমনি প্রাণ পেত তাঁর হাতে।

কাঠমিস্ত্রিরা কাজ করে গেছে, তাদের ফেলে-দেওয়া কাঠখণ্ড পড়ে থাকে বাগানের ধারে, উই ধরে সর্বাঙ্গ জুড়ে। সেই কাদামাটি-মাখা উই-খাওয়া তিন-কোনা কাঠখানা তুলে আনলেন একদিন। পরিষ্কার করা হলে সেটি রেখে দিলেন আলমারির উপরে। কথা বলেন গল্প করেন আর তিনি কাঠখণ্ডের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। দুদিন পরে দেখি একটি কুটোর নৌকো বসিয়ে দিলেন কাঠটার উপরে। বললেন, দেখেছ? এ হচ্ছে 'নোয়ার

নৌকো'। অ্যারোরুট পর্বতে এসে ঠেকেছে। এই নৌকো ঠেকবে বলেই পর্বতটা জেগেছিল, আর-সব জলের তলে।

সেই কাঠখণ্ড হয়ে গেল অ্যারোরুট পর্বত, যেখানে 'নোয়ার নৌকো' এসে ঠেকল মহাপ্রলয়ের পর। আবার প্রাণের সঞ্চার হল মাটিতে। নৌকো ভরে নোয়া মানুষ প্রাণী যা এনেছিল ছেড়ে দিল সব এই দ্বীপে।

অবনীন্দ্রনাথ চেয়ে থাকেন দ্বীপের দিকে।

একদিন একটা কালো মোটা ভোমরা ভোঁ ভোঁ করে ঘরে ঢুকছে, আবার জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। একবার আসছে, আবার যাচ্ছে। অ্যারোরুট পর্বতে উইয়ে-খাওয়া দু-চারটে গর্ত ছিল, দেখা গেল তারই একটা গর্তে বাসা তৈরি করছে ভোমরাটা। মুখে করে মাটি এনে এনে বেশ খানিকটা বাসা তৈরি করে ফেলেছে সকালের মধ্যেই।

মনে মনে ভাবছি, কখন এই মাটিটা ঝেড়ে পুঁছে ফেলব। বারে বারে ভোমরাটা 'ভোঁ-ও-ও' করে ঘরে ঢুকছে বের হচ্ছে, এও এক অস্বস্তিকর ব্যাপার।

অবনীন্দ্রনাথ সেদিন ভারি খুশি। বললেন, দেখেছ, ঠিক জায়গা বুঝে নিয়েছে। বুঝেছে যে এ নোয়ার দ্বীপ। থাক্ থাক্, তাড়া দিয়ো না।

বিকেল বেলা দেখি 'অ্যারোরুট পর্বত' হাতে নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বাইরে কাচের ঘরের চারপাশে জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বললেন, নানা লোক আসে যায় ঘরে সারাদিন, এর বাসা বাঁধার ব্যাঘাত ঘটবে। তাই একটা নিরাপদ স্থান খুঁজছি। বেশি দূর হলেও চলবে না, ভোমরাটা খুঁজে পাবে না তা হলে। কাছাকাছিই রাখতে হবে এটিকে।

শেষে জানালার পাশে বাইরের দিকে একটা খাজ মতো ছিল, সেখানে পর্বতটি বসিয়ে রাখলেন। আর বারে বারে উঠে গিয়ে দেখতে লাগলেন ভোমরাটা আসছে কি না ঠিক জায়গাতে। যখন দেখলেন সেটার আনাগোনা আবার আগের মতো চলছে তখন নিশ্চিন্ত হলেন।

শান্তিনিকেতনে এসে কুটুম-কাটামের জন্য আবার একটি গহনার পুঁটলি তৈরি হল, ছোটো একটি বলের আকার। বলেন, বহু মূল্যবান দ্রব্য এতে, এ শুধু আমি খুলব। আর কেউ হাত দেবে না। কুটুম-কাটামের যখন একটু সাজসজ্জার প্রয়োজন হয়, সেই পুঁটলির গিঁট খোলেন, এক টুকরো রঙিন

সুতো বা কিছু বের করতে ঘণ্টাখানেক তাতে খোঁজাখুঁজি করেন। একদিন আমি একটা থলি বানিয়ে আনলাম, বিহারী এক ভাবীর কাছে শিখেছিলাম জেলে বসে। থলিটার মুখটা সামনের দিকে তিন-কোনা ভাবে খোলা, দিব্যি দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে হাত ঢুকিয়ে জিনিস বের করা যায় তা থেকে। বাঁধতে গোটাতে হয় না তাকে।

অবনীন্দ্রনাথ আমগাছের একটা শুকনো সরু ডাল, পল্লবের কাছাকাছি যে ডাল থাকে সেইরকম ডালের একটা টুকরো হাতে নিয়ে বসে ছিলেন, থলিটি নিয়ে আমি ঘরে ঢুকতেই দেখি, দেখি, বাঃ বাঃ, এই তো আমি চাইছিলাম ব'লে, থলির মুখে আমডালটা বসিয়ে দিলেন। বললেন— দাও দাও, থলিটা ভরে দিতে হবে, ওই গহনার পুঁটলিটাই দাও। পুঁটলিটা নিয়ে ঠেসেঠুসে থলিতে পুরে বললেন, দেখো দেখো, এ হল আমার 'নর্মদা-নার্স'।

দেখি, সত্যিই যেন মাথায় ঘোমটা-তোলা পেট-মোটা এক মেট্রন-নার্স, হাত তুলে মুখ হাঁ করে চেঁচামেচি করছে কার সঙ্গে। নিমেষে হয়ে গেল নর্মদা-নার্সের সৃষ্টি। পেটে রইল তার বহু মূল্যবান দ্রব্যে ভরা গহনার পুঁটলিটা চিরকালের তরে।

সেদিন দুপুরের দিকে অবনীন্দ্রনাথের একটু জ্বর-ভাব এল। বোঠান বললেন, ছোটোমামা, বাইরে আজ ঠাণ্ডা লাগিয়ো না। বিছানায় শুয়ে থাকো।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, আচ্ছা, তবে আমার নর্মদা-নার্সকে এনে দাও আমার ঘরে।

নর্মদা-নার্সকে তাঁর শোবার ঘরে খাটের পাশে টেবিলের উপরে এনে রেখে দিলাম। নর্মদা-নার্স হাত মেলে চেঁচামেচি করতে লাগল এবারে অবনীন্দ্রনাথকে দেখে। অবনীন্দ্রনাথ সুবোধ বালকের মতো পাশ ফিরে শুয়ে রইলেন দিকে চেয়ে।

নর্মদা-নার্সের একটা স্কেচও করেছিলেন তিনি পরে।

তখন একবার ওখানকারই এক অবাঙালি শিল্পী তাঁর অনুমতি নিয়ে কুটুম-কাটামের ছবি আঁকতে শুরু করল। খানকয়েক আঁকল। আমের ডাল তো আমের ডালই রাখল ; তালের আঁঠি, তালের আঁঠি হয়েই রইল।

অবনীন্দ্রনাথ দুঃখ পেলেন। বললেন, আমার এগুলি তো তা নয়, এরা যে সব জীবন্ত। তুমি আঁকো দেখিনি কয়েকখানা। বলে, নিজেই একটি কুটুম-কাটাম হাতে নিয়ে আঁকতে লাগলেন।

একটি ছোট্ট ডাল, ইউক্যালিপটাসের, গায়ের বাকল উঠে ডালটা সাদা হয়ে আছে। সে একদিন কুটুম-কাটাম হয়ে ঠাঁই পেয়েছিল কাচের আলমারিতে। তাকে হাতে নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ আঁকতে লাগলেন, আমি দেখতে লাগলাম।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, দেখো, এ কি গাছের শুকনো ডাল? এ যে 'নটরাজ'। ছাইমাখা শিব নাচছে কেমন দেখো।

দেখি, যেমন যেমন আঁকছেন, ডালটির গায়েও ঠিক ঠিক জায়গায় তেমনি গড়ন তেমনি রঙ তেমনি শেড। তাঁর আঁকা দেখতে দেখতে সেদিন দেখার চোখ খুলে গেল।

তিনি বললেন, এদের ধরতে চেষ্টা করো। দেখেশুনে ফেলে রেখে দেবে, খেলা করে ভাঙবে, এরা সে জিনিস নয়। এদের একটা আলাদা ভাব আছে। ধরতে যখন পারবে তখন দেখবে যে এরা এ জগতেরই মানুষ নয়। প্রকৃতির ছেলেমেয়ে এরা। প্রকৃতি এদের রূপ দিয়েছে। সে রূপ যে জায়গায় বসাবে সেখানেই মানিয়ে যাবে। অদ্ভুত জিনিস! সাধে কি কুটুম-কাটাম নাম দিয়েছি? নয় তো শুকনো কাঠকুটো ভাঙা ডাল পড়ে থাকত মাটিতে। আমার চোখে তাদের রূপ ধরা পড়ল কেন? এতদিন তো পড়ে নি, আর কারো চোখে লাগে নি, কারো মনেও জাগে নি। তবে আমাকে কেন ধরা দিলে এরা এতকাল বাদে? তার মানেই এরা একজন আপনার লোকের হাতে পড়তে চাইছে। যে এদের খেলার বস্তু হিসাবে দেখবে সে এর কিছুই পাবে না; বাইরের খোলসটাই পাবে সে। কিন্তু এরা তা নয়। এদের সঙ্গে ভাব করলে এদের রূপ দিতে গিয়ে দেখবে এরা এক-একজন এক-এক জগতের কথা বলছে। সে বড়ো কম নয়।

পরে তাঁর কাছে বসে কয়েকখানা ছবি আঁকলাম, কুটুম-কাটামের। আঁকতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। শুকনো কাঠে কত রঙ, ঠিক যেখানে যেমনটি থাকা দরকার সব আছে তাতে। কাঠের চিলতে একটি, আঁকতে গিয়ে তখন দেখি, চিলতে তো নয়, যেন এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন ছাদে

আলসের ধারে। তার গায়ের জোব্বা মুখের গড়ন শুভ্র শুশ্রু মাথার টুপি—সব-কিছু ওই কাঠের চিলতের মধ্যেই সূক্ষ্ম রঙে-রেখায় সুসম্পূর্ণ। আঁকতে গিয়ে তবে ধরতে পারলাম এ জিনিস, ধরতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। যেন দৃষ্টি ফিরে পেলাম।

দেখতাম, অবনীন্দ্রনাথ প্রায়ই একখানি ইসলামী বই পড়তেন অবসর সময়ে কোলে নিয়ে। মহাভারতের মতো মোটা বই, সেই রকমই পদ্যে লেখা। মাঝে মাঝে পড়েও শোনাতেন। বাংলা অক্ষরে ইসলামী ভাষায় কবিতা তাঁর মুখে শুনতে বেশ লাগত।

এক বিদেশী শিল্পী, নাম তাঁর মনে নেই, গোলাপী সবুজ সাদা গ্রে নানা রঙের ছোটো ছোটো পাথরের নুড়ি সংগ্রহ করে বেড়াল পাখি ব্যাঙ নানা জিনিস গড়েছেন। নুড়িগুলির আপন-আপন গড়ন রেখেই তার থেকে সব রূপ-ভঙ্গি ফুটিয়েছেন। একটা বিলিতি ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিল সে-সবের ছবি। অবনীন্দ্রনাথ যত্নে সেই পাতাটি কেটে তাঁর প্রিয় ইসলামী বইয়ের প্রথম পাতায় আঠা দিয়ে সেঁটে রেখেছেন। প্রায়ই বই খুলে দেখান, বলেন, দেখো, কী সুন্দর এগুলো!

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, নদীর পাড়ে যখন ঢেউ এসে লাগে, একটা দাগ কাটে। সেই দাগের ধাক্কা খানিকটা অবধি চলে আসে, আসতে আসতে মাঝনদীতে যখন আসে তখন আর দাগের কিছুই থাকে না, সব তোলপাড়। একেবারে অন্য জিনিস। আমার অবস্থা এখন তেমনি। মাঝদরিয়ায় এসে গেছি। এখন যদি বলো কোন্ ধারায় আমার চলছে, ধারা পাবে না খুঁজে; সব ওলট-পালট। ওই-যে বললুম, মাঝদরিয়ার তোলপাড়; সব-কিছু কাটিয়ে চলে এসেছি আমি। তাই তো আজ আমার কাছে দেশী-বিদেশী আর্টের ভেদাভেদ নেই। সমান আদর দিতে পারি, সমানভাবে নিতেও পারি। এইখানে আমার বীরত্ব বলতে পারো।

এক সময়ে ছবি-টবি সব ফেলে বসে গেলুম পুতুল গড়তে। চাকর দেখে লজ্জা পায়, বলে, রঙ কাগজ বের করে দিই।

কিন্তু কেন আমি বসে গেলাম ওভাবে কাঠকুটো নিয়ে? না, মন চাইত নতুন কিছু নিয়ে খেলতে।

রবিকাও বলতেন, অবন আঁকছ না কেন?

বলতুম, কী জানি, মন ভরে না আর। সবই আয়ত্তে এসে গেছে, নতুনের আনন্দ পাই নে।

রবিকা বুঝতেন ; তাই তো ডেকে ডেকে আমার কুটুম-কাটাম দেখতেন। মনে নেই ? পকেটে করে রোজ একটি-দুটি নিয়ে যেতুম, দেখে তিনি কত খুশি হতেন। বলতেন, এ তুমি নষ্ট কোরো না, ফেলে দিয়ো না। এতে অনেক কিছু শেখবার আছে।

এগুলির মধ্যে কী জিনিস ছিল তা তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। ওই অতবড়ো লোক বলেই আমার এ-সবের ভিতরে আমার সৃষ্টিকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বুঝতেন, সত্যিকার সমঝদার ছিলেন।

এ সময়ে অবনীন্দ্রনাথ একসেট বাল্মীকিপ্রতিভার কুটুম-কাটাম গড়লেন। গড়ে একটা ট্রের উপরে এক এক সেট দৃশ্য সাজালেন। ট্রেখানা যেন স্টেজ। তাদের সাজিয়ে বসে বসে দেখতেন আর খুশি হয়ে উঠতেন।

বললেন, এই সেটগুলি এঁকে ফেলো দেখি।

ছখানি ছবি আঁকলাম বাল্মীকিপ্রতিভার ঠিক হুবহু কুটুম-কাটাম দিয়ে। কেবল ব্যাকগ্রাউণ্ডের দৃশ্য কল্পনা থেকে নেওয়া হল। অবনীন্দ্রনাথও হাত লাগালেন এই ছবিগুলিতে।

এই ছবিগুলি আঁকবার কালেই সরস্বতীর ছবি আঁকতে আঁকতে বলেছিলেন, দেবীদের ভঙ্গি থাকবে না। ভঙ্গি তো নাচের। দেবীরা হলেন স্থিরচপলা।

এই বাল্মীকিপ্রতিভার কুটুম-কাটামগুলি পুপু চাইল ; ট্রে-সমেত তাকে দিয়ে দিলেন।

ছবিগুলি আমার কাছে রইল, এখনো আছে।

•

কত ছবি কত স্কেচ অবনীন্দ্রনাথ দিয়ে দিতেন কতজনকে, আঁকা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে। শুধু বড়োদের নয়, ছোটোদেরও কত কত রঙিন ছবি স্কেচ দিয়ে দিতেন।

মহাদেবের বছর-পাঁচেকের বাচ্চা ছেলেটা পেটভরা পিলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এসে জানালার পাশে। একদিন অবনীন্দ্রনাথ বললেন, আহা, ওরও বোধ হয় একটি ছবি পাবার শখ। দিয়ে দাও এই ছবিটা ওকে।

কুটুম-কাটামের রঙিন ছবি এঁকেছিলেন একটা, বেশ বড়ো ছবি ; সেখানা দিয়ে দিলেন মহাদেবের ছেলেকে।

ছেলেটা তো বাদামভাজার ঠোঙার মতো ছবিটা মুড়ে নিয়ে দৌড় দিল ঘরের দিকে। হয়তো-বা পেটে পিঠে পেরেক ঠুকে দেয়ালে গেঁথে রাখবে রাম সীতা হনুমানের ছবির পাশে, নয়তো তার বর্ণপরিচয় বইটাতে মলাট দেবে। কিছু আর বলতে পারলাম না, দেখলাম শুধু চেয়ে।

ছোটো ছেলেদের জন্য ছিল তাঁর অন্তরভরা দরদ।

লাবু টাইফয়েডে ভুগছে আজ দিন পনেরো হল। জ্বরের ঘোরে কাল রাত্রে ঝগড়া করেছে তার ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে, অবুদাদু আমায় একটা কাঠের মন্দির করে পাঠালেন, তুমি সেটা নিয়ে নিলে কেন?

অবুদাদু শুনে বললেন, আহা দাও-না ওকে একটা মন্দির আমার কুটুম-কাটাম থেকে বেছে। ছেলেমানুষ, স্বপ্নেও অবুদাদুর খেলনা নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে। কুটুম-কাটাম দেখলেই লাবু ভালো হয়ে যাবে। ওকে দাও গিয়ে আমার নাম করে।

ছোটোরা ছিল তাঁর আপনজন, তার প্রিয় সঙ্গী। কখনো তাদের উপর বিরক্ত হতে দেখি নি তাঁকে। তাঁদের নিয়ে তাঁর ধৈর্যও ছিল অসীম।

অভিজিৎকে রঙ পেনসিল কাগজ দিয়ে তাকে বিছানায় রেখে আমি রান্নাঘরে কাজ করছি। বাড়িতে অতিথি এসেছেন জনকয়েক, আজ আর ছুটি মিলল না সংসার থেকে। এক দিকে কুটনো-কোটা, আর-এক দিকে মসলা-বাটা, রান্না, ছুটে ছুটে সারছি। কানে এল ঘরে যেন আমাদের বুড়ি সাঁওতাল মেঝেনটা চেঁচামেচি করছে।

মেঝেনটাকে 'বউ' বলে ডাকি। শুনি, বউ বলছে, হাঁ খোকন, আর কতবার যাব? একই জিনিস লিয়ে বারে বারে যেতে আর পারবু নি।

অভিজিৎ বলছে, 'যা-না বউ, আর-একবার যা। দেখছিস-না আমার জ্বর হয়েছে?'

বউয়ের হাতে একটি সাদা কাগজের কার্ড, দেখি তাতে, অভিজিৎ ছবি এঁকেছে, এ পাশে তাকিয়া, ও পাশে তাকিয়া, মাথার নীচে বালিশ, একজন যেন কেউ শুয়ে আছে। একপাশে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখেছে, বলো তো অবুদাদু, আমার কী হয়েছে?

অবুদাদু সেই ছবির পাশে লিখেছেন, মা ধমকেছেন।

অভিজিৎ লিখে পাঠাল, তা নয়।

অবুদাদু লিখে পাঠালেন, মাথা ধরেছে।

অভিজিৎ লিখলে, তাও নয়।

অবুদাদু লিখলেন, তবে পেট কামড়াচ্ছে।

অভিজিৎ এবারে লিখে পাঠাল, হল না।

অবুদাদু লিখে পাঠালেন :

ঠকেছি ঠকেছি এইবার
বার বার তিনবার
অভিজিতের কাছে হার।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুরো নাম সই দিয়ে হার স্বীকার করলেন।

সকালবেলা এক ফাঁকে দেখে এসেছিলাম তিনি ছবি আঁকছেন। ছবি আঁকার সময়ে বড়োরা কেউ টুঁ শব্দটি করে না ঘরে। অথচ ছোটো ছেলের খেলায় তিনি যেন সকল অবস্থায় সঙ্গী হয়ে আছেন।

অভিজিৎ তখনো লিখতে শেখে নি, নানারকম দাগ কেটে চিঠির কাগজ ভরতো, কী, না, অবদাদুকে চিঠি লিখছে। একবার পাঠিয়েছিলাম একখানা চিঠি কলকাতায় তার অবদাদুর কাছে। তিনি লিখলেন, অভিজিৎ আমাকে একটা ছড়া লিখেছে, শুনে নাও :

মা বললেন, পাশ করলে না অভিজিৎ
অভিজিৎ বললেন, শর্মা যা লিখলেন
বুঝতে হারলেন পণ্ডিত!
আমি লিখেছিলুম ইঞ্জিন মিঞ্জিন
বাড়ির চালে দু দুটো চিল
বাড়ির মধ্যে অবুদাদু
দোরে দিয়ে খিল
খাচ্ছে চকলিট।
বাবা বললেন, চকলিট নয় কফি অভিজিৎ।

পরে অভিজিৎ লেখা শিখল, লিখে অবুদাদুকে চিঠি দিত, এঁকে চিঠি দিত। তিনিও তাকে লিখে চিঠি দিতেন, এঁকে চিঠি দিতেন।

অভিজিৎ লালবাঁধে সাঁতার শিখছে, তাড়াতাড়ি জানাল সে-কথা তার

অবুদাদুকে। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে চিঠির কাগজে আঁকলেন, জলে হাঁসদের সঙ্গে অভিজিৎ সাঁতার কাটছে, নাকটা বেরিয়ে আছে, বক জলের পোকা ভেবে খেতে আসছে। লিখলেন, 'ভাই অভিজিৎ, লাল বাঁধের হাঁটুজলে তুমি সাঁতার খাও শুনে আমার ভারি ভয় হল। হাঁসগুলো জলের পোকা ভেবে টপ্ করে না ধরে ফেলে। হে মা সুবচনী! তোমার খোঁড়া হাঁসকে বলে দিয়ো যেন বেচারার উপরে কেউ অত্যাচার না করে।' সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও একটি ছবি এঁকেছেন, চুরুট মুখে ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। হাতে বই, তাতে লেখা 'বৈদ্য, দৈব'। লিখলেন, 'অবুদাদু কেমন সাঁতার খাচ্ছেন দেখো দাদা, এরে বলে শুকনো ডাঙায় চিৎ-সাঁতার, বা অবুদাদুর 'ইজি ওয়ে অব্ সুইমিং'। জাহাজের মতো ধুমো ছাড়তে ছাড়তে দৈবে বৈদ্যে এখানে আমায় সাঁতার খাওয়াচ্ছে। সাঁতারের এ-পিঠ আর ও-পিঠ দেখে শিক্ষা লাভ করো, এই আশীর্বাদ।'

অল্প অল্প জর হচ্ছিল রোজ তখন অবনীন্দ্রনাথের গুপ্তনিবাসে। লিখলেন, 'দাদা অভিজিৎ আমাকে ৯৯° ভূতে ধরেছে। মাঝে মাঝে পেটে ফুঁ দিয়ে এমন পেট ফুলিয়ে দিচ্ছে যে, একেবারে হাঁস্-ফাঁস্ করতে করতে পুকুর-জলে সাঁতার কাটতে ইচ্ছে হয় হাঁসের মতো— সাঁতার জানি নে সে-কথা ভুলে যাই, দুষ্টুমি দেখো ভূতের। আমাকে ডুবিয়ে ছাড়বার ইচ্ছে। কানাই ডাক্তার এসে ক্যালসিয়াম দিতেই, ব্যস্ পলায়ন। কাল সকালে ধরেছিল ভূতে, তার আগে কদিন সন্ধেবেলায় যখন সবাই বাগানে, আমি একা বারান্দায়, সেই সময়ে এসেছিল, কানাই কানাই বলতেই পালিয়েছে। ভূতের ভয়ে বেশি চলাফেরা বন্ধ করতে হয়েছে। বাগানে যাই নে, পুকুরঘাটের দিকেও নয়। একটু ফাঁক পেলেই তোমাদের ওখানে যাচ্ছি, ভেবো না!'

অভিজিতের কাছে লেখা চিঠিতেই পেতাম তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কিছু কিছু আভাস। দাঁত নিয়ে ব্যথা বেদনায় ভুগছেন, দাঁতের ডাক্তার চিকিৎসা করছে, নিজের ছবি স্কেচ করে পাঠালেন, মুখ হাঁ করে আছেন, ডাক্তার খোঁচাখুঁচি দিচ্ছে। নীচে লিখলেন, '···একেই বলে আসুরিক চিকিৎসা! গলা চিরে আশীর্বাদ করছি— ভালো হচ্ছি ভালো হচ্ছি।'

এই-সব ছবি চিঠি নিয়ে আমি বসে থাকতাম।

আশ্রমে ছোটোদের যেমন ঝোঁক হয়, অভিজিতেরও ঝোঁক হল গুটিপোকা সংগ্রহ করার। অবুদাদু শান্তিনিকেতনে এলে যেখানে যত গুটিপোকা পায়

খুঁজে খুঁজে এনে অবুদাদুর কাচের ঘরে রাখে। কিছুদিন পরে গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি বের হয়, কুঁকড়ে-মুকড়ে থাকা ডানা দুটো থরথর করে কাঁপায়, ডানা খুলতে থাকে; তার পর এক সময়ে দু-ডানা মেলে উড়ে চলে যায়। এও এক খেলা অবুদাদুর সঙ্গে। এক-একদিন এমন হত, আট-দশটা প্রজাপতি ফুটে বের হত। তারা কেউ জানালায়, কেউ টেবিলে, কেউ আলমারির উপরে, কেউ-বা অবুদাদুর হাঁটুর উপরে বসে ডানা কাঁপাতে থাকত। হরেক রকম গুটিপোকা ধরে আনত অভিজিৎ। তাকে থামানো যেত না। কত সময়ে, ছবি আঁকবার সময়ে অবনীন্দ্রনাথের হাতে, তুলিতে এসে বসত প্রজাপতি। অসুবিধে হত বৈকি! নতুন প্রজাপতি, উড়তে সময় নিত।

অবুদাদু ছবি আঁকলেন— মশারির ভিতরে অভিজিৎ বসে আছে, সামনে মস্ত এক মুখোশধারী গুটিপোকা দাঁড়িয়ে। বললেন, ও ভাই অভিজিৎ, দেখো, তোমার গুটিপোকার ভূত এসেছে রাত্তিরবেলা। এখন কয়দিন আর ও দিকে যেয়ো না। হুঁশিয়ার থাকো।

ডাঁট-ভাঙা একটি ফ্ল্যাট-ব্রাশ ছিল অবনীন্দ্রনাথের। অতি পুরোনো ব্রাশ— বহু ছবি করেছেন এই ব্রাশ দিয়ে। ব্রাশের রোঁয়াগুলি অনেকটা ক্ষয়ে গেছে, লাল ডাঁটটি হাতে জলে রঙে ব্রাউন হয়ে এসেছে। কী কারণে কবে যে ব্রাশটির লম্বা ডাঁটটা ভেঙে আধখানা হয়ে আছে জানি না। জিজ্ঞেসও করি নি কখনো। ভাঙা তো ভাঙা দেখাই অভ্যাস হয়ে আছে।

কী জানি কেন, এই ব্রাশটি সম্বন্ধে অতিশয় সতর্ক অবনীন্দ্রনাথ। কাউকে ছুঁতে দেন না।

তিনি যখন ছবি আঁকেন, পাশে বসে রঙ গুলে দিই, তুলি এগিয়ে ধরি। আগে তো শুনেছি এই রঙ-তুলিও ধরতে দিতেন না কাউকে। আমাকে কী ভেবে দয়া করেছেন, ধরতে দিয়েছেন; তবে বলেছেন, কিন্তু আমার এই ফ্ল্যাট-ব্রাশে হাত লাগিও না। ও আমার মন্ত্র-পড়া ব্রাশ। খবরদার, কেউ ছুঁয়ো না।

ভয়ে সাবধানে থাকি। অন্যরাও তাই। এই ব্রাশ দিয়ে তিনি ছবিতে ওয়াশ দেন, বলেন, এটি না হলে আমার ছবি আঁকা হয় না।

ছবি আঁকা হয়ে গেলে নিজেই ধুয়ে ঝেড়ে ব্রাশটি তুলিদানিতে রেখে দেন। অন্য তুলিগুলি আমি ধুয়ে ঝেড়ে রাখি।

কুটুম-কাটামের ঘর, মানে উদয়নের সেই ছোটো কাচের ঘর। অবনীন্দ্রনাথ সকাল-বিকেল এখানে এসে বসেন, ছবি আঁকেন, কুটুম-কাটাম গড়েন। একই আসনের এক দিকে থাকে ছবি আঁকার রঙ তুলি, আর-দিকে থাকে কুটুম-কাটাম গড়ার সরঞ্জাম। স্নানের সময় হলে বারে বারে বাবুলাল এসে তাগিদ দিতে থাকে। এই স্নান করা নিয়ে ছিল তাঁর ছোটো ছেলের মতো আপত্তি। তিনি 'এই যাই, এই যাই' করে কাজে আরো মন ঢেলে দেন। খাবার সময় উতরে যায়, বলেন, চান করবার দরকার নেই আজ, কেমন মেঘলা মেঘলাও করেছে, কি বলো ?

গরমে মরে যাচ্ছি, ঘামে গা ভেসে যাচ্ছে, শুকনো আকাশ খট্‌খট্ করছে। তাঁর কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে হাসি সবাই।

বাবুলাল নাছোড়বান্দা, বলে স্নান করতে হবে, বউমার হুকুম।

বউমার হুকুম, কী আর করেন, কাঁচুমাচু মুখ করে সকলের দিকে তাকাতে তাকাতে ওঠেন। ভাবখানা, কেউ একবার বলুক, 'আজ আর স্নানের দরকার নেই আপনার'।

শেষে নিরাশ হয়ে কোনোমতে দু-মগ জল গায়ে মাথায় ঢেলে দু-গ্রাস ভাত মুখে দিয়ে একটু দিবানিদ্রার জন্য বিছানায় যান। খানিক চোখ পিট্‌পিট্ করেন, তার পর উঠে চলে আসেন কুটুম-কাটামের ঘরে। সন্ধ্যা অবধি কাজ চলে ; ছবি হলে ছবি, নয়তো কুটুম-কাটাম।

তাঁর কৌচের ডান দিকে থাকে প্যালেট, মানে রঙ গোলাবার জন্যে একখানি ঘষা-কাচ, রঙ তুলি জল একটা উঁচু জলচৌকির উপরে ; আর থাকে ওই ডাঁট-ভাঙা ফ্ল্যাট-ব্রাশটি একটি কাচের তুলিদানিতে। বাঁ দিকে একটা মোড়ার উপরে থাকে কুটুম-কাটাম গড়ার যন্ত্রপাতির একটা চামড়ার ব্যাগ, অনেকটা একটু বড়ো গোছের মনিব্যাগের মতো। এই ব্যাগটুকুতে পুরে যন্ত্রপাতি নিয়ে আসেন, নিয়ে যান। মোড়ার পাশে কাঠকুটোয় ভরা ছোটো একটা প্যাকিং বাক্স, ছাঁট কাপড়ের পুঁটুলি। বলেন, কত সময়ে কত জিনিসের দরকার হয়। এ-সব জমিয়ে রাখি। কখন কার কোন্‌টা দরকার লাগবে, হঠাৎ হাতের কাছে তখন পাব কোথায় ?

অভিজিৎ স্কুল-ফিরতি পথে কুড়িয়ে আনে তালের আঁঠি, শুকনো আমের ডাল, পাথরের নুড়ি। বলে, অবুদাদু, এটাতে দেখো কেমন পেঁচা হবে, আর

তালের আঁঠিটা, ঠিক তোমার ওই চরকাবুড়ির মুখ না? আর এটা তো ভূতের ঘর, দুটো ভূত বসিয়ে দাও অবুদাদু!

অবুদাদু বলেন, হাঁ্যা, হাঁ্যা, ঠিকই তো, ভূতের ঘরই তো। তা রাখ্, আগে এই ছবিটা শেষ করে নি। বিকেলে আমাদের পুতুল গড়া হবে।

কখনো বা তখনি বসে বসে পুতুল গড়া খেলা খেলতেন। বলেন, দাও তো অভিজিৎদাদা, এখানে একটা ফুটো করে। এমনি করে ধরো এটা, তার-পর আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে চাপ দিতে থাকো। হাঁ্যা, ঠিক, এবারে এই কাঠিটা এতে ঢুকিয়ে দিলেই হবে। দাও, আমি ঠুকে দিই, এ তুমি পারবে না। দেখো তো এবারে কী সুন্দর আটকে গেছে, আর পড়বে না।

পঁচাত্তর বছরের অবুদাদুতে আর ছয় বছরের অভিজিতের এ এক নিবিষ্ট মনের খেলা। একজন গড়েন, আর-একজন দেখে, তার পর শেষ হলে দুজনেই ভীষণ খুশি। এমনি করে চলে দুজনের খেলা।

অভিজিৎকে নিয়ে আর-একটা বিষয়েও নিশ্চিন্ত থাকতেন অবুদাদু; অভিজিৎ তাঁর কাজের জিনিসে কখনো হাত দিত না। যদি তিনি বলতেন 'এটা দাও দেখি', 'ওটা আনো তো এদিকে', তবেই হাত দিত। এ নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ খুব খুশি থাকতেন তার উপরে।

একদিন সকালে অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকছেন, আমি পাশে বসে তাঁর আঁকা দেখছি। আঁকতে আঁকতে তিনি বললেন, ছবির কিনারে একটা বর্ডার টানো দেখি বেশ মোটা রঙ দিয়ে। আমি ততক্ষণ বারান্দায় বসে চুরুটটা টানি। সকাল থেকে এটা মুখেই থাকে, টানা আর হয় না।

অবনীন্দ্রনাথ বারান্দায় বসে চুরুট খাচ্ছেন, আমি ঘরে বসে ছবিতে বর্ডার দিচ্ছি; দমকা হাওয়ার মতো অভিজিৎ ঘরে ঢুকে কাঠ ফুটো করবার সরু শিকটা হাতের কাছে ছিল, ডান হাতে সেটা তুলে বাঁ হাতে ফ্ল্যাট-ব্রাশটা নিয়ে ফুটো করবার মোটা সুচের মতো শিকটা ঢুকিয়ে দিল তাতে একটা ফুটো করে, পলকে করল তা। একেবারে এফোঁড় ওফোঁড়।

দেখে তো আমি কাঠ! এ কী করল অভিজিৎ! কোনোদিন সে অবু-দাদুর আঁকার জিনিসে হাত দেয় না। আজ এ কী মতি হল তার!

ধরবি তো ধর, ওই ফ্ল্যাট-ব্রাশটাই! কালও যে আমি বকুনি খেয়েছি। অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা হয়ে গেছে, ফ্ল্যাট-ব্রাশটা ধুয়ে রাখবার জন্য হাত

বাড়িয়েছি ; তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, রানী, আর যাই করো— এতে হাত লাগিয়ো না। এ শুধু আমার এই হাতের জন্য।

এমন যে তুলি, তাকেই কিনা ফুটো করে দিল অভিজিৎ!

দাঁড়িয়ে উঠে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় বসিয়ে দিলাম অভিজিতের গালে। চাপা গলায় দাঁতে দাঁত ঘষে বললাম, 'হতভাগা ছেলে, এ করলে কী?' রাগে, ভয়ে, দুঃখে আমি তখন দিশেহারা।

ওই তো একটু দূরেই বারান্দায় অবনীন্দ্রনাথ বসে। কোন্ সাহসে গিয়ে বলব কী হয়েছে।

অভিজিতের মুখ কান লাল হয়ে উঠল। এই প্রথম সে এমন মার খেল আমার হাতে। হতভম্ব অভিজিৎ। তাকে আর-একবার জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে চড়চাপড় মেরে বললাম, 'যাও, তুমিই যাও, বলো গে এ-কথা অবুদাদুকে। নিয়ে যাও এই তুলি হাতে করে, কী করেছ নিজের মুখে বলে শাস্তি নাও। দেখো তিনি কী করেন আজ তোমায়। আমি কী করে মুখ দেখাব তাঁকে'। অভিজিতের হাতে তুলি আর ফুটো করবার শিকটা ধরিয়ে দিয়ে ঠেলে বের করে দিলাম ঘর থেকে।

জানি তো এই-ই শেষ, আর বোধ হয় আমরা এই ঘরে ঢুকতে অনুমতি পাব না। শেষ হয়ে গেল এমন স্নেহের এত বড়ো আশ্রয়। চোখের জল আমার বাধা মানছে না।

অভিজিৎ ভয়ে ভয়ে একপা-একপা করে এগিয়ে গেল, বলল, অবুদাদু— আর বলতে পারল না, এতক্ষণের চেপে রাখা কান্নায় ভেঙে পড়ল। এতক্ষণ এত মার খেয়েও এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে অবসর পায় নি সে ; এবারে অবুদাদুর কাছে এসে তা আর আটকাতে পারল না।

অবুদাদু বললেন, কিরে কী হয়েছে? আয় কাছে আয়। কী হয়েছে বল্ এবারে।

অভিজিৎ এক হাতে চোখ মোছে আর-হাত বাড়িয়ে দেখায় তুলিটি। বলে, আমি দোষ করে ফেলেছি অবুদাদু।

অবুদাদু বললেন, 'কী দোষ দেখি দেখি? ফুটো করেছিস, ভালোই তো। আমিও ভাবছিলুম এতে একদিন ফুটো করে গয়না পরাব। যাক্, তুই-ই আগে ফুটো করে ফেললি!

বললেন, এ ঠিক হয়েছে। এর নথ পরতে শখ হয়েছিল রে। যা তো, গয়নার পুঁটলিটা নিয়ে আয় তো দৌড়ে। কেমন মজা হবে দেখবি'খন।

অভিজিৎ ঘরে এসে কাপড়ের পুঁটলিটুকু ত্রস্ত হাতে খুলে তার ভিতর থেকে তারও চেয়ে ছোটো আর-একটা পুঁটুলি বের করে নিয়ে গেল। তার মধ্যে ছিল জরির টুকরো, চুমকি, কয়েকটা নকল মোতি, সোনালি ফুকোর দানা।

অভিজিতের সব জানা; কুটুম-কাটামের জন্য কোথায় কী থাকে। তাড়াতাড়ি গয়নার পুঁটলি খুলে ফেলল। অবুদাদু তা থেকে একটি নকল মোতি নিয়ে বললেন, এবারে একটু সুতো চাই যে দাদা, নয়তো গয়না পরাব কি করে ?

অভিজিৎ আবার ছুটল। বসবার ঘরের সতরঞ্চির পাশ থেকে সুতো ছিঁড়ে নিয়ে এল। তিনি তাতে মোতিটা গেঁথে তুলির ফুটো দিয়ে সুতো গলিয়ে বেঁধে দিলেন। বললেন, বাঃ, বাঃ, কেমন সুন্দর নথ হল দেখ দেখি।

অবুদাদু তুলিটা হাতে নিয়ে নাড়েন, শক্ত কাচের মোতি তুলির কাঠে লেগে ঠকঠক আওয়াজ তোলে, অভিজিৎ আর অবুদাদু হেসে হেসে ওঠেন। যত হাসেন তত তুলি বাজান, যত বাজান তত হাসেন।

সে এক দৃশ্য !

এই তুলিটি পরে একদিন আমি চেয়ে নিই তাঁর কাছ থেকে। সুযোগ এসে গেল একবার।

ওয়াশের ছবি, এর টেকনিক অবনীন্দ্রনাথেরই আবিষ্কার। নিয়েছিলেন অবশ্য জাপানীদের ছবি আঁকার পদ্ধতি থেকেই। ওকাকুরার ছাত্ররা—টাইকান, হিশিদা এলেন এ দেশের আর্ট স্টাডি করতে। তাঁরা যখন ছবি আঁকতেন, তুলিতে জল নিয়ে কাগজ বা সিল্ক অল্প অল্প ভিজিয়ে নিতেন। অবনীন্দ্রনাথ দেখলেন। একদিন নিজে আঁকা পুরো ছবিটাই জলে ডুবিয়ে দিলেন। সবাই ভাবলেন, গেল ছবিটা নষ্ট হয়ে।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, ছবিটা জল থেকে তুলে দেখি ছবি নষ্ট তো হয় নি, বরং রঙের 'হার্ডনেস'টা চলে গেছে। বেশ একটা সফ্‌ট্ এফেক্ট এসেছে।

সেই শুরু হল ওয়াশের ছবি। ছবি এঁকে জলে ডুবিয়ে আবার আঁকতেন। আবার ডোবাতেন। ছবির রঙ পাকা হয়ে যেত। ছবি জলে ভিজলেও আর

রঙ উঠে যাবার ভয় থাকত না। আর ছবিও যেন আলো হাওয়া নিয়ে প্রাণের রসে ভরে উঠত।

এই ওয়াশের ছবি করতেই ফ্ল্যাট-ব্রাশ লাগে। টেম্পারা ছবিতেও লাগে, তবে বড়ো ছবি আঁকতে। কিন্তু এই ধরনের ব্রাশ ছাড়া ওয়াশের ছবি হয় না।

এই ব্রাশ এ দেশে জাপান থেকেই আসত সর্বদা। যুদ্ধের সময়ে আসা বন্ধ হয়ে গেল। ফ্ল্যাট-ব্রাশ আর পাই না কয়েক বছর। চীনা শিল্পী-বন্ধু জুঁ পিঁও, তাঁর একটা নতুন ফ্ল্যাট-ব্রাশ দিলেন আমাকে।

কাচের ঘরে অবনীন্দ্রনাথের পাশে বসে ছবি আঁকি, ঘরের এক কোনাতেই আমার রঙ তুলি রেখে দিই।

একদিন কী করে যেন রথীদার বাচ্চা 'এয়ারডেল' কুকুরটা খোলা ছিল রাত্রে, সে ঘরে ঢুকে নতুন ফ্ল্যাট-ব্রাশটি খুব করে মনের সুখে চিবিয়ে রেখেছে।

সকালে অবনীন্দ্রনাথই দেখলেন আগে ঘরে ঢুকে। বললেন, আহা, তোমার ফ্ল্যাট-ব্রাশটি নষ্ট হল। দাঁড়াও, আমার বাক্সে বোধ হয় এইরকম ব্রাশ আছে আরো। কলকাতায় গিয়ে তোমাকে পাঠাব।

'নতুন চাই নে, আমাকে তবে এই ব্রাশটিই দিন' বলে ব্রাশটি সেদিন চেয়ে নিলাম।

নখ-পরা ব্রাশটি আমার কাছেই আছে। মাঝে মাঝে বের করে দেখি, আর দেখাই আমার প্রিয়পরিজনদের।

•

অবনীন্দ্রনাথ ধূলিমুঠিকে সোনামুঠি করতেন ; এ দেখেছি। দেখেছি নিজের জীবনে, দেখেছি অন্যেরও জীবনে। একটা ঘটনা বলি।

একবার আশ্রমে একটি ছেলে এল। বছর চোদ্দ-পনেরো বয়স, রোগা পাতলা ; করুণ কচি মুখ। তার মুখখানার জন্যই আরো ছোটো লাগে তাকে দেখতে।

কোথা থেকে এল ছেলেটি কেউ বলতে পারে না। ছাত্ররা কেউ বলে, বাড়ি থেকে এতদূর পায়ে হেঁটে এসেছে। কেউ বলে, বিনা টিকিটে আসছিল, টিকিট-চেকার বোলপুর স্টেশনে নামিয়ে দিয়েছে, সেখান হতে চলতে চলতে এখানে চলে এসেছে। কেউ বলে, বাবা তাড়িয়ে দিয়েছে। কেউ-বা বলে, ঘরে সৎমা, তাই চলে এসেছে।

ছেলেটি শোনে সব কথা, ফ্যালফ্যাল করে তাকায়; কথা বলে না কোনো। সঙ্গে কিছু নেই। পরনে শুধু ময়লা ধুতি, গায়ে একটা শার্ট।

কী আর করা! ছেলেটিকে হস্টেলেই জায়গা করে দেওয়া হল থাকতে। অন্য ছেলেরা ভাগাভাগি করে জামাকাপড় দিল, বিছানাপত্র দিল। তারাই তাকে ঘিরে রইল। জানা গেল ছেলেটির নাম অবিনাশ।

অবিনাশ চুপচাপ বসে থাকে। ছেলেরা তাকে ধরে নিয়ে যায় খাবার ঘরে খেতে, কুয়োতলায় স্নান করাতে। ক্লাসেও নিয়ে যায়, অবিনাশ মুখ খোলে না, চুপ করে বসে থাকে এক পাশে। তা থাক, শিক্ষকরা ভাবলেন, কোনো কারণে আড়ষ্ট হয়ে আছে, ধীরে ধীরে কেটে যাবে এ ভাব।

মাঝে মাঝে সবার অলক্ষ্যে কোথায় চলে যায় অবিনাশ, ছেলেরা খুঁজে খুঁজে ধরে আনে তাকে। অবিনাশকে দেখা, তাকে খোঁজা, ছেলেদের একটা কাজ হয়ে দাঁড়াল। ছেলেরা অবিনাশকে প্রশ্ন করে করে দু-একটা কথা যা বের করে, তা থেকে কিছুই ধরা যায় না যে সে কে, কোথা হতে এল, কী চায় এখানে? তবে তার নাম যে অবিনাশ এটা ছেলেরাই জেনেছে তার কাছে।

অবিনাশকে নিয়ে মুশকিলে পড়া গেল। তাকে অন্য ছাত্রদের মতো সহজ জীবনযাত্রায় আনা গেল না। সবাই ধরে নিল ছেলেটি পাগল। পাগল ছেলেকে কত আগলানো যাবে? অবিনাশ আপন-মনে আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়ায়। কখনো সারাদিন তার দেখা পাওয়া যায় না। ছেলেরা খুঁজে খুঁজে সন্ধের দিকে ধরে আনে তাকে; কখনো দূরের খোয়াই হতে, কখনো সেই শ্মশান পেরিয়ে তালদীঘির উঁচু-নিচু ঢিবির খাদ হতে।

দিন যায়, যেতে যেতে অবিনাশও গা-সহা হয়ে যায় সকলের। কেউ আর তাকে নিয়ে তেমন উৎসুক হয় না। সে আছে তার নিজের মনে, ঘুরে বেড়ায়, আড়ালে আবডালে বসে থাকে। মাঝে মাঝে শুধু ধরে নিয়ে খাওয়ানো ছাড়া অবিনাশের অস্তিত্ব প্রায় ভুলেই আছে সবাই।

অবনীন্দ্রনাথ এলেন আশ্রমে। এবারে থাকবেন এখানে বেশ কিছুদিন। ছোটোমা চলে গেছেন। এখন বাইরে আসা, থাকার বাধা আর কোথায়? তা ছাড়া এখন আশ্রমের আবহাওয়াও ভালো।

অবনীন্দ্রনাথ সকালে বিকেলে রোজ খানিক হেঁটে বেড়ান। একাই যান। একদিন বেড়িয়ে ফিরলেন, সঙ্গে অবিনাশ।

বেড়াতে বেড়াতে অবনীন্দ্রনাথ দেখেন, গাছের গুঁড়ির আড়ালে কে যেন বসে? তিনি নাম শুধোন, উত্তর পান না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে একতরফা কথা বলে তাকে 'আয়, আয়, আমার সঙ্গে আয়' বলে ডাকতে ডাকতে নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে উদয়নে। এসে বারান্দায় নিজের কৌচে বসলেন, হাতের কাছের মোড়াটা কৌচের পাশে টেনে নিয়ে অবিনাশকে বসালেন। পাশাপাশি দুজনে বসে রইলেন।

কয়দিন ধরে চলল এই। রোজ বেড়াতে বের হন, অবিনাশকে নিয়ে ফেরেন, আর তাকে পাশে বসিয়ে রাখেন। শেষে এমন হল, অবিনাশ আপনা হতেই আসে, এসে বসে থাকে।

কেউ কাছাকাছি না থাকলে অবনীন্দ্রনাথ অবিনাশের সঙ্গে কথা বলেন। আড়াল থেকে দেখি, মাথা নেড়ে চোখের ইশারা দিয়ে কী যেন বলেন তিনি। মুখভরা হাসি তাঁর, স্নেহসিক্তি সে হাসি।

অবনীন্দ্রনাথ অবিনাশকে ঘরের পাশে ফোটা ফুল দেখান, হাসেন, অস্ফুটস্বরে যেন কানে কানে বলেন, কী সুন্দর রঙ— আঁকবি?

অবিনাশের মুখে হাসি ফুটি-ফুটি করে।

একদিন দেখি অবনীন্দ্রনাথের তুলি রঙ কাগজ অবিনাশের হাতে। তিনি দিয়েছেন তাকে। রোজ সেই কাগজ তুলি রঙ হাতে নিয়ে অবিনাশ এসে বসে থাকে।

অবনীন্দ্রনাথ একদিন অবিনাশকে সঙ্গে নিয়ে উঠে গেলেন, পথের দিকেই গেলেন। পর পর কয়েকদিনই সে এলে তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কোথায় যান, কী করেন, কোন্ সুধার সন্ধান দেন তাকে, জানতেও পারি নে।

একদিন দেখি টকটকে হলুদ রঙের গাঁদা ফুল এঁকে এনে অবিনাশ দেখাচ্ছে অবনীন্দ্রনাথকে। অবনীন্দ্রনাথ আরো কয়েকটা বাছাই বাছাই রঙের কেক বের করে দিলেন তাকে। বললেন, আরো আঁক্। যে ফুল দেখবি আঁকবি, যা ভালো লাগে তা-ই আঁকবি। রোজ নতুন নতুন এঁকে আনবি।

অবনীন্দ্রনাথের রঙ তুলি কাগজের প্যাড নিয়ে অবিনাশ ছবি এঁকে চলল। ফুল আঁকল, আঁকল গাছ-পাতা-পাখি, আঁকল কত কী! আঁকার হাত তার খুলে গেল। 'সিনারি'ও আঁকল কয়েকটা; চারপাশের।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, এবারে একটু লেখ দেখিনি। একটা কবিতা লিখে

নিয়ে আয়। কিসের কবিতা লিখবি? আচ্ছা, ওই দেখ-না, বেড়ালটা কেমন জানালার ধারে রোদ্দুরে আরাম করে ঘুমচ্ছে। লেখ দেখিনি ওই বেড়ালটাকে নিয়ে একটা কবিতা।

দেখা গেল অবিনাশ পড়াশুনা জানে কিছু। হাতের লেখাও বেশ। অবিনাশ লিখে নিয়ে এল। বেড়াল নিয়ে লিখল, অবুদাদুকে নিয়ে লিখল, শালিকপাখিও বাদ গেল না। কয়েকদিনের মধ্যে কবিতায় কবিতায় খাতা ভরে ফেলল।

তখন কী জানি, ওই অবিনাশের কথা লিখব একদিন! তা হলে তার কবিতা আর ছবি রেখে দিতাম কাছে, ধরে দিতাম আজ সবার সামনে।

অবনীন্দ্রনাথ যেন এক খেলা জুড়ে দিলেন অবিনাশের সঙ্গে। অবিনাশ এখন তাঁর নিত্যসঙ্গী; যতক্ষণ পারেন তাকে কাছে কাছে রাখেন। চা খাবার সময়ে বিস্কুট দুখানা তাকে খাওয়ান, ভাত খাবার সময়ে দই-সন্দেশের সন্দেশটি তুলে তার হাতে দেন।

অবিনাশ এখন কথা বলে, হাসে। অবিনাশ পা চালিয়ে চলে, স্নান করে, খায়; জামাকাপড় পরিষ্কার করে। এ যেন তার নবজন্ম।

এমন যার খেলার সাথী পথের সঙ্গী, তার নবজন্ম হবে না হবে কার?

একদিনের দৃশ্য জেগে আছে প্রাণের গভীরে; অবনীন্দ্রনাথ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ডাক্তারবাবু দেখে ওষুধ দিয়ে গেছেন। সারাদিন তিনি বিছানাতেই আছেন। দুপুরবেলা ঘুমবেন, দরজা-জানালার পর্দা ফেলে ঘর অন্ধকার করে দিয়ে আমি কোণাকে চলে এসেছি। অবিনাশ রইল ঘরের কোণে বসে; কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে ডাকবে আমাদের।

ঘণ্টাখানেক বাদে ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে আস্তে আস্তে গিয়ে দরজার পর্দা তুলেছি, দেখি, বিছানার কাছে অবিনাশ বসে আছে, অবনীন্দ্রনাথ হাত বাড়িয়ে অবিনাশের মুখখানি ধরে নিঃশব্দে হাসছেন, অবিনাশও তেমনি করে হাসছে তাঁর মুখের দিয়ে চেয়ে।

একান্ত নির্জনে দুজনের এই প্রাণের আদান-প্রদান, দুচোখ আমার সজল করে তুলল। বাইরে স্থির দাঁড়িয়ে রইলাম, জানি না সে কতক্ষণ।

বিশ্বভারতীতে অবিনাশ আছে। তার খাওয়া আছে, পরা আছে, ধোপা-নাপিত বইখাতা আছে। শিক্ষার ব্যবস্থা না-হয় ফ্রি করা যাবে, কিন্তু অন্ন

সব খরচ বহন করবে কে? বিশ্বভারতীর তখন টানাটানির সংসার, কর্মকর্তারা সমস্যায় পড়লেন একটি ছেলের পুরো দায়িত্ব নিতে।

খবরটা অবনীন্দ্রনাথের কাছ পর্যন্ত এল। কেউ নেই এর দায়িত্ব নেবার? বিশ্বভারতীও নারাজ? তবে?

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, এইটুকু ছেলে কত আর ভাত খাবে? কতটুকু জায়গা নেবে শুতে?

নিয়মে তখন বাঁধা আশ্রমের সকল কার্যবিধি। কর্মকর্তারা বললেন, সম্ভব নয়। এ তো এক-দুদিনের কথা নয়।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, নন্দলাল, তুমি পার না কলাভবনে এর ভার নিতে?

নন্দদা বললেন, হিসেব করে টাকা দেয় আমাকে। আপিস যদি রাজী না হয় আমি সাহস করব কোন্ ভরসাতে?

সেদিন অতি দুঃখেই অবনীন্দ্রনাথ বললেন, এই সময়েই মনে হয় আমি গরিব হয়ে গেছি।

অবনীন্দ্রনাথ কেমন চুপ হয়ে গেলেন।

নন্দদার কাছে শুনেছি, নন্দদা বলতেন, কত লোককে যে উনি টাকা দিয়ে কত সাহায্য করেছেন— কত ছেলেকে মানুষ করে তুলেছেন। বাইরের লোক কেন, তাঁর আশপাশেরও কেউ জানে না বড়ো, এ-সব কথা। প্রাণের কথা ছেড়ে দাও, তার তো তুলনা দেখি না আমি, আর হাতের কথাই ধরো— রাজা বাদশার হাত ছিল তাঁর।

একদিন বিকেলে অবনীন্দ্রনাথ বললেন, আমি যে ছবিগুলি আঁকলুম এবারে, সেগুলি বের করো তো দেখি?

বের করলাম।

অবনীন্দ্রনাথ উদয়নের সামনের বারান্দায় বসে ছিলেন, বললেন, ক-খানা ছবি আছে?

গুণে বললাম, তেইশ খানা।

বললেন, ও বাবা, অনেকগুলো হয়ে গেছে। এ দিয়ে তো একটা একজিবিশন হয়ে যায়।

উৎসাহে বলে উঠলাম, হ্যাঁ হয়ে যায়।

বললেন, আচ্ছা, এখানেই তবে একবার একজিবিশন সাজাও দেখি। দেখি কেমন দেখতে হয়।

মাউণ্ট করা নয়, ফ্রেম করা নয়; 'লুজ' ছবি। খোলা বারান্দা। একজিবিশন সাজাই কোথায়?

বললেন, ঠিক আছে। এই মেঝেতেই বিছিয়ে দাও সব।

মেঝেতে বিছিয়ে দিলাম ছবিগুলি।

বললেন, একজিবিশন কি অমনিই হয়? নাম দাও ছবির?

নাম? একখানি ছবি তুলে নিলাম, বললাম, কি নাম হবে এর?

বললেন, এ তো 'উপনন্দ'।

এ?

এ মালীর মেয়ে।

এ?

এ ভাঙাবাসা। এ রাজা, ময়ূর, শেফালি, হাকুয়া, মহাদেবের ষাঁড়, পুকুর, চড়ুই, সকাল— ইত্যাদি করে ছবির নাম হল সব কয়টির।

খুব উল্লাস আমার। একজিবিশন হচ্ছে, নাম ঠিক করছি, লিখছি।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, ছবির দাম দেবে না?

তাই তো, দামও তো দিতে হয়। একজিবিশনে ছবির নাম দাম দুটোই তো থাকে।

বললাম, দাম কত লিখব?

বললেন, দামটা তুমিই লেখো।

দাম, কত দাম দেওয়া যায়? ওঁর ছবি, দাম তো বেশি হওয়াই উচিত। অনেক ভেবে ভেবে ছবির দাম ধরলাম; পঞ্চাশ, পঁচাত্তর, আশি, একশো, দুশো, আড়াইশো; সবচেয়ে দামি হল 'মহাশ্বেতা'র ছবিখানা, তার দাম ধরলাম তিনশো।

অবনীন্দ্রনাথ নীরবে শুধু দেখতে লাগলেন, দামের বেলায় কিছুটি বললেন না।

পরে এ নিয়ে কত ভেবেছি, হায় রে, সেদিন করেছি কী আমি! ওঁর ছবির দাম ধরতে গিয়েছি, ধরেছি— পঞ্চাশ, পঁচাত্তর, একশো, দুশো? কিন্তু তিনি যে খেলা জুড়ে দিতেন, বুঝতে দিতেন না তখনকার মতো আর-কিছু।

ছবির দাম হল।

তিনি একটু হাসি হাসি, একটু গম্ভীর ভাবে বললেন, একজিবিশনে কোনো কোনো ছবির নীচে 'নট ফর সেল' দিতে হয় না? নইলে যে ছবির মান বাড়ে না।

তাও তো ঠিক। তা হলে 'মহাশ্বেতা' আর 'ঝিল', এই দুখানা ছবি থাক নট ফর সেল লেখা?

বললেন, ওই সঙ্গে 'ছুটি' ছবিটাও থাকুক-না।

বেশ, ছুটিও থাকুক।

তিনখানা ছবিতে নট ফর সেল লেখা হল।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, দেখো তো হিসেব করে কত টাকার ছবি হল?

যোগ করে কুড়িখানা ছবির দাম হল তিন হাজার দুশো টাকা।

বললেন, বেশ, একজিবিশন হল, এবারে ছবিগুলি তোলো।

ছবিগুলি তুললাম।

তিনি ছবির গোছাটা হাতে নিলেন, নিয়ে আবার আমার হাতে দিলেন। বললেন, এগুলি নিয়ে প্রতিমাকে দাও। বলো, এ হচ্ছে 'অ-বিনাশী ফণ্ড'। এর থেকেই অবিনাশের খরচ চলতে থাকবে।

দোতলার ঘরে বোঠান ছিলেন, তাঁকে নিয়ে ছবিগুলি দিলাম।

কিছুদিন বাদে অবনীন্দ্রনাথ কলকাতায় চলে গেলেন।

অবিনাশকে শ্রীনিকেতনে 'শিক্ষাচর্চায়' ভরতি করে দেওয়া হল। চলল এইভাবে কিছুকাল। পরে একদিন শুনলাম, অবিনাশ এক বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে।

আরো অনেক পরে, তখন আমি দিল্লিতে, অবিনাশ এল একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে। সে তখন পূর্ণ যুবক। ব্রহ্মচারীর পালা শেষ করে সন্ন্যাসবস্ত্র অঙ্গে ধারণ করেছে। পুরোনো দিনের সুরেই বলল আমাকে, দিদি কয়েকটা বই কিনে দিতে হবে। বেদ-বেদান্তের তিনখানা ভাষ্য বইয়ের নাম করল। দামি বই।

তারও পরে শুনলাম, অবিনাশ উত্তর-কাশীতে আছে, তপস্যা করছে।

তার জন্ত আর ভাবি না। ভাবি পরশমণির স্পর্শ পেয়েছিল অবিনাশ, তার মঙ্গল হোক।

দোল পূর্ণিমা, সকালবেলা আবীর নিয়ে গেলাম অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে। তিনি বসে ছিলেন উদয়নের পুব-বারান্দায়। বললেন, কত রঙ খেলা হয়ে গেল একটু আগে, তুমি দেখতে পেলে না।

সকালে উঠে এসে বসেছি এখানে, তখনো আলো জাগে নি, চেয়ে আছি, প্রথমে একজন একটু রঙ ছুঁয়ে দিল, খেলা শুরু হয়ে গেল। তার পর দেখতে দেখতে হোলির সে কী মাতামাতি আকাশ জুড়ে। সূর্যদেব উঠলেন, হোলিখেলা শেষ হয়ে গেল।

আনন্দে আবিষ্ট মুখ অবনীন্দ্রনাথের। যেন তিনি নিজেই হোলি খেলে উঠলেন!

আমবাগানে আজ বসন্তোৎসব। উৎসবের পরে আমরা বড়োদের পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করি, ছোটোদের কপালে আবীর মাখিয়ে দিই।

আশ্রমের সকলেই আজ অবনীন্দ্রনাথের পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করল। ছোটোদের দল শুধু পায়ে নয়, তাদের অবুদাদুর মাথা-মুখও রাঙিয়ে দিল। গানে গানে সকাল গড়িয়ে গেল।

দুপুরে খানিক বিশ্রাম নিয়ে বিছানায় উঠে বসে আছেন অবনীন্দ্রনাথ। বললেন, কী চমৎকার ধ্বনি আজ শুনলুম দুপুরে, তুমি শুনতে পেলে না। আহা, কী ডাক ডাকলে ময়ূর। ক্যাঁ-ও ক্যাঁ-ও নয়; কেমন যেন, 'ও-লো', 'আ-লো', ধরনের। কী মিষ্টি। যেন মিষ্টি গলার একটি মেয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে কাউকে। ময়ূর বলে মনেই হল না, রূপসী একটি মেয়ের রূপ ধরে এল গলার আওয়াজ। ঝিমুচ্ছিলুম, চমকে উঠলুম।

অবনীন্দ্রনাথ এসে বাইরে বসলেন। বললেন, কাগজ দাও একখানা, তোমার একটা স্কেচ করি, বসো সামনে।

একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসলাম।

পেনসিল নয়, সোজা রঙ তুলি নিয়েই স্কেচ করতে লাগলেন। মাত্র কয়েক মিনিট, স্কেচ হয়ে গেল বুঝলাম। কারণ এখন আর আমার দিকে তাকাচ্ছেন না, কাগজের উপরেই দৃষ্টি তাঁর। উঠে পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি, ঝুলে-পড়া একটা ডাল টেনে দিয়েছেন আমার মাথার উপর দিয়ে, ডালের ডগায় এক থোকা পলাশফুল এঁকেছেন আমার কপালের কাছে সিঁথি জুড়ে। লাল টকটক করছে সিঁথি সে ফুলের রঙে।

এমনিই ছিল তাঁর আশীর্বাদের ধারা ; স্নেহের প্রকাশ।

অবনীন্দ্রনাথ এ সময় ছবি আঁকতেন চোখে দেখা অতি কাছের সাধারণ বিষয়বস্তু নিয়ে। কিন্তু আঁকতে আঁকতে তাকে যে কোথায় নিয়ে তুলতেন, নাগালের কত উপরে উঠে যেত সে ছবি।

জানালার পাল্লায় একটা চড়ুইপাখি এসে বসল ; অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 'দাও একটা কাগজ, এই চড়ুইপাখিটাকে আঁকি।'

কাগজে চড়ুইপাখির দাগ পড়তে-না-পড়তে তো পাখি উধাও ; কিন্তু আঁকা হল রঙে গড়নে অতি সুন্দর করে সেই চড়ুইপাখিকে।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, এ যে ভোরের চড়ুইপাখি। রবিকা কবিতা লিখেছেন একে নিয়ে।

অবনীন্দ্রনাথ আঁকছেন আর কথা বলছেন, কথা বলছেন আর ছবিতে রঙ দিচ্ছেন। এক সময়ে দেখি সেই জানালায় বসা চড়ুইপাখি আর নেই। সেই ছোট্টপাখি বাইরের একরাশ আলোর ইশারা এনে দিয়েছে ছোট্ট ঘরটির ভিতরে।

গাধা আঁকলেন, নাথু ধোবীর গাধা রোজ যায় সামনে দিয়ে। আঁকলেন, ধোপার গাধা তো নয়, যেন বিশ্বের বোঝা পিঠে বয়ে নিয়ে চলেছে সে।

মহাদেব, সবে গ্রাম থেকে এসেছিল, গুরুদেবের খাস চাকর বনমালীর অধীনে কাজকর্ম শিখত। কাজে বুদ্ধিতে দুয়েতেই ছিল স্থূল। এই মহাদেব একটা গোরু কিনল। রোজই সে গোরুটা উদয়নের সামনে টেনিস কোর্টের কাছে লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয় ; কী, না, তার নজরে থাকবে। গোরুটা ঘুরে ঘুরে ঘাস খায় আর বাঁধানো টেনিস কোর্টে বসে জাবর কাটে।

অবনীন্দ্রনাথ দেখেন। একদিন বললেন, আজ মহাদেবের গোরুটি আঁকি!

কাচের ঘরে বসেই আঁকছেন। বলছেন, মহাদেবের গোরু, একটু ভালো করে আঁকি, নয়তো মালিক মনে দুঃখ পাবে। দাও, রঙগুলো সব এগিয়ে দাও। একটু সবুজ দাও দেখিনি ; একটু নীলও গুলে দাও। দাও এবারে ছবিটাকে একবার গামলার জলে ডুবিয়ে, একটা ওয়াশ দিই ভালো করে। একটু হলুদ রঙ দাও, এক ফোঁটা, বেশি নয়। মহাদেবের প্রিয় জিনিস— বিশেষ ভাবে তার যত্ন নিতে হয় বৈকি।

এই-সব বলছেন, আর এঁকে চলেছেন। দেখতে দেখতে মহাদেবের গোরু

টেনিস কোর্ট থেকে একেবারে কৈলাসে উঠে এল। সন্ধ্যার আকাশ, মাথার উপরে ক্ষীণ শশিকলা; নীল পাহাড়ের চূড়ার কোলে সে বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। যেন দিনের সন্ধিক্ষণে সেও কোনো এক মৌন বার্তা শুনতে পাচ্ছে কানে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, বাবা মহাদেবের ষাঁড়, এ কী সোজা কথা!

কত সময়ে দেখতাম, সাদা কাগজে যেন তিনি ছবি দেখতে পেতেন। ব্যাকগ্রাউণ্ডে শুধু একটু রঙের টাচ দিয়ে ফুটিয়ে তুলতেন সে ছবি।

দেয়ালের গায়ে ছায়া দেখলেন, বললেন, এ যে রবিকা বসে লিখছেন!

বললেন, আমরা যখন কিছু লিখি মুখে তার ছাপ পড়তে থাকে। কিন্তু রবিকাকে দেখতুম, তা নয়। মুখে কিছু প্রকাশ পেত না। যেন সবটা ভিতরে নিয়ে কলমের মুখ দিয়ে প্রকাশ করতেন। যেন একটা ইঞ্জিন, সব শক্তিটা নিজের ভিতরে নিয়ে মোটরের স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি চালাচ্ছেন। ফোয়ারার মতো কলমের মুখ থেকে সেই শক্তি সেই ভাব হুস্‌হুস্‌ করে খানিকটা বেরিয়ে গেল, কলমটি রেখে তার পর বলতেন, বলো এবার খবর কী? প্রায়ই আমি তাঁর কাছে বসে বসে তাঁকে এইভাবে দেখতুম। কী তেজে তাঁর কলম চলত; চোখের দৃষ্টি যেন ভিতরে গিয়ে সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। আশ্চর্য এক ভাব।

বললেন, দেয়ালে তো থাকবে না এ ছবি, দাও, এঁকে ফেলি।

সেই ছবি এঁকে ধরলেন।

একটুখানি কথায়, একটুখানি ইশারায়, কত বিরাটের গভীর অতলের সংবাদ এনে ধরতেন। দরজা খুলে দিতেন।

'রাজা' অভিনয় হবে, রিহার্সেল হচ্ছে, রোজ। রিহার্সেল তো দেখি রোজই। কথাগুলিও রোজই শুনি, শুনতে শুনতে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে পুরো নাটকটাই। মানে যে বুঝি না তাও নয়। মোটামুটি একরকম করে মানেও বুঝি।

কিন্তু সেদিন যখন বোঠান বললেন, ছোটোমামা, কলকাতায় অভিনয় হবে, এদের সাজ কী রকম হবে যদি একটু বলে দাও। 'সুরঙ্গমাকে' কী সাজ পরাই?

সুরঙ্গমা রানী সুদর্শনার সখী, দাসী। সুরঙ্গমা হয়েছে যে মেয়েটি সে সেদিন পরে এসেছিল সাদার উপরে কালো কালো ছোপ দেওয়া বৃন্দাবনী

শাড়ির মতো শাড়ি একখানা।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, এই তো ঠিক আছে। এর উপরে শুধু একখানি সাদা উড়নি জড়িয়ে দাও। কত পথ মাড়িয়ে এসেছে সুরঙ্গমা, কত দাগ লেগেছে গায়ে। শাড়ির কালো ছোপগুলি সেই দাগ। তার পর পথের শেষে যখন রাজার কাছে এসে গেল সে, সকল কালিমা তার শুভ্রতায় ঢেকে গেল; পবিত্র হল। সাদা উড়নিতে সেই শুভ্রতা ফুটে উঠবে, আর কিছু করতে হবে না।

সেদিন অবনীন্দ্রনাথের এই কয়টি কথায় সুরঙ্গমাকে এক নতুন আলোয় দেখতে পেলাম। সেদিন সুরঙ্গমার মুখের কথাগুলি অন্তরে উপলব্ধি করলাম।

তাঁর কথা আমি কত বলি। কী ভাবে বলি! আমি তাঁর শ্রুতিধর, তার কথা ধরাই ছিল আমার অভ্যাস। তাঁর কথা বলতে আমি পারব কী করে। তাই আমি তাঁর মুখের কথাই ধরে ধরে মেলে দিচ্ছি, তারি মধ্যে তিনি ফুটে উঠুন। সবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আমিও আবার তাঁকে দেখি।

অবনীন্দ্রনাথের স্নেহের তল ছিল না। দুই পক্ষ বিস্তার করে স্নেহাস্পদকে আড়াল করে রাখতেন। পারতপক্ষে তিনি তুচ্ছতম আঘাতটিও লাগতে দিতেন না তার গায়ে।

একদিন, উদয়নের কাচের ঘরে বসে তিনি ছবি আঁকছেন, আমি ডান দিকে তাঁর পিঠের পিছনে জানালার খাঁজটাতে বসে বসে রোজ যেমন দেখি তেমনি তাঁর ছবি আঁকা দেখছি, আর, প্রয়োজনমত ভিজে আঙুলের ডগার ছোঁয়ায় একটু-একটু রঙ ঘষে দিচ্ছি, ঘষা-কাচের প্যালেটে। বেশি করে রঙ গোলা তিনি পছন্দ করেন না। প্যালেটের উপরে রঙের কেক একটু ছোঁয়ানো হয় কি হয় না, তিনি বলে ওঠেন, ব্যস্‌ ব্যস্‌, আর না। রঙ কি নষ্ট করে কখনো? এই রঙেই দেখো কত বড়ো আকাশ হয়ে যাবে। রঙ বেশি দিলেই কি রঙ ফোটে ছবিতে? তুলির ডগায় একটুখানি রঙ নিয়ে কাগজে ছোঁয়াবে, সূর্যাস্তের রঙ পশ্চিম আকাশ ছেয়ে ফেলবে। এক ফোঁটা রঙে দেখা না-দেখার দুই জগৎ কথা কয়ে উঠবে।

আমরা শান্তিনিকেতনে ওয়াল-পেন্টিং করি, টেম্পারা ছবি আঁকি, বাটি ভরা ভরা রঙ আগে গুলে তৈরি করে নিই। থক্‌থকে রঙ লাগাই ছবিতে।

তাই অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে রঙ দেওয়া দেখে অবাক হই। ছবিতে রঙই নেই, তবু যেন কত রঙ; কত গভীর তার ইশারা।

এদিনও রোজকার মতো পিছন দিকে বসে বসে তাঁর ছবি আঁকা দেখছি। তিনি আঁকছেন বর্ষার ছবি একটি। একটি জলাশয়, পাড়ে ঘাস, গাছ। বর্ষার ধারায় আকাশে জল মাটি, প্রায় এক আবরণে ঢাকা।

বললেন, এ হল 'লালবাঁধ'।

লালবাঁধ হল এখানে খোয়াইয়ে বাঁধ দিয়ে আটকানো বৃষ্টির জল। কয়েক বছর এ ভাবে বৃষ্টির জল আটকে রাখাতে পলিমাটি পড়ল। জল আর শুকিয়ে যায় না, মাটি শুষে নেয় না। এখন সেই আটকানো জলে দিব্যি পুকুর হয়ে গেছে। নাম দেওয়া হয়েছে লালবাঁধ।

থেকে থেকেই মনে ব্যথা জাগে, গুরুদেব যদি দেখে যেতে পারতেন এই লালবাঁধ। আশ্রমের জমিতে মহর্ষির আমল থেকে পুকুর খোঁড়া-খুড়ি হয়েছে কত। মাটি উঠে পাড়ে পাহাড় হয়েছে, কিন্তু জল ওঠে নি এক ফোঁটা। আশ্রমে এই জলভরা পুকুর দেখলে কত খুশি হতেন গুরুদেব। ছেলেরা এখন লাফ-ঝাঁপ করে এই লালবাঁধে। রাঙামাটি ধোয়া লাল জল টলটল করে কানায় কানায় প্রতি বর্ষায়।

আজ সকাল থেকে এই বর্ষার ছবিখানি আঁকছেন অবনীন্দ্রনাথ, আর আমি দেখছি। নিঃশব্দ ঘর। অবনীন্দ্রনাথ ছবিখানি গামলার জলে ডুবিয়ে কোলে রাখা বোর্ডের উপরে তুলে ফ্ল্যাট-ব্রাশ দিয়ে তাতে বর্ষার ওয়াশ দিচ্ছেন, আর শুকনো তুলি দিয়ে ভিজে রঙ তুলে তুলে জল, জলের ধারের ঘাস একটু একটু ফুটিয়ে তুলছেন। প্রায় শেষ হয়ে এল ছবিখানি এমন সময়ে তাঁর এক নিকটজন দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন, ঘরে ঢুকবেন।

অবনীন্দ্রনাথ পলকে কোল হতে ছবিসমেত বোর্ডটা হাতে তুলে ধরে যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, আর পারি নে; নিজে কিছু করবে না কেবল আমাকে খাটিয়ে মারবে।

আমি একেবারে হতবাক ও হতভম্ব হয়ে গেলাম। এক মুহূর্তে এ কী পরিবর্তন!

অবনীন্দ্রনাথ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। বোর্ডটা এগিয়ে ধরে বললেন, নাও ধরো। যা হয় নিজে ঘরে গিয়ে করো। আমাকে আর জ্বালিয়ো না।

অবনীন্দ্রনাথ ধমকে উঠলেন, দাঁড়িয়ে আছ কি? যাও, যাও এখন— যাও বলছি।

দুঃখে ব্যথায় আমি যেন চলার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। তিনি তাড়া লাগালেন। আমি বোর্ডখানা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে কোণার্কে এসে রেখে দিলাম।

কী করি এখন! কিছুতেই ভেবে পাই না তিনি আমার উপরে এত চটে উঠলেন কেন? কখনো তো এমন হয় নি।

তিনি কেন বললেন, 'নিজে কিছু করবে না, কেবল আমাকে খাটিয়ে মারবে'। তবে কি তিনি ছবি আঁকতে আঁকতে ভুলে গিয়েছিলেন যে, এ ছবি ওঁরই ছবি, উনিই আঁকছিলেন? অবশ্য এর আগেও এমন হয়েছে, ছবি এঁকে নিয়ে গেছি, তিনি খুশি হয়ে তাতে রঙ দিয়েছেন ওয়াশ দিয়েছেন, ফিনিশ করেছেন; নিজের আঁকা ছবির মতোই তাতে তন্ময় হয়ে গেছেন। কিন্তু এবার তো তা নয়। আর, যিনি এখন ঘরে এলেন তিনিই-বা ভাবলেন কী! সত্যিই কি অবনীন্দ্রনাথকে জ্বালাতন করি ছবি নিয়ে?

দুঃখ লজ্জা আতঙ্ক অভিমান সব যেন সমানভাবে বুক অধিকার করে বসল।

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গ, দুর্লভ সঙ্গ। ঠিক করে আছি যতদিন তিনি আশ্রমে থাকবেন, ঘর-সংসারের ঝঞ্ঝাট রাখব না বেশি। যতটা পারি তাঁর কাছে কাছে থাকব। আশ্রমের রান্নাঘর হতে দুবেলা খাবার আনাবার ব্যবস্থা করে রেখেছি— সেই খাবারই খাই। রান্নাবান্নার হাঙ্গামা করি না। প্রচুর সময় বাঁচে। সংসারের আর যা কাজ ঝট-পট সেরে ফেলি ভোর না হতে। তার পর দিনের মতো তৈরি হয়ে উদয়নে যাই, অবনীন্দ্রনাথের কাছে কাছে থাকি।

সেই তিনি অসন্তুষ্ট হলেন আমার উপরে। কী করি! ঘরে মন টেঁকে না। বাইরে আসি। মেহেদি বেড়ার লাইন ধরে বাড়ির সীমানায় ঘুরি। কচি কচি লালপাতার মেহেদির ডগা নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে লাল পিঁপড়ের মতো টুকরো টুকরো করি। পথের কাঁকরগুলোর উপরে পায়ের চাপ দিয়ে দিয়ে শব্দ তুলে তুলে পা ফেলি, পা তুলি।

কোণার্ক, উদয়ন— হাত-চল্লিশেক পথ দুবাড়ির মাঝখানে। কখন

একসময়ে দেখি তাঁর সেই কাচের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

যিনি এসেছিলেন তিনি চলে গেছেন। অবনীন্দ্রনাথ একা ঘরে। সেই কৌচেই বসা। দু পা সামনের দিকে ছড়ানো, মুখে জলন্ত চুরুট। দৃষ্টি নিমীলিত।

দরজা বরাবর মুখ করা তাঁর কৌচ, ঘরে ঢুকতে এলেই একেবারে তাঁর সামনাসামনি এসে দাঁড়াতে হয়। দরজায় দাঁড়িয়ে ভাবছি, আমাকে দেখে কি রাগ করবেন?

কই, রাগ তো করছেন না। বোধ হয় দেখতে পান নি। চোখ তো বোজা।

আমি অতি সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে তাঁর পিছন দিকে জানালার ধারে আমার নির্ধারিত স্থানটিতে গিয়ে বসতে যাব, তিনি মুখের চুরুট হাতে নিয়ে বলে উঠলেন, কই নিয়ে এসো ওটা, সই করা হয় নি যে।

তাঁর ঠোঁটের কোণায় মৃদু একটি কৌতুক-হাস্যরেখা।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে যেন হাওয়ায় উড়ে এলাম কোণার্কে। আনন্দ, এ আনন্দ রাখবার যেন ঠাঁই নেই আমার। এ আনন্দ আমি জানাই কাকে?

ছবিখানি নিয়ে আমি আবার এলাম কাচঘরে। সই করে দিলেন নিজের নাম ছবির কোণে অবনীন্দ্রনাথ। ছবিতে শিল্পীর সই না থাকলে ছবি সম্পূর্ণ হয় না, ছবির সেই মূল্য থাকে না।

তিনি আমাকে এই ছবিখানি দেবেন, এই ছিল তাঁর মনে। তাই তাঁর এই অভিনয়।

অনেকদিন পরে আবার ছবি আঁকছেন অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর আঁকা ছবি মূল্যবান সম্পদ। স্কেচ তিনি অনেককে দিয়ে দেন; কিন্তু ছবি হাতছাড়া হয়, তা হয়তো আপনজনরা চান না। তাই তাঁদের অসন্তোষ হতে বাঁচিয়ে রাখলেন আমাকে। তাঁরা বড়ো জোর জানলেন, রানী ওঁকে বিরক্ত করে মাঝে মাঝে।

অবনীন্দ্রনাথের সব কথা পর পর গুছিয়ে লেখা যায় না। স্রোতের মুখে যেমন আসে, যেমন বাঁক ঘোরে, বিশ্রাম নেয়, তেমনি ভাবেই লিখছি তাঁর কথা। কত সময়ে পরের কথা আগে চলে আসে, আগের কথা পরে উঁকি মারে।

সে সময়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ি বিক্রি হবার কথা চলছে। অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'তুমি যে কাঠ-কাট্‌রা ডালপালা দিয়ে গিয়েছিলে তা সমস্ত নিঃশেষ করেছি; খালি ঝুড়িটা বাকি আছে। আর্টে এর নাম 'ছাগবৃত্তি'।

'আমাদের এ বাড়িটা আর এই বাগান বিকিয়ে গেলে আমার কী দশা হবে! ডালপালা সেখানে বাসাবাড়িতে কেমন করে পাব এই এক বিষম ভাবনা হয়েছে। শেষে বাসাবাড়ির কড়িকাঠ চৌকাঠ। কিন্তু তা যদি লোহার আর কংক্রিটের হয় তবে পুতুলের ফুলুরিভাজার কাজ ছাড়তে হবে বোধ হচ্ছে। প্রভু কি এমন অবিচার করবেন?'

জোড়াসাঁকোর বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। বেলঘরিয়ায় গুপ্তনিবাস বাড়ি নেওয়া হল। বাগান, পুকুর— সব নিয়ে মস্ত সেই বাড়ি। দোতলায় প্রায় তেমনি চওড়া দক্ষিণের বারান্দা।

অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'সারাদিন বারান্দায় রোদের তাতে বসে রেলগাড়ি যাচ্ছে আসছে দেখি। আমার বাড়িমুখো গাড়ি আর আসবে না আমাকে নিয়ে যেতে।

'এই বাড়ির পুকুরধারটি ঠিক আমাদের জোড়াসাঁকোর বাল্যকালের পুকুর-ধারের মতো দেখায়। এক-একবার ভুল হয়ে যায় যেন ছেলেবেলার দিনগুলো ফিরে এসেছে। এই মজাটুকুই যথেষ্ট মনে করি।

'গল্পের দিন কি আর ফিরবে? বোধ হয় তো আর সে বারান্দাও পাব না, সে হাওয়াও পাবে না মনের খেয়ানৌকোটা।'

গুপ্তনিবাসে এসে 'মাসি' নামে একটি গল্প লিখলেন অবনীন্দ্রনাথ। মার বাড়ি থেকে মাসির বাড়ি এসেছেন, মার বাড়ি ছেড়ে আসার দুঃখ মাসির আদরে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে আসার বেদনা অনেকখানি ঢেলে দিয়েছেন এই লেখাতে। দিয়ে যেন খানিকটা হালকা হলেন।

'মাসি'কে আমাদের পড়তে পাঠিয়ে তিনি কুটুম-কাটাম গড়তে মন দিলেন। দিনকয়েক পর লিখলেন, 'মাসিমাকে তোমাদের কাছে পরিচিত করে দিয়ে আমি খালাস। মাসিকে তোমাদের ভালো লেগেছে জেনে সুখী হলাম।

'এখন আমার কুটুম-কাটামরা নাম নম্বর আর টিকিটের জন্য দরবার করছে। মিলাডা তাদের কারো গালে, কারো বুকে, কারো পেটে আঠা

দিয়ে নম্বর টিকিট এঁটে দেওয়াতে তারা আমার কাছে নালিশ জানায়। আমি তাদের হয়ে মিলাডাকে একটু এ বিষয়ে সজাগ করে দিতে গিয়ে মিলাডাকে চটিয়ে বসে আছি। সে আর নম্বরও দেয় না, নামও লেখে না। আমার খোরাক পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে।'

মিলাডা অবনীন্দ্রনাথের আদরের নাত-বউ। এ-সব কাজে মিলাডাই সাহায্য করে তাঁকে। গল্প করে, সঙ্গ দেয়; নানারকম সুস্বাদু কেক বিস্কুট করে খাওয়ায়। মিলাডার হাতের কেক খেতে খেতে তারিফ করেন তিনি।

কুটুম-কাটাম অনেক করে ফেলেছেন অবনীন্দ্রনাথ। অনেক বিলিয়ে দিয়েও তখনই প্রায় পাঁচশো কুটুম-কাটাম তাঁর কাছে ছিল। পরে তো আরো করেছেন। সব মিলিয়ে হাজারখানেক তো হবেই।

সবাই বলেন, এদের একটা হিসাব রাখা দরকার, নাম পরিচয় থাকা প্রয়োজন। কিন্তু কুটুম-কাটামের গায়ে ছিটেফোঁটাও কিছু সহ্য হয় না তাঁর। অথচ সকলের তাগিদ, একটা কিছু করা চাই হিসাব রাখবার জন্য। এদের গায়ে টিকিট লাগাতে হবে, ভালো একটা জায়গায় এদের সুরক্ষিত করতে হবে।

তিনি লিখলেন, 'কুটুম-কাটাম তো বড়ো কম নয়, পাঁচ শত তো খুব হবে। এত টিকিট কে জোগায়? তাই আমার সেক্রেটারিকে অফিসিয়াল অর্ডার দিচ্ছি, ট্রামের কিংবা রেলের টিকিটের মাপে হাজারখানেক টিকিট পাঞ্চ করিয়ে যেন সেখান থেকে পাঠান। আমি এখানে বসে কুটুম-কাটামদের নামকরণ করে টিকিট গলায় বেঁধে দিয়ে 'মামাসি ইনস্টিটিউটে' পাঠাব, যেখানে জুজুপূজার ভয় নেই। 'মিস মামাসি' এখানে এসে অপেক্ষা করছেন তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে। টিকিটগুলো 'পিঙ্ক' 'গ্রীন' হয় যেন, সাদা টিকিট চলবে না। রানী, দেখো, এতে যেন আমার ফণ্ডে বেশি টান না পড়ে। মামাসি ইনস্টিটিউট দেখো নি? এবারে সেইখানের গল্প লিখব, শীঘ্রই পড়তে পাবে।'

সেক্রেটারি সেই টিকিট তৈরি করে পাঠালেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর বাঁধলেন না কুটুম-কাটামের গায়ে। তাদের নিয়ে সেইভাবেই রইলেন, তারাও তাঁকে ঘিরে থেকে গেল।

এই সেক্রেটারি ছিলেন আমার স্বামী। গুরুদেবের পর অবনীন্দ্রনাথ

যখন আশ্রমের আচার্যদেব হলেন, তিনি আরজি পেশ করলেন তাঁর কাছে। বললেন, আমি গুরুদেবের সেক্রেটারি ছিলাম, আপনিও সেই কাজে আমাকে বহাল রাখেন, এই আমার প্রার্থনা।

অবনীন্দ্রনাথ চুরুটে একটা টান দিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, বেতন ?

স্বামী বললেন, ছমাস অন্তর একখানি ছবি।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, মঞ্জুর।

এই বেতন তিনি নিয়মিত দিয়ে যেতেন সেক্রেটারিকে। প্রতি ছবির নীচে লেখা থাকত— 'খাসনবিসকে'। কখনো কখনো কৌতুকও করতেন, ছবি নিয়ে খাসনবিসের সঙ্গে।

একবার একখানি ছবি আঁকলেন, সুন্দরী একটি মেয়ের মুখ, অনেকটা ইরানী মেয়ের মতো, মাথায় ঘোমটা ; তার মুখ কপাল চোখ একটু একটু দেখিয়ে বাকিটা সব ঢেকে দিলেন জাপানী ধরনের একটি হাতপাখা সামনে এঁকে দিয়ে। ছবির চোখ চেয়ে আছে, যে দেখছে তারই দিকে। দুপক্ষ হতেই যেন কৌতূহল। ছবি যে দেখছে তার কৌতূহল জাগে রূপসী কন্যার পুরো মুখখানি দেখতে, আর ছবির মুখও চায়— কে তাকে দেখছে আড় চোখে তা দেখে নিতে।

এবারের ছবিখানা তিনি নিজের হাতে দিলেন না খাসনবিসকে। আমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন বেতন। একটু চাপা হাসি হেসে বললেন, যাও, দাও গিয়ে তাকে।

অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে মজা পেতাম নানা রকমে।

অবনীন্দ্রনাথ ভালো কাগজে ছবি আঁকবেন না কিছুতেই। ভালো কাগজ দিলে বিরক্ত হন, রাগ করেন। বলেন, 'না, না, এ কাগজ রেখে দাও। আমাকে টুকরো-টাকরা কিছু দাও।'

পুরোনো, পোকায়-কাটা, দাগধরা, এইরকম কাগজই তাঁর পছন্দ। অথচ মন সায় দেয় না, তিনি ওই বাজে কাগজে ছবি আঁকেন।

নানা সাইজে ছবির কাগজ কেটে রেখে দিয়েছি। যেদিন যেমন ছবি আঁকবেন সেইরকম সাইজের কাগজ বের করে দিই। প্রায়ই পরিষ্কার ভালো কাগজ নিয়ে হাঙ্গামা হয়। কাগজ ফিরিয়ে দেন। প্রায়ই সেই কাগজ নিয়ে

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি, কাগজখানা একটু দুমড়ে-মুচড়ে ধুলো লাগিয়ে নিয়ে ধরি, তিনি পেয়ে খুশি হন। মনের আনন্দে তাতে ছবি আঁকতে শুরু করে দেন। বলেন, হ্যাঁ, এই তো, এইরকম কাগজই আমায় দিয়ো। ওই-সব ভালো ভালো কাগজ রেখে দাও, তোমরা ছবি আঁকতে পারবে তাতে।

এ নিয়ে আড়ালে আমরা হাসাহাসি করি। শুনে শোভনলাল বললেন, 'এ হচ্ছে যেন সেই গল্পের মতো। দাই বলল, ভাঙা প্লেট চাই, ভাঙা প্লেট পাওয়া গেল না, আস্ত প্লেট ভেঙে দিল। বলুন-না দাদামশায়কে বলতে, সেই গল্পটা।'

সন্ধেবেলা অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শোবার ঘরে চোখ বুজে কৌচে হেলান দিয়ে বসে আছেন, আমরা জনাকয়েক ঘরে জটলা করছি। ভাঙা প্লেটের কথা উঠল আমাদের। অবনীন্দ্রনাথ বললেন, ও তো হল গিয়ে ছোট্দাদামশায়ের গল্প। ছোট্দাদামশায় চিরকাল 'পেলেটে' খেতেন। বলি নি তার গল্প? সেই যে 'গেট কোথায় গেল' বলে মহা চেঁচামেচি। সেই তিনি বসে আছেন সন্ধেবেলা কৌচে এমনি আরাম করে। বাড়িতে নাতি হয়েছে খবর এসেছে কানে; মহাখুশি। ছেলের চোখে কাজল পরাবে, আঁতুড় ঘর থেকে দাই হাঁকছে, 'ওগো, আমায় একটা ভাঙা পেলেট দাও, কাজল পরাব'।

চাকরবাকর খোঁজাখুজি করে হয়রান। ভাঙা পেলেট আর খুঁজে পায় না। ও দিকে আঁতুড় ঘর থেকে দাই হাঁক পাড়ছে ক্রমাগত। ছোট্দাদামশায় বসে বসে শুনছিলেন সব। তাঁর খাস চাকরও ছোটাছুটি করছে ভাঙা পেলেট খুঁজতে।

ছোট্দাদামশায় বললেন, 'আঃ, একটা গোটা পেলেট ভেঙে দাও-না, ভাঙা পেলেই তো হল। অত ছোটাছুটি হৈচৈ-এর দরকার কি?'

তাই করা হল। একটা ভালো পেলেট ভেঙে আঁতুড় ঘরে পাঠানো হল। দাই তাতে কাজল পেড়ে ছেলের চোখে পরাল।

অবনীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে হাঁপানিতে কষ্ট পেতেন। বলতেন না। দেহের আলোচনা পছন্দ করতেন না। বলতেন, ও ভেবে কী হবে, থাক্-না, যেমন আছে।

একবার বোঠান ডাক্তারবাবুকে খবর পাঠালেন। ডাক্তারবাবু এলেন, ইনজেকশন দেবেন। অবনীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। 'ও আছে, আমি

আছি ; বেশ আছি। কেন ফুঁড়ে ফেড়ে ওকে খামকা উত্ত্যক্ত করা'— বলে ছোটো ছেলেকে মা যেমন ঘুম পাড়ায় হাত চাপড়ে চাপড়ে, তেমনি মৃদু হাতে হাত চাপড়ালেন আপন বুকে।

বললেন, ওর সঙ্গে আমার বরাবরের বোঝাপড়া, আমিও কিছু করব না, ও-ও আমাকে বেশি কিছু করবে না। আমি ভুলে যাই, তাই মাঝে মাঝে আমার মন কাড়ে ও এমনি করে। তোমরা এ নিয়ে ভাবনা কোরো না। যাও।

স্নান করা নিয়ে ছিল তাঁর শিশুর মতো ওজর-আপত্তি। জামাকাপড় একবার ছাড়ো, আবার পরো, এ ছিল এক মহা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার, তাঁর কাছে। সব চেয়ে জ্বালাতন বোধ করতেন স্নানের পরে ধোয়া গেঞ্জিটাকে গায়ে দিতে। বলতেন, রোজ রোজ গেঞ্জিটাকে কেন যে ধুয়ে দেয়? ধোবার কি প্রয়োজন? গায়ে-দেওয়া গেঞ্জিটাই তো ফিরে আবার পরতে ভালো ; ঢিলেঢালা হয়ে বেশ গায়ের মাপে হয়ে থাকে। তা নয়, রোজ ধোয়া গেঞ্জি পরো ; আঁটআঁট হয়ে বুকে চেপে ধরে।

খাওয়া— খাওয়াও তাই। যেন এক বিড়ম্বনা-বিশেষ। গরম চা কফি পেয়ালা থেকে পিরিচে ঢেলে তড়িঘড়ি কোনোরকমে খেয়ে শেষ করতেন। খানিক লুঙ্গিতে পড়ত, খানিক বুকের উপরে পাঞ্জাবিতে পড়ত, পড়তে পড়তে দাগ হয়ে যেত জামাকাপড়ে চা-কফির।

খুবই স্বল্পাহারী ছিলেন তিনি। আশ্রমে যখন থাকতেন. রোজই তাঁর খাবার সময়ে উপস্থিত থাকতাম। একমুঠো ভাত, তাই নাড়তে থাকতেন ; এক-একদিন বলতেন, দাঁড়াও, আজ আমি একটু রান্না করি। রান্না কি কেবল রান্নাঘরেই হয়? ভাতের থালাতেও হয়। বলে, পাথরের থালায় ভাত কয়টা ঝোল ঢেলে মাখলেন, বললেন, আর একটু নুন দিই এতে, এর সঙ্গে। একটু ডালও মেশাই, দেখো-না পাথরের থালার উপরে কেমন রান্না করি আমি। মাছভাজাও একটু মিশিয়ে দিই, কী বলো? এবারে একটু লেবুর রস দিই ; বলে গন্ধ লেবুর ফালি থেকে রস টিপে নিলেন। বললেন, এ হচ্ছে কলম্বা লেবু। এ কি যে সে জিনিস! এই কলম্বা লেবুই আমাদের 'মটো'। জানো তো সে ব্যাপার? রোসো, খাওয়াটা শেষ করে নিই।

বললেন, শোনো তবে, আদিপুরুষের কথা শোনো। পাঁচটি ব্রাহ্মণ

এলেন। কেন এলেন? এ দেশে তখন ভালো ব্রাহ্মণ নেই।

আদিশূর রাজা হয়েছেন, মস্ত রাজবাড়ি, সেই রাজবাড়ির চুড়োয় শকুনি এসে বসল। মহা আতঙ্ক। পণ্ডিত ডাকালে, লক্ষণ ভালো নয়। সে আজ কতকাল আগের ঘটনা, কতকিছু ঘটে গেছে; ইতিহাস ঘাঁটলে পাবে সব-কিছু। সে-সব বাদ দাও।

তা এখানে এই দুর্ঘটনা হল। রাজারানী ভেবে অস্থির। কী করা যায়। শাস্ত্রে আছে— শাস্ত্রমতে যজ্ঞ করতে হবে। কে যজ্ঞ করবে? সে-রকম ব্রাহ্মণ নেই। হুকুম হল, 'যাও কান্যকুব্জ থেকে পাঁচটি ব্রাহ্মণ আনাও।' সেই পাঁচ ব্রাহ্মণ এলেন, ক্ষিতীশ, সুধানিধি,··· ও বীতরাগ। তাঁরা কি এমনিই আসবেন? তল্পিতল্পা বয়ে নিয়ে এল ঘোষ বোস মিত্র দত্ত···।

যাগ-যজ্ঞ হল। রাজা বললেন, এখানেই থাকুন, আর কেন? সেই বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ এলেন। রাজা জমিজমা দিলেন। তার মধ্যে গুড়-গ্রামে ধীর নামে আমাদের পূর্বপুরুষ 'সেট্‌ল্‌' করলেন। তাঁর বংশধর 'কনকদণ্ডী'; কাশী গিয়ে মস্ত দণ্ডী হলেন, নাম হল কনকদণ্ডী রঘুপতি আচার্য। সোনার লাঠি বকশিশ পেয়েছিলেন কাশীতে।

কনকদণ্ডীর কথায় শোনো আর-এক কথা। মহর্ষি গল্প করতেন, 'কাশীতে গেলুম, ঘুরে ঘুরে বেড়াই, কাশী দেখি। সোরগোল হয়ে গেছে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বড়োছেলে এসেছে। প্রথমে 'পিরালি' বলে তত আমল দেয় না। একদিন আমি মতলব করলুম, বামুনদের একটা সভা করতে হবে। মানমন্দিরে বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের নিয়ে বিচারসভা বসালুম। প্রথমে গাঁইগুঁই, পরে ফলার খাইয়ে এক-একখানা কম্বল আর টাকা বিদায় যখন দিলুম তখন খুব খুশি। তখন সব জয়জয়কার দিলে।'

মহর্ষি বলতেন, 'তার পর পুরোনো বিশ্বেশ্বরের মন্দির দেখব, মুসলমানরা তা তখন মসজিদ করেছে। সকালে উঠে গেছি, ঢুকতে যাব, মোল্লারা বললে, 'জুতো খোলো।' আমি তখন হাফেজের বয়েত্‌ আওড়ে দিলুম। শুনে তখন সবাই 'আসুন আসুন, আপ তো হাফেজ হ্যায়, হাফেজ হ্যায়', বলে সাদরে আমাকে নিয়ে গেল।'

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, দেখো, ওই যে কনকদণ্ডী পেয়েছিলেন, তারই বংশধর আর একবার গিয়ে কাশী জয় করে এসেছিলেন। দু-রকম করে

জয় করলেন, হাফেজের বয়েতের জোরে মুসলমান জয় করলেন, আর পয়সার জোরে করলেন পণ্ডিত জয়।

বললেন, এবার শোনো সেই আমাদের পূর্বপুরুষের কথা। কিছু বাদ দিয়ে কামদেব থেকেই শুরু করি। অত আগে গিয়ে দরকার কী। কামদেবরা চার ভাই, কামদেব, জয়দেব, রতিদেব আর শুকদেব। চার ভাই তো বেশ বসে আছেন যশোরে। মস্ত জমিদার, দিব্যি সুখে আছেন; অগাধ বিষয়ের মালিক।

এমন সময়ে এলেন খান জাহান আলি যশোরের সনদ নিয়ে নবাবের কাছ থেকে। তিনি এসে কোর্ট বসালেন। কামদেব জয়দেব ওঁরা সবাই সেখানে আসা-যাওয়া করেন, সুন্দরবন কাটাতে হবে। জাহান আলির দেওয়ান তাহের-এর অধীনে কামদেব ও জয়দেব কাজ করতে লাগলেন।

এখন হয়েছে কী, তখন ছিল রোজার সময়। সারাদিন বাদে সেই রাত্রিতে খাওয়া। একদিন সকালে তাহের বাগানে বেড়াচ্ছেন চৌধুরী বংশের কামদেব আছেন সঙ্গে; গাছে চমৎকার লেবু হয়ে আছে, মালী গাছ থেকে কয়েকটা কলম্বা লেবু তুলে এনে ধরল সামনে। শুনেছি, পূর্বপুরুষ বলতেন 'এই কলম্বা লেবু— এইতেই আমার সর্বনাশ'।

অতি সুগন্ধি লেবু; দেওয়ান সাহেব একটি হাতে তুলে শুঁকলেন, শুঁকে কামদেবের হাতে দিলেন, 'কামদেব, লেও ভাই সাহেব।'

এখন কী দুর্বুদ্ধি, দৈবঘটন যখন হয় কেউ ঠেকাতে পারে না। তাহের আলি আগে ছিলেন ব্রাহ্মণ, তাই খোঁচা দিতে গেলেন, কামদেব বললেন, 'ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনম্'। ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন হয়, তা আপনার তো রোজার বিঘ্ন ঘটল খাঁ সাহেব।

তাহের গম্ভীর; কিছু আর বললেন না। তার পর ঈদের দিন, রোজা ভঙ্গের দিন; সাজগোজ করে দরবারে বসেছেন। সবাই উপস্থিত।

আগে হতেই বলে রেখেছিলেন, এমন রান্না রাঁধবে যে 'খানে কী খুশ্‌বু সে তামাম দরবার ম-আত্‌ত্‌র্‌ হো জায়েগা'। সেইরকম রান্না করে ঢাকা দিয়ে রেখেছে পাশের ঘরে। জলসা, নাচ, তামাশা হচ্ছে; সেই সময়ে খানসামা খাবারের ঢাকন, 'সরপোশ' খুলে ফেলল। এখন ওই গন্ধ তো ঢাকবার জো নেই। সবাই নাকে কাপড় দেয়।

খাঁ সাহেব বললেন, ভাইসাহেব, ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন তো হল?

কামদেব বললেন, হ্যাঁ।

খাঁ সাহেব বললেন, এ-যে সব নিষিদ্ধ মাংস!

কামদেব বললেন, হ্যাঁ।

তবে?

তবে জাত গেল দুই ভাইয়ের। দুই ভাই ছিলেন সেখানে। সত্যবাদিতার এই পুরস্কার পেলেন।

দুই ভাইয়ের নাম হল জামাল খাঁ আর কামাল খাঁ। খাঁ মহম্মদ তাঁদের জায়গীর দিলেন।

অন্য ভাইরা রতিদেব, শুকদেব— এই দুই ভাইয়ের জন্য সমাজে পতিত হলেন। ব্রাহ্মণ থেকে তাঁরা 'পিরালি' হলেন।

এখন, এই পিরালি বামুনের ঘরের মেয়েদের আর বিয়ে হয় না। শুকদেবের ভগ্নীর বিয়ে তো কোনো রকমে হয়ে গেল, লক্ষ টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে। জানি নে তাঁর নাম। জানার মধ্যে এসে গেলেন, কুশারী, বড়ো সহজ বংশ নয়। চৈতন্যদেবের বংশ।

শুকদেব মেয়ের বিয়ে নিয়ে ভাবছেন। এ অভিজ্ঞতা আমারও হয়েছে। এই মেয়ের বিয়ের ভাবনা আমাদের পূর্বপুরুষও ভেবেছেন। টাকা থাকলে কী; পিরালি গন্ধ, সেই কলম্বা লেবুর গন্ধ ঢাকে না কিছুতেই। সুন্দরী মেয়ে। যশোরের মেয়েরা সুন্দরী ছিল। তাদের বলত 'ছোটো বিলেত'।

তখন বেরিয়েছেন ও দিকে জগন্নাথ কুশারী; ভৈরব নদী বেয়ে বোট আসছে। বাপ মস্ত জমিদার। জমিদারের ছেলে জমিদারি দেখতে বেরিয়েছেন। নামেই বুঝতে পারছ ভৈরব নদী। বিকেলের দিকে ঘনঘটা মেঘ, ঝড় উঠল। লাগা, লাগা, বোট লাগা। বোট এসে লাগল কালীবাড়ির ঘাটে। এখনো আছে সে ঘাট। সেই ঘাটে রশারশি দিয়ে বাঁধা পড়ল জীবন-তরণী।

কালীমন্দিরে বসে আছেন জগন্নাথ কুশারী। খবর পেয়ে শুকদেবের লোক গিয়ে তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করে নিয়ে এল বাড়িতে। যে মহলে তাঁকে থাকতে দেওয়া হল সে মহল ছিল অন্দর-মহলের লাগাও। পাশে পুকুর, ফুল-বাগানে ঘেরা।

বাড়ির মধ্যে খবর এল। আর হাতছাড়া নয়; একেবারে বিবাহ। সব ঠিক করো। মেয়ে একবার দেখাও। মেয়ের মা ভেবে মরেন, স্বামীকে বলেন,

ওগো, তুমি—

স্বামী বললেন, আঃ, সে-সব ঠিক আছে।

চার দিকে সুব্যবস্থা, পাখি না পালায়।

অন্দরে মেয়েদের মধ্যে বলাবলি হচ্ছে, এইবার ঠাকুরঝির বর এল। আহা একেবারে কন্দর্প!

সারারাত সকলের ভাবনা।

এ দিকে ঝড়বৃষ্টি, ও দিকে এই-সব চক্রান্ত। সাজসজ্জা সব ঠিক হচ্ছে।

সকালে মেঘ কেটে একটু ফরসা হয়েছে। দিয়েছে মেয়েকে ছেড়ে ফুলবাগানে পুকুরের ধারে। মেয়ে ফুলবাগানে ফুলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর জগন্নাথ কুশারী জানালায় বসে বসে দেখছেন। জগন্নাথের মাথা ঘুরে গেল রূপ দেখে। ঘটক আছে কানের কাছে—কেমন, পছন্দ হয়?

গালে হাত দিয়ে ভাবছেন কুশারী, 'বাবা আছেন'।

আরে, রাখো সে-সব। তোমার কি মনে হয়?

আর কি! সেইদিন রাত্রেই ধরে এনে হাতে সুতো বেঁধে পিঁড়ি বদল করে দিলেন ছেড়ে।

ঝড়বৃষ্টি থামল। খবর পৌঁছল বাপের কাছে। বাপ বললেন, ও ছেলে যেন আর আমার এদিকে না আসে।

কুশারী বংশ বড়ো বংশ; বড়ো কুলীন।

সে সময়ে এই পিরালিদের নিয়ে কত গানও বেঁধেছে লোকেরা।

পিরুলিয়া গ্রামে যত পিরালির বাস,
ব্রাহ্মণের ছেলে ধরে করল সর্বনাশ।

শুকদেব বললেন, 'বাপ ত্যাজ্যপুত্র করলেন, তা ভাবনা কি? এইখানেই আমি জমিজমা বাড়িঘর সব-কিছু দিচ্ছি।'

এই ভিটে এখনো আছে। সেই ভিটেয় উঠলেন আমাদের আদ্যিকালের আদ্যিদিদিকে নিয়ে জগন্নাথ কুশারী। ঝড়েতে বেঁধে দিল পূর্বপুরুষের দাদাকে; বোট দুলতে দুলতে ঝড়ের মুখে ভেড়ে এল।

হয় যখন এমনি হয়।

রূপোর জোরে ভগ্নীর বিয়ে হল, আর রূপের জোরে মেয়ের বিয়ে।

আর এই কলম্বালেবুর ঘ্রাণ টেনেই যত বিপদ হল।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, আর্টিস্ট চলে মনের আনন্দে। নদীর চলা হচ্ছে আর্টিস্টের চলা।

বললেন, অল্পেতে বিচলিত হলে চলবে না। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও। তালগাছ, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ঝড়ঝঞ্ঝা সয়ে। বনস্পতি হও। দেখো-না ছোটো গাছগুলি কেবলই আঁকড়ে ধরবার জন্য হাত বাড়ায়। কারো উপর ভর করে উঠতে চায়। নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি নেই তার, অল্প একটু হাওয়া লাগলেই পড়ে যায়। তা হবে কেন? রসের ফোঁটা পেতে শেখো। এ না পেলে তো আর কী পেলে। পৃথিবী তো এত বড়ো, এত তো সায়েন্স বেরিয়েছে; কিন্তু সেই উপর থেকে রসের দু-চার ফোঁটা না পড়লে সব শুকিয়ে যায়। তাই রবিকা বলতেন, রসের সমুদ্রে ডুব দাও, যেখানে সকল রকম রস গিয়ে মিশেছে।

কালচক্র যে ঘুরছে, এর ব্যাপ্তি বহুদূর। তার হিসেব ধরতে পারি নে। সমস্ত জীবজগতের উপর দিয়ে ঘুরছে। আমরা তো তার অণুপরমাণুর চেয়েও ছোটো। আমাদের দিকে চেয়ে তো সে ঘুরছে না।

আর্ট করতে গেলে ছোটোখাটো ভাবনা করতে নেই। ছোটোখাটো কাঠকুটো দিয়ে কুটুম-কাটাম গড়ি; কিন্তু ছোটো ভাবনা নেই। অন্তরের রস দিয়ে যে জিনিস করতে হয়, যে রসই মূলাধার— সেই রসকে দিয়েই যদি ছোটোখাটো জিনিস গড়তে যাও তবে তার অপব্যয় করা হয়।

'এই দেখো আর্টের চলার রাস্তা, দাও তোমার খাতাটা, এঁকে দেখিয়ে দিই', বলে অবনীন্দ্রনাথ খাতার পাতায় আঁকলেন পর্বতশিখরের মতো একটি তিনকোণা লাইন। বললেন, আর্টের শুরু, এই পথ ধরে সে উঠল, উঠে উপরে আর্টের মধ্যাহ্ন, সেখানে কিছুক্ষণ রইল, তার পর আবার ও দিক দিয়ে নামল; পথের শেষ হল।

বললেন, সব দেশের আর্টের চর্চা করে দেখো, তিনটি ধাপ দেখবে। সকালে আর্ট উত্থানের মুখে চলেছে, সে-কালটি উষাকালের মতো স্নিগ্ধ মনোহর, সমস্ত দেখা দিচ্ছে আর্টের মধ্যে। তার পর মধ্যাহ্ন এল, সেখানে আর্ট একভাবে রইল স্থির কিছুকাল। তার পর আবার চলল নেমে সন্ধ্যাসূর্যের মতো; এখানেও মনোহর রূপ রঙ সমস্ত বিচিত্র সামগ্রীতে প্রকাশ করে চলল আর্ট। এই হল চলার রাস্তা আর্টের।

মধ্যাহ্নের প্রাখর্য বেশিক্ষণ সয় না আর্টে। আবার যখন আর্টের অন্ত হল, তাপ ডিগ্রি কমতে কমতে 'মেলো' হয়ে এল। ফুলটা শুকিয়ে পড়াতেও কী 'বিউটি'! পদ্মফুল শুকিয়ে নুয়ে পড়েছে, তারও কী বাহার! আবার একটা উদয়ের আভাস সেখানে। দিনের একটা উদয়, রাতের একটা উদয়।

এইরকম বড়ো জিনিস নিয়ে কালচক্র ঘোরে। এ নিয়ে মাথা ঘামাতে যাও, পিঁপড়ের মতো পিষে যাবে।

বললেন, এখন তোমরা একটা সাধনার পথে এসে গিয়েছ, তোমাদের এ কথা না বললে চলবে কেন? মনের রাজত্বের আইন স্বতন্ত্র। মন ঠিক করো, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। হাজার ধাক্কা সইবে তখন।

প্রভুর চাকর আমরা, মাথার উপরে তিনি। আজ রাজা ধরে নিয়ে যায়, কেড়ে নিয়ে যায়, তা সইতে পারছ না; আর এই-যে রাজা বুকের কাছ থেকে সন্তান নিয়ে যায় সেখানে কী সান্ত্বনা? প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ ঠিক রাখো, তবেই বুঝবে। প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ বুঝে নাও।

এই কথা বলেছিল নূরজাহান জাহাঙ্গীরকে। জাহাঙ্গীরের একদিন খেয়াল হল, নূরজাহানকে যে নিয়ে এসে প্রাসাদে রেখে দিয়েছেন, তাকে তো জানা হল না। নূরজাহানকে কেড়ে এনেই তাকে ভুলে গেছেন। সেদিন সে কথা মনে হতে অন্তঃপুরে গিয়ে দেখেন নূরজাহান মলিন বেশে মলিন মুখে বসে আছেন। জাহাঙ্গীর বললেন, তুমি এ বেশে থাক কেন? নূরজাহান বললে, প্রভু, তুমি রেখেছ, তাই থাকি।

তুমিও যদি তোমার প্রভুকে এই কথা বলতে পার, দেখবে কোনো দুঃখ থাকবে না।

আর্টেও সেই একই কথা। ঠিক সম্বন্ধটি অনুভব করো। আর্টিস্টের ধর্ম আর্ট। এই সম্পর্ক নিয়েই ছোটো ছেলেদের সঙ্গে ভাব করেছি, গাছপালার সঙ্গে ভাব করেছি। জীবন দিয়ে এ কথা জেনেছি, এর পরিচয় পেয়েছি; তাই না এ কথা বলতে পারছি। দৈনন্দিন জীবনে এর প্রতিষ্ঠা করো, দেখবে সুখে থাকবে।

মূল কথা এই— মনকে বিক্ষিপ্ত করবে না। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ঠিক কাজ হয় না।

শান্তিনিকেতন কি এখানেই? তা নয়। ঘরে ঘরে শান্তিনিকেতন বহন

করে নিয়ে যাবে তোমরা। এর মধ্যে বেসুর লাগলে ভয় হয়। হরিশ্চন্দ্র রাজার দেখো, বিশ্বামিত্রের তপোবনে বেসুর লাগল। ভবিতব্য কোথায় কী হয়, তার পরে যত পলিটিক্স, রাজার পতন— সব কিছু।

আর্টিস্টের কাজ, সুধা দিয়ে যেতে হবে। তার পর— পরের কথা ভাববার তোমাদের দরকার নেই।

বললেন, দেশকে সুখ-সৌন্দর্যে ভরতি দেখতে চাও, হাতের কাছে তা আছে। কিন্তু তা করবে না। এই যে আমরা এসেছি, গান গাইছি— উপকরণ আগে থেকেই তৈরি হয়। আলপনা টানো কেন? না, 'আসছেন', হুকুম এসেছে সাজাও। সভা সাজাও। তিনি এসে পরবেন কী, বসবেন কিসে? ঘর, বস্ত্র, কার্পেট তৈরি করো।

যন্ত্রে সুর বেঁধে রাখো। সভায় বসে সুর বাঁধা চলে না। আগে থাকতে মনের সুর না বাঁধলে হবে না।

মোচড় খেতে হবে। 'আঃ লাগে' বললে চলবে না। একজন না পারে বারে বারে লোক আসবে এজন্য।

বড়ো দিক দিয়ে দেখতে শেখো। জগতের ইতিহাস দেখো। মানুষ যে এত বড়ো হয়ে পিঁপড়ের মতো একটু চাপ পড়লেই কামড়ায়, তা হলে মানবত্ব কোন্‌খানে? সে তো তা হলে সাপ হল। সইতে হবে। যে সয় তারই জয়। সইতে সইতে পিঠে কড়া পড়া— সেই তো বর্ম।

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যিকারের গুরু। বেদে পুরাণে যে গুরুর কথা শুনি, সেই গুরু। যে গুরু আপন শক্তি দান করতেন, সেই গুরু। যে গুরু দেখার চক্ষু খুলে দিতেন, সেই গুরু।

এই গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ দেখেছি অবনীন্দ্রনাথে ও নন্দলালে।

এক দিকে শিষ্যের যেমন ছিল শ্রদ্ধা ভক্তি বিনয় নির্ভরতা; অন্য দিকে গুরুর তেমনি ছিল স্নেহ, মমতা, দয়া, দাক্ষিণ্য অঢেল।

কোনোদিন শুনি নি কথাচ্ছলে নন্দদার নাম নিতে শুধু 'নন্দলাল' বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ। বলতেন, 'আমার নন্দলাল'।

বলতেন, আমার নন্দলাল যখন আমার কাছে এল ছবি আঁকা শিখতে, কালোপানা এই এতটুকু ছেলে। বলে, হাত তুলে নন্দদার উচ্চতা দেখাতেন—

যে উচ্চতা অভিজিতের চেয়ে বেশি উঁচু হত না।

আড়ালে আমরা হাসতাম এ নিয়ে। নন্দদাও হাসতেন। আমাদের বলতেন, আমি যখন ওঁর কাছে যাই তখন আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি, আমার বিয়ে হয়েছে। আমার শ্বশুরমশায়ই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে করে ওঁর কাছে প্রথমবারে। ওঁর স্নেহের চোখে আমাকে উনি অতটুকু দেখেন। এখনো তাই।

এমনিই ছিল স্নেহ নন্দদার প্রতি অবনীন্দ্রনাথের।

দেখতাম, যেন আগলে রেখেছেন দু হাতে তিনি নন্দদাকে— ছোট্ট ছেলে পথভ্রষ্ট না হয়। বলতেন, আমার নন্দলালকে যদি আরো কিছুকাল আমার কাছে রেখে দিতে পারতাম! তার আগেই তাকে শান্তিনিকেতনে পাঠাতে হল।

কত সময়ে তিনি শিল্পীদের শেষ খেলাঘরের কথা বলতে বলতে যেখানে 'মার মন নাচছে তো কোলে ছেলে ধেই ধেই করে নাচছে'— সেই রকম অবস্থার কথায় আসতেন, বলতেন, 'আমার নন্দলালের সে অবস্থা কবে হবে?' যেন আকুল হয়ে চেয়ে আছেন তা দেখবার জন্য।

নন্দদাকেও দেখতাম, সেই আমার বিয়ের আগে থেকে, যখন কলাভবনে ছাত্রী ছিলাম— ইণ্ডিয়ান আর্ট সোসাইটিতে বাৎসরিক একজিবিশন হবে, নন্দদা তাঁর ছাত্র-ছাত্রীর ছবি নিয়ে যেতেন। গুরু কাজ দেখে খুশি হলে তিনি নিশ্চিন্ত হতেন। গুরুও নিশ্চিন্ত থাকতেন, হ্যাঁ, ঠিক পথেই চলেছে তাঁর নন্দলাল।

নন্দদা বলতেন, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ গুরু যা দেবেন শিষ্য তা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবে। এ না হলে হয় না! যদি শিষ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে তা গ্রহণ করতে না পারে তবে গুরুর দেওয়াও থেমে যায়।

গুরুদেব বলতেন, কোথাও কিছু বলতে হলে শ্রোতার মুখ দেখি। কতবার তাদের মুখ দেখে বলা আমার থেমে গেছে, আবার কতবার বলা আমার খুলে গেছে। সত্যিই তাই। নিতে জানা চাই, নিতে না জানলে দেওয়া যায় না।

নন্দদা বলেন, একবার একটা পাহাড়ের ছবি এঁকেছি, পাহাড়ে শিবের মুখ। এমন কিছু ভালো ছিল না ছবিখানা। তবু শেষ করে অবনবাবুকে দেখাতে নিয়ে গেছি। গণেন মহারাজ সঙ্গে ছিলেন। অবনবাবু ছবিখানার উপরে পেনসিল দিয়ে কারেক্‌শন করলেন। ফিরে যখন আসি গণেন

মহারাজ আমাকে বললেন, তোমার ফিনিশ-করা ছবিখানার উপরে এমন করে দাগ কেটে নষ্ট করলেন, আর তুমি কিছুই বললে না তাতে ? আমি বললাম, আমার ছবিতে যে উনি হাত লাগিয়েছেন এই আমার কত বড়ো ভাগ্য।

এখনো তাই মানি। এখনো উনি আমাকে শিষ্যের মতো শিক্ষা দিয়ে আসছেন। এ আমার ভাগ্য বৈকি!

কী সম্ভ্রম করতেন নন্দদা তাঁর গুরুকে।

অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আছেন; দেখতাম, রোজ সকালে নন্দদা আসতেন। অবনীন্দ্রনাথ কুটুম-কাটাম গড়ছেন, কী, ছবি আঁকছেন; নন্দদা দোরগোড়ায় মাটিতে হাত ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম করে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে দোরের পাশে এককোণে মাথা নিচু করে বসে থাকতেন। কোনোদিন অবনীন্দ্রনাথ কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতেন। বেশির ভাগ দিনই চুপচাপ কাটত সময়। অবনীন্দ্রনাথ হাতের কাজে নিবিষ্ট থাকতেন, নন্দদা স্থির হয়ে বসে থাকতেন। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকার পর নন্দদা উঠে তেমনি ভাবে দোরগোড়ায় একই-ভাবে প্রণাম রেখে নিঃশব্দে চলে যেতেন।

অনেকদিন দেখেছি অবনীন্দ্রনাথ মুখ তুলে তাকাতেনও না, কে ঘরে এল গেল। কিন্তু একদিন নন্দদা না এলে তিনি উসখুস করতেন। নন্দদাও হয়তো কোনো কিছুতে আটকা পড়েছিলেন সকালে, বিকেল হতে না-হতেই চলে আসতেন। গুরুর সান্নিধ্য নিতেন। বাইরের যোগাযোগ দেখেছি এই পর্যন্ত। অন্তরের যোগ, সে কথা নন্দদার মুখেই আভাস পেয়েছি কতবার কত কথাচ্ছলে।

নন্দদা বলতেন, কতবার এমন হয়েছে, দুজনে একই ভেবেছি। একই ছবি একে অন্যের হাত দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তাতে আনন্দই পেয়েছি। উনিও আনন্দিতই হয়েছেন।

একবার উনি ছোটোমাকে নিয়ে মুঙ্গেরে এসেছেন বেড়াতে। ঘুরে ফিরে বেড়ান, চার দিক দেখেন; চাষী-গেরস্থের বাড়ি ঘোরেন। তখন আমি সুজাতার ছবিখানা করছি। ওই সেই ছবিখানা, সুজাতা দুধ দুইছে বুদ্ধের জন্য। তারিখ দেখলে দেখবে অলকের বিয়ের আগের দিনের তারিখ।

অবনবাবু ফিরে এলেন মুঙ্গের হতে, এসে আমার ছবিখানা দেখে খুব খুশি। বললেন, এই ছবিখানি আমি আঁকব ভেবেছিলাম। সকালে উঠে গ্রামে

বেড়াতে যেতুম, তখনো কুয়াশা কাটত না, গ্রামের উপরে ধোঁয়ার রাশি চাপ বেঁধে থাকত। তারই মধ্যে শুনতে পেতুম দুধ দোয়াবার শব্দ চলছে ঘরে ঘরে। সেই শব্দ শুনে ভেবে রেখেছি এইবার গিয়ে এই রকম একটি ছবি আঁকব। তা তুমি দেখছি আমার আগেই এঁকে বসে আছ। তা বেশ বেশ। আমি আর আঁকব না। বলে, আমার ছবিখানা কিনে নিলেন। বললাম, ফিনিশ হয় নি এখনো। বললেন, তার আর দরকার নেই।

আর-একবার, তখন আমি দেশের বাড়িতে। আমায় উনি তাড়িয়ে দিলেন আর্ট স্কুল থেকে। বললেন, যাও, এবার তুমি ঘরে বসে ছবি আঁকো গে। শেখা হয়ে গেছে।

কী আর করি! স্টীমারে যাওয়া-আসা করতাম, আঁচুল-কলকাতা ; এবারে দেশে বসেই ছবি আঁকতে আরম্ভ করে দিলাম। ভাবলাম জনসাধারণের জন্ম ছবি আঁকব পটের স্টাইলে। দেখি কত করে দিন উপার্জন করি।

বসে গেলাম আঁকতে। সারাদিন ছবি আঁকি আর পানবিড়ির দোকানে টাঙিয়ে দিই দড়ির সঙ্গে আংটা লাগিয়ে। অপেক্ষা করি, কত বিক্রি হয়। সাধারণ বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকতাম রাধাকেষ্ট পাখি সাপ নেউল ফুল এই-সব। দাম থাকত দু আনা আর এক আনা। ভাবতাম অন্তত যদি রোজ আট আনার বিক্রি হয়, তবুও হয়। খেয়ে থাকা যায়। কিন্তু তা আর হত না। চার-পাঁচ আনার বেশি কোনোদিনই পেতাম না।

আমার ঘরটা ছিল রাস্তার উপরেই। রাস্তার দিকের একটা খোলা জানালার ধারে বসে ছবি আঁকতাম। মিলের মজুররা কাজ-শেষে বিকেলের দিকে ওই পথেই ফিরত। রোজ তারা ভিড় করে দাঁড়াত আমার জানালার ধারে। ছবি দেখত, এটা-ওটা জিজ্ঞেস করত, বেশ লাগত। একদিন একটা ছেলে এল, রাধাকেষ্টর একখানা ছবি কিনল দু আনা দিয়ে। আর-একটা ছবি ছিল সাপ-নেউলের। সেখানা সে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। বললাম, নিবি এটা? বললে, দাম কত? বললাম, এক আনা। সে তার হাতের মুঠোটা খুলে দেখাল মাত্র একটি পয়সা আছে। বললাম, আচ্ছা, ওই এক পয়সাতেই নে ; বলে দুখানা ছবি নয় পয়সাতে বিক্রি করলাম। সে ছেলেটি প্রায়ই আসত, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত আর পছন্দমত ছবি বিনি পয়সাতেই পেয়ে যেত। এই করে কিছুদিন গেল। দেখি, ছবি এঁকে তো

পেট ভরানো যায় না ; পাঁচ আনা যেদিন পেলাম তো খুব বেশি।

এই-সব দেখে একদিন রওনা দিলাম ওঁর কাছে। থান-ষোলো পট যা বাকি ছিল 'রোল' করে নিলাম। কোনোদিনই আমি সোজাসুজি গিয়ে তাঁকে ছবি দেখাই নি ; এখনো দেখাই না। আগে যাই, বসি, তাঁর মুড বুঝি ; তার পর তিনি দেখতে চাইলে তখন ছবি নিয়ে হাজির করি।

সেদিনও গেলাম, গিয়ে দেখি তাঁরা তিন ভাই বারান্দায় বসে আছেন। আমি পিছনের দিকে ছোটো ঘরে যেটাতে নবুরা বসত সেখানে গিয়ে ছবির মোড়কটা রেখে তাঁকে প্রণাম করলাম। প্রণাম করতেই উনি বলে উঠলেন, দেখো নন্দলাল, আমি ভাবছি তোমাকে কালীঘাটে পাঠাব। সেখানে বসে কিছুদিন পট আঁকো। কালীঘাটের পটের স্কুলটা মরে গেছে, সেটা গিয়ে উদ্ধার করো। আর, জনসাধারণের জন্য ছবি আঁকো। দেবদেবী নয়, সে অনেক হয়ে গেছে। সাধারণ সাবজেক্ট নাও। ফুল পাখি দৈনন্দিন ঘটনা— এই-সব।

শুনে মনে বড়ো আনন্দ হল। যা আমি দেশের বাড়িতে বসে এক্সপেরিমেণ্ট করছিলাম, ইনি এইখানে বসে তা ভাবছেন।

উঠে ছবির তাড়া নিয়ে এলাম। বললাম, এবারে দেশে বসে বসে এই করেছি। পানের দোকানে টাঙিয়ে দিতাম, মজুররা কিনত। দিনে পাঁচ আনার বেশি পাই নি কোনোদিন।

উনি বললেন, কত করে দাম করতে এই ছবিগুলোর ? বললাম, ছ আনা একটু বেশি হয়, ছ পয়সা চার পয়সা হলে কিনতে পারে তারা।

শুনে উনি ছবিগুলি মুড়ে নিয়ে পাশে রেখে দিলেন। বললেন, এগুলি আমি কিনে নিলুম।

ব্যস্— আমারও পট আঁকা বন্ধ হয়ে গেল। সেদিন বড়ো আনন্দই পেয়েছিলাম মনে ; দুজনের একই ভাবনা দেখে।

বলতে বলতে নন্দদা আনন্দের বেগ থামাতে পারেন না। বলেন, আরো শোনো, একবার 'প্রবর্তক' একটা কভার ডিজাইন করতে দিয়েছিল। আমাকে আঁকতে বলে পরে আবার ওঁকেও বলেছিল আঁকতে। আমি জানতাম না। আমিও এঁকে পাঠিয়েছি, ও দিকে উনিও এঁকে পাঠিয়েছেন। আশ্চর্য, দুজনের সাবজেক্টই এক— হাঁসের ডিজাইন। ধরন একটু আলাদা, কিন্তু

বিষয়বস্তু এক। প্রবর্তকের লোকেরা তো অবাক, বলে, 'এ হয় কেমন করে?'

নন্দদা বলেন, আবার, আমি যা ভেবেছি উনি তা এঁকে ফেলেছেন, এও হয়েছে। গুরুদেবের মৃত্যুর পরে আমি ভাবছি ছবি আঁকব একখানি। শুনলাম, উনি এঁকে ফেলেছেন। শুনে আমার ছবি বন্ধ হয়ে গেল, আর আঁকা হল না। আমার সাবজেক্টটা ছিল একটু অন্য রকমের। ভেবেছিলাম, ঢেউয়ের উপরে পদ্মফুল ভেসে যাচ্ছে আঁকব। কিন্তু যে ছবি উনি এঁকেছেন তার উপরে আর আমার আঁকা চলে না।

তখন জোড়াসাঁকোর ৫ নম্বর বাড়ি বিকিয়ে গেছে; গগনেন্দ্রনাথ চলে গেছেন এ পৃথিবী ছেড়ে, সমরেন্দ্রনাথ ভিন্ন বাসাবাড়িতে, অবনীন্দ্রনাথ গুপ্ত-নিবাসে। পড়ন্ত অবস্থা সব দিক দিয়ে। নন্দদা দুঃখ করতেন, বলতেন, অবনবাবুর ছবিগুলি ছড়িয়ে রইল চারি দিকে। কী যে হবে সে-সব ছবির, ভেবে মন খারাপ হয়ে যায়। সব একজায়গায় থাকা উচিত। আমি কতবার বলেছি, এই কলাভবনই তার যোগ্য স্থান। আর পঞ্চাশ বছর পরে ওঁর ছবি দেখতে লোকে কাড়াকাড়ি করবে। এখনো ওঁর ছবির মূল্য কেউ দেয় নি; কিন্তু দেবে একদিন। পৃথিবীর লোক একদিন আসবে এখানে ওঁর ছবি দেখতে।

কী লোক, তাঁর কী অবস্থা আজ! তাঁরা তিন ভাই ছিলেন এক-একটি বাদশা; কী গগনবাবু, কী সমরবাবু, কী অবনবাবু। তাঁর সংস্পর্শে এসে আমাদের ছবি নতুন রাস্তা পেল। ধারা বদলে গেল। ছবিতে আভিজাত্য এল। রামচন্দ্র কৌশল্যা যখন এঁকেছিলাম তখনো ওঁর বাড়ির সঙ্গে জানাশোনা হয় নি। আমরা ছিলাম সাধারণ লোক। ছবিতেও সাধারণ ছাপই থাকত। তার পর এলাম ওঁর একেবারে কাছে। ওঁর বাড়িতে ঘরের ছেলের মতো রইলাম; সবাইকে জানলাম, ওঁদের দেখলাম। মা তখন ঘরের কর্ত্রী, সে কী আদর চিরকাল ধরে পেলাম। তাঁদের জেনে ছবি বদলে গেল। তাই তো বলি, কী মানুষ তিনি, আর কী দিয়েছেন! ঘর দিয়েছেন, স্নেহ দিয়েছেন, খাবার দিয়েছেন, আবার আলাদা এক জগৎ দিয়েছেন— ছবি আঁকতে। ঘরের ছেলের মতো দেখতেন আমাদের, সে শুধু মুখের কথা নয়, সত্যিই।

নন্দদা বলতেন, দুহাতে আগলে রাখতেন তিনি তাঁর ছাত্রদের। তাঁর

স্নেহমমতার কথা বলতে বলতে কতবার নন্দদার মুখের কথা থেমে যেত। যে কথা হৃদয় দিয়ে বলবার, সে কথা ভাষায় আসে না।

সেবারে নন্দদা প্রমুখ জনকয়েক শিল্পী অজন্তা যাচ্ছেন। ছবি কপি করে আনতে। তখনকার অজন্তা অতি দুর্গম ছিল সকল দিক থেকে। অবনীন্দ্রনাথ, সিস্টার নিবেদিতা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সব ; সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে। যাবার ব্যবস্থা, থাকার ব্যবস্থা, খাবার ব্যবস্থা, অর্থের ব্যবস্থা, সবই হয়েছে ঠিকমত। রওনা হবার আগে অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে গেছেন নন্দদা। নন্দদা বলেন, প্রণাম করতে যেতেই উনি উঠে ওঁর একটা দামী জোব্বা এনে নিজের হাতে আমাকে পরিয়ে দিলেন ; 'শীতকাল, শীত যদি লাগে, থাক্ এটি গায়ে'। তাড়াতাড়ি বুকপকেটে গুঁজে দিলেন দুশো টাকা। বললাম— টাকা তো যথেষ্ট আছে সঙ্গে। হাত দিয়ে উনি আমার বুকটা চাপড়ে চাপড়ে বললেন, 'থাক্ থাক্ ; বিদেশ-বিভুঁই, এটাও সঙ্গে থাক্।'

নন্দদা বহুদিন বলেছেন যে, সেদিন তাঁর মুখে যে স্নেহ যে আন্তরিকতা যে দরদ দেখেছিলাম তা কি ভুলতে পারি কখনো? কাঁদতে কাঁদতে মুখে হাসি টেনে মা মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠায়— সেই করুণ কোমলতা ছিল সেদিন তাঁর হাসিমুখে।

নন্দদা বলতেন, আর্ট স্কুলের সিঁড়িতে ফুটো ছিল একটা, দেখো নি? পার্সিব্রাউনেতে আর ওঁতে লেগেছিল ; লাঠি ঠুকে সিঁড়িতে ফুটো করে ফেলেছিলেন। আমরা বরাবর দেখতাম আর বলাবলি করতাম।

সেবারে মুসৌরি যাবেন, গরমকাল, বললেন, আমি আগে দরখাস্ত করেছি, আমিই যাব আগে। সাহেব বললে, তা হবে না, আমি আগে যাব।

এই রকম তর্কাতর্কি হচ্ছে। আমরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছি। অবনবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। শেষে একসময়ে গায়ের জোরে লাঠি মাটিতে ঠুকে 'এই রইল সাহেব তোমার চাকরি, কে তোমায় ডরায়?' বলে, হন্‌হন্ করে নেমে চলে গেলেন।

সেই লাঠির ঠোকাতেই সিঁড়িতে গর্ত হয়ে গিয়েছিল।

কাউকে কেয়ার করতেন না তিনি। নিজে যা ভালো বুঝতেন করে যেতেন।

একবার রেজিষ্ট্রি খাতা ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন আপিসে।

সাহেব সেবার নিয়ম করেছিল কে কখন আসবে যাবে, রেজিষ্ট্রি খাতায়

সই থাকবে। আমি তখন থাকি আঁতুলে, স্টীমারে করে আসি যাই। অবনবাবু জানতেন। আমাকে বলে দিয়েছিলেন, তুমি ভাবনা কোরো না বা তাড়া কোরো না। আর্টিস্ট তার সময়-সুবিধা মতো কাজ করে যাবে। ও কি আর ঘণ্টা ধরে হিসাব করে হয়?

আমিও তাই যাই আসি। স্কুলে আসতে আসতে এক-একদিন বারোটা বেজে যায়। এমন সময়ে সাহেবের নিয়ম হল রেজিস্ট্রিতে সই করতে হবে; দেরিতে এলে চলবে না।

অবনবাবু বললেন, আমার ছেলেরা কাজ দেখাবে। সময়ের হিসাব করে কী হবে?

সাহেব শোনে না।

শেষে একদিন যেই-না পিওন রেজিস্ট্রিখাতা এনে সামনে ধরেছে, উনি রেগে খাতাটা দু টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। পিওনকে বললেন, সাহেবকে বলো গিয়ে, আবার যদি খাতা পাঠান তো আবার এমনি করব।

ছাত্রদের হয়ে উনি কম লড়েছেন? একবার সাহেব নিয়ম করল, ছেলেরা দেরি করে এলে আর ঢুকতে পারবে না। দারোয়ানকে হুকুম দেওয়া হল ক্লাসের ঘণ্টা পড়লেই গেট যেন বন্ধ করে দেয়।

শৈলেশ বলে আমাদের সময়ে একটি ছেলে ছিল। একদিন ক্লাস বসেছে, সাহেবের হুকুমমত দারোয়ান গেট বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা যে যার জায়গায় বসে ক্লাস করছি। আর্ট স্কুলের জানালাগুলি দেখেছ তো, কেমন উঁচুতে? স্টুডিয়োর স্কাইলাইটের মতো। শৈলেশ কোনোরকমে বাগানে ঢুকে সেই জানালার নীচে দাঁড়িয়ে ডাকছে। দারোয়ান দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, ভিতরে ঢুকতে পারছে না। কাজ করতে করতে হঠাৎ কার ডাক শুনি। কান পেতে শুনলাম, শৈলেশের গলা-না? অবনবাবুকে বললাম, শৈলেশ ডাকছে, ভিতরে ঢুকতে পারছে না।

বললেন, কেন?

বললাম, সাহেবের নিয়ম যে-ছেলে দেরি করে আসবে তাকে আর ঢুকতে দেওয়া হবে না।

উনি কিছু না বলে নীচে নেমে গেলেন। দারোয়ানকে বললেন, দরজা খোলো। দারোয়ান দরজা খুলতে শৈলেশকে ডাক দিলেন, এসো ভিতরে।

শৈলেশ ভয়ে ভয়ে ঢুকল। শৈলেশকে সঙ্গে নিয়ে উপরে উঠে এলেন।

নন্দদা হাসলেন। বললেন, এই শৈলেশ কেমন একটু খেপা-খেপা ছিল। একে নিয়ে উনি মজাও করতেন এক-এক সময়ে। তখন আর্ট স্কুলে মেয়ে-মডেল আসত। অনেকের পায়ে আবার মলও থাকত। সিঁড়ি দিয়ে 'মডেল' উঠত নামত, ঝুমঝুম্ আওয়াজ হত।

একদিন আমরা ক্লাসে বসে ছবি আঁকছি, এমন সময়ে সকলেই কেমন উসখুস করছে আর শৈলেশকে ইশারা করছে, 'সিঁড়িতে মলের শব্দ'। তার মানে মডেল এসেছে। শৈলেশের একটু কৌতূহল ছিল মডেল নিয়ে।

অবনবাবুর নজর এড়ায় না কিছু। কাউকে কোনো কথা না বলে শৈলেশকে ডাকলেন, এসো তো আমার সঙ্গে।

শৈলেশকে নিয়ে তিনি উপরে উঠলেন, পিছু পিছু আমরাও ছুটলাম। অবনবাবু যে ঘরে মডেল রানী হয়ে বসে আছে সিংহাসনে, সেখানে গিয়ে তাকে বললেন, বাছা, আমার এই ছেলেটি তোমার একটু দেখতে চায়।

আর যাবে কোথায়! শৈলেশের তখন যা অবস্থা, মুখ আর তুলতে পারে না। আমরাও সকলে দে ছুট্!

এই মডেল আঁকা নিয়েও ওঁর আপত্তি ছিল। বলতেন, পথে-ঘাটে মডেল ছড়ানো আছে। আর্টিস্টরা ঘুরে ঘুরে স্টাডি করুক। এভাবে মডেল বসিয়ে আঁকার দরকার কি?

কী কথা মনে পড়ে নন্দদা ফিক্‌ফিক্ করে হেসে ফেললেন। বললেন, বলি; এখন তোমাকে সাহস করে বলতে পারি। সে সময়কার একটা ঘটনা। 'লাইফ' ক্লাসে একবার একটি ছেলে একটা হ্যাড স্টাডি করে ঈজেলের উপর রেখে দিয়েছে। অবনবাবু ঘুরে ঘুরে সকলের ছবি দেখছেন, দেখতে দেখতে সেই ঈজেলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। পিছনে দাঁড়িয়ে আমি। আড়চোখে আমাকে দেখে নিয়ে তিনি ছাত্রটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এ তুমি এঁকেছ?

সে উৎসাহে এগিয়ে এসে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কতক্ষণ লেগেছে?

এই একদিন না দুদিন বলল যেন।

উনি জিজ্ঞেস করলেন, ক্যানভাসটার দাম কত?

ছেলেটি বললে, অত।

রঙে খরচ হয়েছে কত?

অত।

তুলি?

অত।

অবনবাবু বললেন, হুঁ, এ আর কী মজা পেয়েছ; এর চেয়ে কম খরচে আরো বেশি মজা পেতে পারতে!

এর পর আর ম্যাড স্টাডি করবার কারো সাহস ছিল না।

নন্দদা বলতেন, কলকাতা তখন কত জমজমাট ছিল। এখন দিল্লিই হচ্ছে সব। অথচ আগে সব কিছুর সেণ্টার ছিল কলকাতা। এখন মাতামাতি চলছে পট নিয়ে। পটই যদি সব হবে, তবে আমরা এতকাল করলাম কী। অবনবাবুই বা কী করে গেলেন জীবনভর? পটের জায়গায় পট, ছবির জায়গায় ছবি।

মার প্রতি ছিল তাঁর কী অগাধ ভক্তি। আমার বাবার শ্রাদ্ধ; ওঁকে আর নিমন্ত্রণ করব কী, একদিন গিয়ে জানিয়ে এলাম অমুক দিন বাবার শ্রাদ্ধ। সেদিন শ্রাদ্ধ সেরে উঠেছি, দেখি লাঠি ঠকঠক করে তিনি এসে উপস্থিত। আমি যত খুশি, তত অবাক। আসা-যাওয়া তো সহজ কথা নয় আঢ়ুলে? বললাম; কেন এলেন এত কষ্ট করে?

বললেন, সাধে কি আর এসেছি? মার হুকুম। রাত্রে মাকে স্বপ্নে দেখেছিলেন, পরে জানতে পারি। নন্দদা বললেন, এখন বুড়ো হতে চললাম, নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে চলতে চলতে এসেছি, নানা বিষয়ে জ্ঞান বাড়ছে। ছবি সম্বন্ধে কত কিছু নিয়ে অবনবাবুর সঙ্গে মতানৈক্যও হয়। তবু, এখনো ছবি আঁকতে বসি ওঁর নাম নিয়ে। নইলে আমার চলে না।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, সেদিন বললুম, আচ্ছা নন্দলাল, ধরো যদি এই কলাভবন, এই ছাত্রছাত্রী, শেখাবার ধারা, সব বন্ধ করে দেওয়া যায়— তবে কি কর?

নন্দলাল বললে, ভয় নেই আমার, মাটিকে চিনেছি যে।

বললুম, তা হলে আর কথা নেই। আসল মা হচ্ছে মাটি। সেই মাকে চিনলে, তার কাছে আশ্রয় পেলে আর ভয় নেই।

একবার ভেবেছিলুম নন্দলালকে এবারে কাঁটাবনে চালাব। নন্দলাল কাঁটাবন ভাঙে নি, কোলে কোলে চলেছে। আমার কোল থেকে খুড়োর কোলে দিয়েছিলাম। এখন কার কাছে দিই তাকে? মাটির মার কাছেই এবারে তাকে ছেড়ে দেব। ওই বয়সে আর কাঁটাবনে ছাড়া চলবে না।

বললেন, আমারও দুই মা। এক মা আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছিলেন শিশু অবস্থায়, তা জানো?

তখন আমি নেহাত ছোট্টটি। মা কাটোয়া যাচ্ছেন, ছোটোপিসিমার শ্বশুরবাড়ি। ছোটোপিসিমা, লোকজন, দাসদাসী অনেকেই সঙ্গে। ধানখেতের মাঝখান দিয়ে পালকি যাচ্ছে। তারই একটি পালকিতে মা আমাকে কোলে নিয়ে বসে। কী শখ হল মার, আমার হাতে একগাছি ধানের শিষ ভেঙে দিলেন, ছেলে খেলা করবে। আমি মস্ত পেটুক, খেলা করব কী, মুঠো-ভরা ধানশিষ দিলুম পুরে একেবারে মুখের মধ্যে। মা তো ছেলের হাতে খেলা দিয়েই নিশ্চিন্ত। প্রকৃতির শোভা দেখতে মজে গেছেন। এ দিকে ছেলে তাঁর এই কাণ্ড করে বসেছে।

মা বলতেন যে, সেই ধানের শিষ গলায় আটকে মুখ লাল হয়ে চোখ উলটে যাই আর কী আমি! মা ভয়ে কাউকে ডাকতেও পারেন না। ছোটোপিসিমা ছিলেন সঙ্গে, তাঁর বকুনির ভয়ও আছে মার। গলায় আঙুল দিয়ে অতি কষ্টে সে ধান বের করেন। নয়তো সেদিন হয়ে গিয়েছিল আর কি! তা হলে এখন এমনি বসে বসে আমার মুখে গল্পও শুনতে হত না তোমার।

তাই বলি, আমার এক মা কাঁটা ফোটায় পায়ে, ধান খাওয়ায়। বড়ো শক্ত মা। উপর থেকে চিল এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়; মেঘ আছে, বজ্র আছে। আবার তারই মধ্যে ফুল আছে, মেঘের ছায়া আছে, বৃষ্টির ফোঁটাও আছে।

আর্টিস্টমাত্রেই নেচারের ছেলেমেয়ে। আমাদের সঙ্গে অন্যদের তফাত ওইখানে। সে কৌশল কেউ কাউকে শিখিয়ে দিতে পারে না।

বলেছি তো, আর্টের তিনটে স্তর আছে। একটা স্তর— সব চেয়ে নীচের তলা; মাটির কাছে। সেখানে একতলার কাজ— আর্টিস্টের কাজ। ভালো খাবার করি, ফুলের মালা গাঁথি, আলপনা দিই; কার জন্য করি? নিজের জন্য? না; আমরা কী করি, কী গড়ি— কর্তা যদি দেখেন, খুশি হন। বা, কর্তা চান, তাই করি। জগন্নাথের শিলবাটা হয়, এই এতবড়ো শিল

বাটছে— ভাল ভাল চন্দন। কার জন্য? না, জগন্নাথের জন্য।

কে বাটছে?

আর্টিস্ট।

দোতলায় কর্তার বৈঠকখানা, সেখানে বড়ো বড়ো পণ্ডিত রসিকের -দল বসেন। চাকর-বাকররাও সেজেগুজে আসে। সেখানেই হয় রসের বিচার। সেই হচ্ছে আসল পরীক্ষাশালা। সেখানেও পৌছতে হবে। সেইখানে আমিও কত নাচ দেখিয়েছি তার ঠিক নেই।

একতলায় ঘর, পা বাড়ালেই মাটি পাই। আমরা সব একতলার মানুষ। চিরকাল একতলায় থাকি, মাটির কাছে। মাটি ছেড়ে তক্তায় বোসো না। 'তখ্ত-এ-তাউস'— তাউস মানে জানো? তাউস মানে ময়ূর। তক্তার নীচে দুটো তাউস থাকত, তার উপরে বসলেই ময়ূর তাকে তক্তা সমেত উড়িয়ে নিয়ে যেত। তাই বলি, তক্তায় বোসো না। যদিও তা আর্টিস্ট করেছে, তবু তাতে ঘুম হয় না। মাদুরের আরামই আলাদা। এই যে মাটির ভিতর থেকে আমাদের সবাইকে টানছে, তার সঙ্গে যদি জুড়তে পার তা হলে আর ভাবনা থাকবে না। ছাদ উড়ে যাবে, বাড়ি ভেঙে পড়বে, সব যাবে; কিন্তু মাটি তোমায় আশ্রয় দেবেই।

আর তেতলায় একটি ঘরে শিল্পদেবী বসে আছেন। মা তিনি; তেতলার ছাদে আছেন, একতলায়ও আছেন।

তেতলায় তিনি কী করছেন? এই আমরা যাকে নিয়ে তাঁর উপাসনা করছি সেখানে তিনি সেই জগৎশিল্পকে কোলে নিয়ে দোল দিচ্ছেন। শিল্প খেলছেন সেখানে তাঁর মার কোলে। অকারণ ভৃত্যের প্রবেশ নিষেধ সেখানে। মনিব যদি তাদের ডাক দিয়ে বলে এই কাজটি করো, তারা খুশি হয়। মার কাছে খিদে পেয়েছে বলাও যা, দাসীকে তেষ্টার জল আনতে বলাও তা— একই কথা। সে একটা জিনিস। সেই অন্দরে মায়ের দাসীরা থাকে শুধু। সেইখানে শিল্প তার মায়ের কোলে মানুষ হচ্ছে।

আর্টের ওই হায়েস্ট্ স্তর। সেখানে নিজের মনের মানসপুত্রটি দুলছে। দুলতে দুলতে যা বের হয়।

দুলতে দুলতে বান এসেছে,
জলে কত চাঁদ ভেসেছে—

সেখানকার গান হচ্ছে এই। চাঁদের আলোর বান ডাকে সেখানে।

এই তিন জায়গায়ই আর্টিস্ট আছে।

তিনটির ভিতর দিয়েই শিল্পীকে যেতে হবে।

আমি যখন পুকুরধারটিতে গিয়ে বসে থাকি, জলে চাঁদ দেখতে পাই। আমার এখন সেই অবস্থা এসেছে।

দরজার বাইরে গিয়ে দেখো, আর্টের পক্ষীরাজ ঘোড়া স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার নীচে একটি পিদিম জ্বলছে। পিদিমটি পকেটে নিয়ে তার পিঠে একবার যদি চড়তে পার, সে তোমাকে ঠিক রাস্তায় পৌছে দেবে।

কথায় কথায় সেদিন অবনীন্দ্রনাথ বললেন, অনিল একদিন জিজ্ঞেস করলে, ছবি আঁকবার সময়ে মনে হয় না কি যে, আলাদা অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকছেন?

বললুম, কই, তা তো হয় না মনে।

ছবি আঁকি, মনে হয় আপনিই আঁকা হচ্ছে। হাত এঁকে চলেছে। যখন চলতে পারতুম তখন জানি নি বুঝি নি যে চলছি। আর এখন চলতে পারছি নে, এখন চলতে গেলে বুঝতে পারি যে, হ্যাঁ, চলছি বটে। চলায় যখন কষ্ট তখনই বোঝায় চলছি। করতে যখন কষ্ট তখনই বোঝায় করছি। অতি সহজে যা হয়ে যায়, যা চলে, তা বুঝতে দেয় না।

এক-এক সময়ে ভাবি আমার ভিতরে কত অবনীন্দ্রনাথ আছে। মনের ভিতরে তারা উঁকিঝুঁকি মারে, চমকে উঠি, আমি কী এই? তাড়াতাড়ি সামলে নিই।

তাদের কত রূপ। কত ভাবে তারা মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এই এখন আবার আমি আর-এক অবনীন্দ্রনাথ। এই অবনীন্দ্রনাথ তো আগে ছিল না, কোনো কালেই ছিল না। হয়তো ছিল, তবে লুকিয়ে ছিল। ছিল নিশ্চয়ই। নয়তো এত ছবি বের হল কী করে? সংসারে একটা অ্যাটাচমেণ্ট না থাকলে ছবি হয় না। তবে, সংসারটা ছিল পর্দার আড়ালে। তাকে নিয়ে ভাবি নি কখনো। এখন ভাবি।

এখন এইটে হয়েছে। সংসারে জড়িয়ে পড়েছি। তাতেই ভালো লাগে। সংসারের দুঃখ কষ্ট— বলি, প্রভুর দান। তাই মেনে নিই। এই দুঃখের জন্ত দুঃখ করি না। সংসারের দুঃখগুলি সিনেমার ছবির মতো চোখের সামনে

স্পষ্ট হয়ে কাঁপতে থাকে, কাঁপতে কাঁপতে খানিকবাদে মনের ভিতরে স্থান নেয়। নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াই। ধাক্কা সইতে একটু সময় নেয় বৈকি। বলি, 'প্রভু যেমন রেখেছেন।'

এই সংসারী অবনীন্দ্রনাথ কোত্থেকে এল? ছিল, তবে লুকিয়ে ছিল। বুড়োবয়সের লোভ। যে রস পাই নি, সেই রসের আস্বাদ নিচ্ছি। প্রভুর ইচ্ছে এরই ভিতর দিয়ে আমায় যেতে হবে, উপায় নেই। সাধকের যেমন চরম অবস্থা, এও তাই।

নয়তো কত দিদিমণি বুক থেকে চলে গেল, এখনি একটুখানি দিদিমণির জন্য এমন করি কেন? দিদিমণি সেদিন মা বাপের সঙ্গে চলে গেল বার্নপুরে। আমায় এসে বললে, 'ভেবো না, আমি আবার আসব।' অবাক হয়ে গেলুম; এ কী বলে? এ কথা তাকে কে শেখালে?

ওইটুকু মেয়ে, সে এসে আমাকে সান্ত্বনা দেয়, 'আমার জন্যে ভেবো না, আবার আসব।' এ কথা আমার কোথায় গিয়ে বাজল, কেমন করে তা প্রকাশ করব।

রবিকার মতো যদি কবিতা লিখতে পারতুম তবে এ ভাব ব্যক্ত করে বাঁচতুম। ছবি লিখতে পারলেও হত। মনে যে ভাব জাগল তা ফোটাতে না পারার বড়ো দুঃখ। তাই মনে হয় চলতে চলতে যেন থেমে গেছি। দণ্ড হারিয়ে ফেলেছি। এ যে কী ব্যথা!

যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম।
কে যে আমায় কাঁদায় আমি কী জানি তার নাম॥

জানো রানী, জীবনে আমি কাঁদি নি। কত তো ব্যথা বেজেছে বুকে, কতজন চলে গেলেন এক-এক করে। মা গেলেন, দাদা গেলেন, মেয়ে গেল, অলকের মাও চলে গেলেন। কই, তেমন কাঁদি নি কখনো। এখন মনে হয় কাঁদছি। সত্যিকারের কাঁদি।

তাই তো বলি, যে রাস্তায় পা মাড়াই নি তাই মাড়িয়ে আসতে হবে। তার দুঃখ পেতে হবে। এ প্রভুর দেওয়া থাপ্পড়। যেমন শিশু মার বুকে পা ছোঁড়ে। এর দুঃখ নেই কোনো। একে এ ভাবেই নিতে হবে। 'বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি, সে কি সহজ গান', সেই গান শুনেছিলেন রবিকা।

আহা! তাঁর গানগুলি পড়ে দেখো, গেয়ে দেখো। সব পাবে তাতে।

সাধে কী বলি তাঁর গানই হচ্ছে তাঁর আসল জীবনী। কত গভীরভাবে তিনি সব উপলব্ধি করে গেছেন, কত গভীরভাবে জেনেছেন, তবেই না অমন সুর বের হয়।

শান্তি কোথায় মোর তরে হায়
বিশ্বভুবন মাঝে,
অশান্তি যে আঘাত করে
তাই তো বীণা বাজে।

অমন মানুষও শান্তি খুঁজে গেছেন। কিন্তু তার জন্য দুঃখ করেন নি। দুঃখের মূল্য দিয়ে গেছেন, বীণা বাজিয়েছেন।

দেখো, আমি ধর্মটর্ম বুঝি নে। আমার ধর্ম এই— প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। ভৃত্য যদি প্রভুর মার খেয়ে রাগ করে তবে সে ঠিক ভৃত্য হল না। মারকে মেনে নিতে হবে।

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব
বিষম ঝড়ের বায়ে,
আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে।

ভয় আমি করি নে।

দিন ফুরালে জানি জানি
পৌছে ঘাটে দেবে আনি
আমার দুঃখদিনের রক্তকমল
তোমার করুণ পায়ে।

এই রক্তকমল তৈরি হয় একদিনে নয়। কত দিনে কত দুঃখে তবে তৈরি হয় একটি রক্তকমল। বড়ো সোজা কথা নয়।

আলাদীনের প্রদীপ এঁকেছিলাম. বড়ো ভালো লেগেছিল ছবিখানা। নিজেকে অনেকখানি এক্স্‌প্রেস্‌ করেছি তাতে।

এঁকেছি— একটি দোকানে হরেক রকমের আলো, এমন-কি, সাইকেলের আলো পর্যন্ত দিয়েছি। নানারকমের আলোর দোকান সাজিয়ে একটি ছেলে তার মধ্যে বসে একটি রুমাল দিয়ে পুরোনো পিতলের প্রদীপটি পরিষ্কার করছে।

আমিও এখন তাই। আলোর-আলোর দোকান সাজিয়ে এখন নিজের পিতলের প্রদীপটি বসে বসে ঘষছি।

আজ ভোরে গিয়ে দেখি অবনীন্দ্রনাথ ঘরে নেই। বারান্দাতেও নেই।

এত ভোরে তিনি গেলেন কোথায়? কোনখানে খুঁজব? চুপচাপ বসে রইলাম। রোদ চন্‌চন্‌ করে উঠল, আশ্রমের থার্ড পিরিয়ড শেষ হল, ঘণ্টা পড়ল। অবনীন্দ্রনাথ উত্তরায়ণের গেট দিয়ে ঢুকলেন; ধীরে ধীরে এসে উদয়নের বারান্দায় বসলেন। বললেন, আজ সকালে ঘুম ভেঙে পুব দিকের দরজা দিয়ে দেখি রাঙা আলোয় ছেয়ে গেছে দিক। বুঝলুম আজ সূর্যোদয় হবে, কয়দিন বৃষ্টিবাদলের পরে। তাড়াতাড়ি ছুটে বাইরে গেলুম। আঃ, ঠাণ্ডা হাওয়াটা এসে লাগল গায়ে মাথায়। বসে রইলুম বারান্দার এই চেয়ারে অনেকক্ষণ। দেখি, তোমার অভিজিৎ চলেছে বইখাতা নিয়ে। ডাকলে, 'অবুদাদু!' বললুম, যাও এগিয়ে আসছি আমি।

আশ্রমে পথে পথে বৃষ্টির জল যাবার জন্য ছোটো ছোটো ড্রেন কাটা। তার উপরে বাঁধানো বসবার জায়গা। অবনীন্দ্রনাথ চলতে চলতে তার উপরে একটু একটু বসেন, জিরিয়ে নেন, আবার চলেন।

তাই বললেন, বসে বসে চলি, কষ্ট হয় হাঁটতে। জায়গায় জায়গায় জিরিয়ে আমবাগানে গেলুম, ছোটো ছেলেরা এসে ভিড় করল। অভিজিৎ, আরো কয়েকটি ছেলে কাছে বসে ছবি আঁকলো। তাদের অমুপাখির গল্প শোনালুম। বললুম, আরো ছবি আঁকো, তবে আরো গল্প শোনাব। ছেলেরা ধরলে 'ছবি আঁকা শিখিয়ে দিন', এটা কী করে আঁকে, ওটা ঠিক হয় না কেন, মানুষ আঁকব, ইত্যাদি।

ছোটো ছেলেদেরও মন ভোলে না। যা আঁকে তাতে সন্তুষ্ট হতে পারে না। আঁকতে জানে না, তাই ওইরকম আঁকে, কিন্তু খুশি হয় কি? ওরা মিলিয়ে দেখে; প্রথমে দেখে দাদার মতো কাকার মতো আঁকা হল কি না। তার পর দেখে যেটি চোখে দেখছে ঠিক সেটির মতো হল কি না।

পূর্ণিমা একটি নতুন ছবি এঁকেছে কলাভবনে বসে। এনে দেখাল অবনীন্দ্রনাথকে। শান্ত রঙ, যেন সকালবেলার আলোয় বাগানের একটি কোণ।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, বেশ হয়েছে।

কাগজের মাঝখানে কী একটা দোষ, একটা জায়গায় একটু উঁচু হয়ে আছে।

তিনি বললেন, এটা যে করকর করে, চোখে লাগে, মনেও লাগে।

পূর্ণিমা বললে, ও নেপালী কাগজের দোষ। আমি কী করব বলুন।

বললেন, তা অমনি রাখলে তো চলবে না। দে একটা পাখি করে ওখানে। সকালবেলার শান্ত সুর, আকাশের আলো যেন হালকা কুয়াশায় ঢাকা; এইখানে এই নিঝুম ভাবটি রাখতে হবে। একটি সাদা পায়রা বসিয়ে দে দেখিনি। যেন নিঝুম পাখিটি এসে বসেছে নীড় ছেড়ে, কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদের তাত একটু গায়ে লাগলেই উড়ে যাবে আকাশের গায়ে। বলে, নিজেই বসিয়ে দিলেন পায়রাটি সেখানে। বসিয়ে দিলেন নয়, যেন ছিলই সেখানে পায়রাটি বসে— তিনি ফুটিয়ে দিলেন মাত্র। বললেন, এই-সব ভেবে তবে ছবি আঁকতে হয়। সব সুরের একটি কনসার্ট; এই হল ছবি।

এমনিই ছিল তাঁর ভাব ধরিয়ে দেবার পদ্ধতি; চোখ ফোটাবার কায়দা।

বললেন, ছবি একটি ছন্দ ধরে থাকে। ছন্দে চলে তার রঙ রেখা রূপ। আঁকবার সময়ে তুলি চলল ছন্দে তালে; তবেই পেলেম পুরো ছবিটি। তুলি খানিক চলে থামল, পেলেম ছবির খসড়া।

সব রিদ্‌ম্‌। যেমন নিজের ঘোড়াটি। বুনো ঘোড়ার চলায় তো বন্য রিদ্‌ম্‌। মানুষ সেই ঘোড়াকে ট্রেন্‌ড্‌ করলে, রাশ লাগালে। সেই রাশের টানে কখনো ঘোড়া জোরে কখনো ধীরে নানা ছন্দে চলে, দৌড়য়। ছবিতেও তাই। ছন্দের মুখে রাশ টেনে রাখবে, বুঝে বুঝে রাশ আলগা করবে। দেখবে, ছন্দ কেমন তালে তালে নেচে চলে।

ছবি হবে সুচ্ছন্দ; মানে স্বচ্ছন্দ। দেখলেই মনে হবে যেন অতি স্বচ্ছন্দে লাইনটি টানা হয়েছে। প্রাণ জুড়োবে দেখে। মনে হবে, 'আঃ।'

কুটুম-কাটামের ছবি এঁকে এনেছি একটা। অবনীন্দ্রনাথ তাতে তুলি দিয়ে রঙ বুলিয়ে সফ্‌ট্‌ করতে করতে বললেন, রঙ জায়গা নিয়ে বসে থাকবে— সে হল মোজেক-পেন্টিং। ছবিতে হবে সব রঙের ইলিমিলি। সব রঙ মিলেমিশে তবে ছবি।

ছবিতে রঙ আলাদা আলাদা করে রেখে দিয়ো না। সব রঙই সব রঙে মিশে যাবে। 'সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' এই হচ্ছে ছবির সিক্রেট।

অবনীন্দ্রনাথও ছবি আঁকলেন একখানা। বললেন, রেখে দাও এখন তুলে, বিকেলে ফিনিশ করা যাবে।

বিকেলে ছবিখানা ফিনিশ করলেন। বললেন, এ যেন দেখাচ্ছে ঠিক সলোমন বাদশা; একটি পাখি বসিয়ে দিলেই হয়। তা পর্দার ফুটো দিয়ে যে

চোখটি দেখা যাচ্ছে ওটাই মনে করো পাখি ; খঞ্জনা পাখি। জানো তো সলোমন বাদশার গল্প—একবার অমৃত এসেছিল তাঁর কাছে। আচ্ছা, চলো বাইরে বারান্দায় গিয়ে বসে তোমাকে বলি সে গল্প।

অবনীন্দ্রনাথ সামনের বারান্দায় এসে বসলেন। সম্মুখে উন্মুক্ত আকাশ, অবনীন্দ্রনাথ পুবমুখী হয়ে বসে বলতে লাগলেন, সলোমন বাদশার বয়েস হয়েছে, মরতে তো তাঁকে হবেই একদিন। সবাই ভেবে অস্থির। তিনি ছিলেন সপ্তলোকের রাজা। জিন পরী দেবতা মানুষ পশু পক্ষী সপ্তলোকে সকলের আহার-নিদ্রা বন্ধ। কী করা যায়। সলোমন মরে গেলে তো চলবে না। দেবতাদের মধ্যেই একজন পরামর্শ দিলেন, সলোমনকে অমৃত খাওয়াতে হবে। অমনি জেব্রিল স্বর্গ হতে অমৃতের ভাঁড় এনে দিলে সলোমনকে। সলোমন সেটি যত্নে তুলে রাখলেন, আর বলে পাঠালেন, এই রইল অমৃতের ভাঁড়, সপ্তলোকে যারা যারা প্রধান তাদের খবর দিয়ে দাও, তারা আসুক, এসে বলুক আমার এই অমৃত খাওয়া উচিত কি না।

খবর পাওয়ামাত্র যেখানে যত মোড়ল ছিল, ছুটে এল। মস্ত সভা ; সকলেই বলছে 'হাঁ, আপনার অমৃত খাওয়াই উচিত।' কেউ 'না' বলে না। সবাই বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

সলোমন চার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললেন, সবাইকে দেখছি কিন্তু শুককে দেখছি নে কেন ?

অমনি বার্তা নিয়ে ছুটল দূত, ধরে আনল শুককে। শুক হল পক্ষীমহলের পাণ্ডা। তাকে বাদ দিয়ে তো কিছু হবার জো নেই।

শুক আসতে সলোমন বাদশা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, আমার অমৃত খাওয়া উচিত কি না। সবাই বলছে খেতে, তোমার কী মত ?

শুক বললে, খাবেন তো নিশ্চয়ই ; তবে কিনা একটা কথা আছে এর মধ্যে। অমৃত খেয়ে আপনি তো বাঁচবেন, চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। কিন্তু আমরা তো অমৃত খাব না— আমাদের মরতে হবেই। এক-এক করে সবাই— আপনার আত্মীয়-পরিজন প্রিয় বন্ধুবান্ধব সবাই যখন মরব; এই এখন আপনার কাছে আমরা যারা আছি, তারা কেউই থাকব না, তখন সেই শোক সামলাতে পারবেন তো ?

সলোমন দেখলেন, তাই তো, সেই শোক সহ্য করা তো সহজ নয়! বললেন, অমৃত ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমি বেঁচে থাকতে চাই নে।

যেমন এসেছিল তেমনি ফিরে গেল অমৃতের ভাঁড়।

আমাদেরও সলোমন চলে গেছেন, পড়ে আছি আমরা।

আগে ভাবতুম রবিকা চলে গেলে এ জায়গায় আর কিছুই থাকবে না। রবিকাকে বলতুমও, 'রবিকা, তুমি তো অনেক করলে, সারাজীবন কাটালে শান্তিনিকেতনে। এবারে যাদের তৈরি করেছ তাদের হাতে সেখানকার ভার দিয়ে চলে এসো। আবার আমরা আগের মতো এই জোড়াসাঁকোয় গান-বাজনা জমাই। একটু সরে এসে দেখোই-না, কী হয়।'

রবিকা চুপ করে ভেবে বলতেন, তা কি হয়?

এক-এক সময়ে দুঃখও করতেন, আর পারি নে। এক-একটা ডিপার্টমেণ্ট হাঁ করে আছে, আর তার পেট ভরাতে আমাকে ছুটতে হয় ভিক্ষের থলি হাতে নিয়ে দোরে-দোরে।

শেষবার উনি বেঁচে থাকতে যেবার এসেছিলাম শান্তিনিকেতনে, ফিরে যাচ্ছি, একই ট্রেনে একই কামরাতে, উনিও চলেছেন কলকাতায়। বসে বসে কথা হচ্ছিল দুজনে, সেবারেও বললুম, আর কেন? এবারে তুমি আলগা হয়ে পড়ো এর থেকে।

দুবার ঘাড় নেড়ে— 'না না' বলে কথাটা উড়িয়ে দিলেন। তখন যে ভাবতুম রবিকা গেলে সবই যাবে, এখন দেখছি তা ঠিক নয়। সবই আছে এখানে। কিছুই যায় নি। তিনি নিজেকে এ জায়গাটিতে যেমন মিলিয়ে দিয়েছিলেন তেমনিই আছেন। সব সময়েই তাঁকে স্পষ্ট অনুভব করি।

আর ফুরিয়ে এল আমার দিনও। সব কিছু থেকে আলগা হয়ে পড়েছি। এখন জীবনটা ঝুলছে একটি সুতোর উপর— ওই এক দিদিমণি। তারই-বা আশা কী? তবু কী মায়া! কোথাও ধরবার কিছু নেই, একটুকরো খড় ভেসে চলেছে, তাই আঁকড়ে ধরে বাঁচবার চেষ্টা। একেই বলে মায়াসমুদ্র।

আমার কি মনে হয় জানো? আমার নিজের জীবনের কথাই বলি। এই তো এতকাল হল, কত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আজ এসে পৌচেছি এখানে। আগাগোড়া ভেবে দেখি জীবনটা আর কিছুই নয়, মাকড়সার জাল।

মাকড়সা জাল বুনছে তার চার দিকে। জীবনও তাই, জাল বুনে চলেছে তার চার দিকে। নানা সুতো বিস্তার করছে, সেই সুতোর কোনোটাতে খাবার টেনে আনছে, কোনোটা দিয়ে রস, কোনোটা দিয়ে ভাবছে সংসারের

কথা। কোথাও ছিঁড়ে গেলে তখনি তা তাড়াতাড়ি জুড়ে নিচ্ছে। নানা দিকে নানা সুতোর জাল বুনে তার মাঝে মন বসে আছে মাকড়সার মতো।

আমি তো আমার জীবনটা এই করেই দেখি। এখন কতকগুলি সুতো আর আমার কাজে লাগে না। একটি-দুটি নিয়েই কারবার। এই ছবিটা আছে। দু চোখ মেলে যা দেখি, সুতোর ধারা দিয়ে জালে রস ধরে আনে মন। একটা-দুটো সুতো এখনো এমনি আছে, ভালো কিছু দেখলেই রস টেনে আনে ; মন তাতেই খুশিতে ভরে থাকে।

ছেলেবেলায় গাইত বেদের মেয়েরা—

আমরা বেদে বাজিকরী
ওস্তাদ মোস্তাদ মোদের হুকুমজারি,
কামাখ্যার মন্তর সাধা, ফুঁয়ে ওড়াই কাদা
মাটিতে ফাঁদ পেতে চাঁদকে ধরি।

এ করে কারা? আর্টিস্টরা। তারা আকাশের চাঁদকে ধরে আনে মাটির ফাঁদে— কাগজের ফাঁদে।

দাসীরা ছেলেবেলায় সূর্যগ্রহণ দেখাত একথালা ভরা জলে ; বলত, দেখো দেখো।

তারা থালাতে চাঁদকে সূর্যকে ধরে আনত। বড়ো বড়ো কবিরা লিখে গেছেন, রামচন্দ্রকে ভোলাচ্ছে দাসী আয়নার ভিতরে চাঁদ ধরে তার হাতে দিয়ে। আয়নাটি এনে রামচন্দ্রের মুখের কাছে ধরত, আয়নায় পড়ত রামের মুখের ছায়া, দাসীরা বলত, ওই তো আকাশের চাঁদ।

এমনি করে ফাঁদ পেতে আকাশের চাঁদকে ধরে আনে শিল্পীরা। চোখ মেলে থাকতে হয়। তাই তো বলি, ওরে চেয়ে দেখ্— দেখ্ কী জিনিস ছড়ানো তোদের কাছে। ওরা ভয় পায়, তা হলে যে ইণ্ডিয়ান আর্ট হবে না। আমি এদের এ-ভুল ভাঙাই কী করে?

আঃ, দেখো দেখো, গল্প করতে করতে চাঁদটি এবারে কেমন পরিষ্কার ফুটে বের হল মেঘের ফাঁকে। আশ্চর্য, এই তো এত বড়ো আকাশ, এত মেঘ, এত খেলা ; তা সব ডুবে গেল ওই একটু চাঁদের আলোর আভার কাছে।

এখন বুঝেছ তো, মনের সুর কাকে বলে? এই একেই, একটু চাঁদের আভাকেই। এই সুর যেই একটু লাগল, আর সব দূরে চলে গেল।

অবনীন্দ্রনাথ একদিন বললেন, যাবার আগে যে প্রকৃতিমাতাকে জেনে যেতে পারলুম এই তো আমার যথেষ্ট। এখন তাই রবিকার গানগুলি শুনি আর ভাবি, কত গভীরভাবে তিনি ভালোবেসেছিলেন এই মাকে। প্রতি লাইনে তা ফুটে ওঠে। এতকাল আমি বিমাতাকে নিয়ে দিন কাটিয়েছি, আসল মাকে এবারেই পেলুম। সেই কথাই তো আমার নন্দলালকে বলি, 'বিমাতার মায়া এবারে ত্যাগ করো। যাঁর বুকে আশ্রয় আমাদের তাঁকে চিনে নাও, দেখবে কত আনন্দ।'

পঁচাত্তর বছরে এসে ঠেকেছি, এতকাল এক কথা বলে এখন অন্য কথা বলছি। কারণ, জেনেছি কিনা ঠিক জিনিসটি এতকাল বাদে। আগে যা বলতুম তা পথ চলার কথা, ঠিক-রাস্তা বেছে নেবার কথা। এখন বলছি সেই রাস্তায় চলে এসে কী পেলুম, কী জানলুম— সেই অভিজ্ঞতার কথা। বলতে হবেই আমায়। না বলে গেলে অন্যায় হবে। এখন না বুঝলেও পরে একটা সময় আসবে যখন সবাই বুঝতে পারবে আমার কথা। তখন জানবে ঠিক যে, এই কথাই আমি বোঝাতে চেয়েছিলুম কতকাল আগে।

তোমরা ভাবো ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে আমি বুঝি খুব দুঃখে দিন কাটাতুম। মোটেও তা নয়। বেশ ছিলুম, যাত্রা লিখলুম। কত যাত্রা যে লিখেছি, মনেও নেই সব। তার পর এল আমার পুতুলগড়া খেলা। তাতেও এমন মেতে থাকতুম, সকাল থেকে সন্ধে অবধি কখন সময় কেটে যেত টেরও পেতুম না। ছবির জন্য কোনো দুঃখই ছিল না মনে। পুতুল নিয়েই বুঁদ হয়ে থাকতুম। ফেলা আমার জুটেছিল, বলি নি সে গল্প তোমায়? আহা কোথায় গেল, এমন মুগ্ধ করেছিল সে মেয়ে আমায়, কেউ তেমন করে নি বড়ো। বেলঘরিয়ার বাড়িতে এসে কিছুদিন বাদে 'মাসি'র গল্প লিখি, তাতে আছে আমার ফেলার কথা।

বেলঘরিয়ার বাড়িতে এসে পেলুম আর-এক অপূর্ব জিনিস; প্রকৃতিমাতার আদর। তিনি তার ডালপালা আমার গায়ে বুলিয়ে দিয়ে কী সান্ত্বনা দিলেন। আর এক আনন্দে ভরিয়ে দিলেন মনপ্রাণ। সমস্ত দুঃখ ভুলে গেলেম, তবেই-না ওই 'মাসি'র গল্প লিখতে পারলুম। দুঃখটা যখন কেটে যায় তখনি তা ব্যক্ত হয়। নয়তো যতক্ষণ দুঃখ থাকে, দুঃখ লোককে মুহ্যমান করে রাখে। যখন তা একটা রূপ নেয়, জানবে দুঃখ কেটে গেছে।

আসল মাতাকে জানতে পারলুম, এই এতকাল পরে। তোমাদের যে বলি, চোখ খুলে দেখো, দেখতে শেখো, কেন বলি? আমি যে দেখেছি প্রকৃতিকে। চিনতে পেরেছি। তাই তো বলি, যেখানে মুক্তি সকলের সেইখানেই চোখ বন্ধ করে চলবে— এ কি হয় কখনো? সব কিছু দুঃখ-কষ্টের মুক্তি এই প্রকৃতিমাতার বুকে।

এই তো আমি, এত বড়ো দুঃখ— অলকের মা চলে গেলেন, কই, কিছু না— একটুও তো ভেঙে পড়ি নি।

ছেলেরা সবাই ভাবলে বাড়ি আবার বদল করবে, কত কী। আমি বললুম, নাঃ, ও-সবের দরকার নেই কিছু। বাড়ি বদলালে আমার কী সান্ত্বনা মিলবে? যে বাড়ি ছেড়ে এলুম, তার কাছে কোনো বাড়ি আর লাগে না। আমার সান্ত্বনার জায়গা আমি খুঁজে পেয়েছি, তোরা কেউ ভাবিস নে আমার জন্যে।

ওই যে ছবিটি আঁকলাম সেদিন, দিনের বেলায় নারকেল পাতায় সোনালি আলো পড়ে দোল খায়, ঝিলের পাশে বসে কুটুম-কাটাম গড়ি, আকাশে গাছে জলে প্রকৃতি কত শোভা মেলে ধরে আমায়; ভোলায় সারাক্ষণ। রাত্তিরে খেয়েদেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিই, জানালা দিয়ে দেখি ঝিলের জল ঝিলমিল করছে, গাছে গাছে জোনাকি জলছে, চাঁদের আলোয় ছেয়ে গেছে সামনেটা। মনে হয় এই তো— আর কী চাই। এই এমনি করে খেলতে খেলতে একদিন খেলা শেষ হয়ে যাবে, প্রকৃতিমাতা হাত বাড়িয়ে আছেন, বুকে তুলে নেবেন। আঃ, কী পরম শান্তি!

আশ্রমের আচার্যদেব হয়ে অবনীন্দ্রনাথ বার-পাঁচেক এসেছিলেন শান্তি-নিকেতনে। এর মধ্যে মাত্র একবারই তাঁকে পেয়েছিলাম আমরা জন্মাষ্টমীতে, তাঁর জন্মদিনে।

অবনীন্দ্রনাথ পদ্মফুল ভালোবাসতেন। তাঁর এক জন্মদিনে শান্তিনিকেতনের আশপাশের গ্রামের পুকুর থেকে পদ্মফুল তুলে ঝুড়ি বোঝাই করে পাঠিয়েছিলাম কলকাতায়। তিনি লিখলেন, ‘তোমার পাঠানো শ্বেতপদ্ম রক্তপদ্মের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের শীতল সৌরভ পেয়ে মন আরাম পেলে।’

সেই থেকে প্রতি বছর জন্মদিনে তাঁকে পদ্মফুল পাঠাই, পাঠিয়ে তৃপ্তি পাই। এবারে তিনি আছেন আমাদের মাঝে। প্রচুর পদ্মফুল তুলেছি, তুলিয়েছি।

ভোরবেলা পদ্মফুল মালতীর মালা ধূপ চন্দন নিয়ে উদয়নে এলাম। পিছনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। অভিজিতের বাবা পদ্মফুলের বোঝা তাঁর সামনে রেখে প্রণাম করলেন। অভিজিৎ মালাচন্দন পরালে। আমি ধূপ জেলে পাশে রাখলাম। প্রণাম করলাম। চামড়ার একটা পোর্টফোলিও করেছিলাম তাঁর ছবি রাখবার জন্য, সেটি ও আসামী-সিল্কের একটি চাদর হাতে দিলাম।

তিনি শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠলেন।

বারান্দায় আগের দিন রাত্রে আলপনা দিয়ে রেখেছিলাম অর্ধচন্দ্রাকারে, তিনি যেখানে এসে বসেন সেই গদিমোড়া কাঠের বেদী ঘিরে। অবনীন্দ্রনাথ সেখানে বসলেন। বললেন, আজ আমার বুড়িকে, জগন্নাথের সেই পিসিকে এনে সাজাও। সে না সাজলে আজকের উৎসব যে জমবে না।

তাঁর শোবার ঘরের কোণে ছিল একটা স্ট্যানডার্ড ল্যাম্প। কালিম্পঙের মোটা বাঁশের চোঙার উপরে বাতি, উটের পাকস্থলীর চামড়ার গোল একটি সাদা ঘটের মতো শেড বসানো বাতিতে। সেই ল্যাম্প-শেডে নকশা আঁকা হয়েছে তেল-রঙ দিয়ে, জাভা দেশের নকশা; এক দিকে একটি মুখোশ দাঁত বের করা, অন্য দিকে লতাপাতা।

একদিন শিশুবিভাগের ছোটো ছেলেদের সাহিত্যসভায় তারা টেনে নিয়ে গিয়েছিল অবুদাদুকে, গলায় মালা পরিয়ে সভাপতি করেছিল তাঁকে। অবনীন্দ্রনাথ ঘরে ফিরে সেই মালাটি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন ল্যাম্প-শেডটার উপরে। সেদিন রাত্রে তিনি বিছানায় ঢুকেছেন, ঘরের বাতি নিবিয়ে দিয়ে চলে আসব, এমন সময়ে নজরে পড়ল কোণায় দাঁড়িয়ে সাদা ফুলের মালা গলায় পরে একমুখ হেসে তাকিয়ে আছে ল্যাম্প-শেডে আঁকা সে মুখখানা আমার দিকে। দেখে বড়ো মজা লাগল। অবনীন্দ্রনাথকে বললাম। তিনি মশারির ভিতরেই বালিশ থেকে মাথা তুলে দেখলেন, বললেন, এ যে জগন্নাথের পিসি গো!

সেই জগন্নাথের পিসিকে এনে বারান্দার মাঝখানে রাখা হল। একটা কলাপাতার আধখানা কেটে চওড়া দিকটা নীচের দিকে ঝুলিয়ে উপরের দিকটা কোমরে জড়িয়ে বেঁধে দিলাম। সুন্দর সবুজ ঘাগরা হয়ে গেল। অবনীন্দ্রনাথই নির্দেশ দিচ্ছেন, আমি করে যাচ্ছি।

ছুটে ছুটে সব জোগাড় করছি। এবারে মাথায় কী দেওয়া যায়? শালুর

কাপড় পাওয়া গেল বোঠানের কাছে খানিকটা। মাথায় সেই লাল ওড়না ঝুলিয়ে দিলাম। পিসিকে সাজানো এক দারুণ খেলা। গলায় গোড়ে-মালা পরালাম, অবনীন্দ্রনাথই তাঁর মালাটি খুলে দিলেন পিসিকে পরাতে। কানের উপরে দুপাশে দুটি পদ্মফুলের ভিতরের হলুদ রঙের ঝুমকো আটকে দিলাম। লাল ওড়নার পাশ থেকে যেন কাঁচা সোনার ঢেঁড়ি-ঝুমকো ঝকমক করে উঠল। যত সাজ বাড়ে, বুড়ি যেন ততই দাঁত বের করে হাসে। তার হাসি দেখে আমরাও হেসে লুটোপুটি।

সাজ সমাপ্ত হল।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, বাঃ বাঃ, এ যে দেখি আমার 'আম্বিবুড়ি'।

অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিন, আজ আশ্রমে উৎসব। উৎসব তাঁকে ঘিরে।

লাইব্রেরির সামনে সকালবেলা জন্মোৎসব হবে। কাল বিকেল থেকে সব সাজানো হয়ে আছে— ফুলে আলপনায় নানা সজ্জায়। ধূপ দীপ জ্বালিয়ে উৎসব আয়োজন প্রায় সম্পন্ন, এমন সময়ে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল।

তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠানের জিনিসপত্র নিয়ে সিংহসদনে সব সাজানো হল। সিংহসদনের একপাশে স্থায়ী স্টেজ, সেখানে অবনীন্দ্রনাথকে বসিয়ে মালাচন্দন অর্ঘ্য দেওয়া হল। গান হল, মন্ত্রপাঠ হল।

সিংহসদন সুরে সৌরভে ভরে উঠল।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, আমার যে জনম-তারা, আমি তার নাম দিয়েছি 'আম্বিবুড়ি'। আজ থেকে সেই কত বছর আগে যখন জন্মেছিলাম এ পৃথিবীতে, পথঘাট চিনি নে, অচেনা মুখ— অন্ধকারে ঢাকা চার দিক ; সেই সময়ে এই আম্বিবুড়ি প্রদীপ ধরে আমায় পাঠিয়ে দিলে, বললে 'যাঃ'। ওই 'যাঃ' বলে ঠেলে দিলে আমায়, এসে পড়লুম এখানে।

আজ আমার জন্মোৎসব, যেদিন প্রথম জন্মেছিলুম সেদিন কী উৎসব হয়েছিল, কী হয় নি মোটেই, কী করেছিলুম, কেমন ছিলুম, কিছুই জানি নে। তবে কেঁদেছিলুম— তা শুনেছি।

সেদিন কিছুদিন আগে দুপুররাতে দিদিমণি এল, এসেই কান্না জুড়ে দিলে পাশের ঘরে। ওদের ডেকে বললুম, অত কাঁদে কেন ? নে. নে, ওকে তোরা বুকে টেনে নে। নতুন জায়গায় এসেছে, অচেনা মুখ দেখে কাঁদছে হয়তো। ওকে আগে শান্ত কর তোরা।

সবাই দেখি এসেই কাঁদতে আরম্ভ করে। আমিও কেঁদেছিলুম। কিন্তু কেন কেঁদেছিলুম, কী করে বলব? তার পর যত বড়ো হতে লাগলুম, মাকে চিনলুম, ভাইবোনদের জানলুম; আস্তে আস্তে নিজের আশপাশের সবার সঙ্গে জানাশোনা হল। প্রকৃতির সৌন্দর্য মুগ্ধ করল, অতি নিকটে টেনে নিল।

এখন বয়েস হয়েছে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁচেছি। কত শোক পেয়েছি; মা চলে গেছেন, বাবা চলে গেছেন, আত্মীয়-পরিজন প্রিয়জন এক-এক করে চলে যাচ্ছে, খেলার সাথীও হারাচ্ছি— তবে, খেলার সাথী আবার নতুন করে পাচ্ছিও; এই তোমাদের পেয়েছি, আনন্দে খেলে দিন কাটাচ্ছি।

তাই তো ভাবি, 'আস্তিবুড়ি' যে পিদিম হাতে আমায় ঠেলে দিলে, বললে, 'যাঃ', কী জায়গায় পাঠালে সে আমায়! কী শোভা! জন্মাবধি শোভা দেখে এর রস পান করেও শেষ করতে পারছি নে। অফুরন্ত রস। আশ্চর্য শোভা। এমন জায়গায় আসতে আমি আবার কেঁদেছিলুম!

আবার একদিন আসবে, সেদিন আমার 'অস্তিবুড়ি'— বসে আছে পিদিম ধরে, যাবার দিন অন্ধকারে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

যে কয়দিন বাকি আছে দু চোখ ভরে দেখে নিই এই বিশ্বের শোভা, আর মনে মনে গাই—

তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায়
তারি পারে,
দেবে কি গো বাসা আমায় দেবে কি
একটি ধারে।

এই-ই আমার প্রার্থনা।

কয়দিন ধরেই চলেছে, অবনীন্দ্রনাথ কলাভবনে যান, আর প্রাণে ব্যথা নিয়ে ফিরে আসেন।

অবনীন্দ্রনাথ কেবলই বলেন, এ নয়, এ নয়, এভাবে চোলো না পা ফেলে।

তর্ক ওঠে এ নিয়ে। দু-একজন শিক্ষক তর্ক করেন তাঁর সঙ্গে। নিরুপায় নন্দদা দাঁড়িয়ে থাকেন চুপচাপ পিছনে। তাঁরা তর্ক করেন রূপ রেখা রঙ নিয়ে; তর্ক করেন আধুনিক ছবি নিয়ে।

একদিন সেখান হতে ফিরে এলেন অবনীন্দ্রনাথ, বললেন, দেখো 'বিস্ময়'

আর্ট নয়। বিস্ময় চোখের জিনিস। ধামধক্ক বিস্ময়, দেখে 'বাঃ বাঃ' করি; ক্ষণিক থাকে— তার পরে মিলিয়ে যায়। বিস্ময় স্থায়ী হতে পারে না। বাহবা পেতে পারে। চোখে ধাঁধা লাগায়, কিন্তু মনে লাগে না। যে জিনিস মনে গিয়ে লাগে না, তার গভীরতা কম, এটা তো মানো? ছবির বেলাও তাই। একরকম ছবি আছে, বিস্ময় জাগায়; তাতে মনের স্পর্শ থাকে না। ইনটেলেকচুয়াল লেখা, আর মনের দরদ দিয়ে লেখা; এ দুয়েতে যা তফাত ছবির বেলাও ঠিক তাই। দুই রকম ছবিই আছে।

অন্যদিন কলাভবন থেকে ফিরে এসে গল্প করেন, কী কী আলোচনা হল বলেন। সেখানে যা বোঝালেন আবার একবার আমাদের বুঝিয়ে বলেন। কিন্তু আজ আর কথা বললেন না। কাচের ঘরেও ঢুকলেন না। বারান্দায় বসে রইলেন।

চুপচাপ যখন বসে থাকেন, তিনি চুরুট খান। আজ পাশের টেবিলে রাখা চুরুট তেমনিই পড়ে থাকল সেখানে।

স্নানের সময়ে উঠলেন, দুটি খেয়েই ঘরে চলে গেলেন। একটি কথাও কইলেন না কারো সঙ্গে।

বিকেলে এসে দেখি পুবের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন একা। দৃষ্টি সোজা, কোন্ সুদূরে।

পাশে শ্বেতপাথরের জলচৌকি, ধীরে ধীরে সেই জলচৌকিতে এসে বসলাম।

অবনীন্দ্রনাথ তেমনিই স্থির বসে রইলেন। আমিও তেমনি।

বারান্দার সামনে লাল কাঁকরের ধারে একটি নবীন তালগাছ। সতেজ, পুষ্ট— দেখেই মনে হয় যেন তারুণ্যে ভরে উঠেছে সবে।

অনেকক্ষণ পরে অবনীন্দ্রনাথ বললেন, কী সুন্দর তালগাছটি, কী সুন্দর গড়ন।

বলেই আবার তেমনি চুপ করে রইলেন। আবার অনেকক্ষণ কাটল।

ধীরে ধীরে বেলা পড়ে এল। বাড়ির পিছন দিকে পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সেই আলো এসে পড়ল তালগাছের গায়ে। পাতার ভাঁজে ভাঁজে, দেহের খাঁজে খাঁজে লাল সোনালি রঙ গাছকে এক অপরূপ সাজে শোভায় সাজিয়ে দিল।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, কত রঙ, কী সুন্দর রূপ, দেখো।

সূর্য অস্ত গেল। আলো নিভে পুবের আকাশে সন্ধের অন্ধকার নামল।

আর কালো আকাশের গায়ে কালো তালগাছ মিলেমিশে দাঁড়িয়ে রইল।

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, কোথায় গেল রূপ, আর কোথায় গেল রঙ। কিন্তু সে আছে। এইখানেই সে সত্যি।

সেদিন শুধু তিনি এই তিনটি কথাই বললেন। তিনটি কথায় আর্টের তিনটি রূপ— তিনটি জগৎ দেখিয়ে দিলেন।

মাটির সম্পর্ক থেকে আর্টকে বিরাটে নিয়ে স্থান দিলেন।

এই কথাই তিনি বারে বারে বলেছেন, বলতে চেয়েছেন; বুঝিয়েছেন, বোঝাতেও চেয়েছেন। সেইজন্যই সেই সত্যকে ধরবার জন্যই তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, 'মুক্তি দাও, রেখার বাঁধন হতে, রূপের মোহ হতে তাকে মুক্তি দাও। বদ্ধ জায়গা থেকে তাকে খোলা আকাশে ছেড়ে দাও।'

মা যেমন দেখতে পেলেন মাঠের ধারে বিপদ— ছোটো ছেলেরা দৌড়ে যাচ্ছে, মা হাত তুলে চেঁচাচ্ছেন, 'ওরে, তোরা ও দিকে যাস নে, যাস নে।'

শুনি বেদে, ঋষিরা দেখেছিলেন, জেনেছিলেন; অমৃতের সন্ধান পেয়েছিলেন। সবাইকে ডেকে বলে গেলেন, 'শোনো শোনো, তোমরা সবাই অমৃতের পুত্র। এইভাবে চলো, এইভাবে এগোও, তবে গিয়ে মিলতে পারবে 'তাঁর' সঙ্গে।'

অবনীন্দ্রনাথও দেখলেন, জানলেন, পেলেন; সবাইকে ডেকে বলে গেলেন সেই উপলব্ধির কথা, ওরে ও নয়, ও নয়; তোরা এই পথে যা, এই পথ ধরে চল, তবেই পাবি ঠিক জিনিসটি।

একটি খাতা ছিল আমার, চীনে-শিল্পী-বন্ধু দিয়েছিলেন স্কেচ করবার জন্য। তাঁদের দেশের তৈরি কাগজের খাতা; বিশেষ করে তুলি কালি দিয়ে স্কেচ করবার জন্য উপযুক্ত কাগজ। চীনের এই কাগজের বৈশিষ্ট্যই আলাদা। নীল সিল্কের মলাট। খাতাখানা স্কেচ করে নষ্ট করব, তুলে রেখে দিলাম।

একবার অবনীন্দ্রনাথ আশ্রমে এলে বের করে তাঁকে দিলাম, তিনি স্কেচ করবেন। তিনি বললেন, বাঃ, বড়ো সুন্দর খাতা তো! নীল মলাট। এতে স্কেচ করব কী, এ হল— বলে কলম নিয়ে বইয়ের প্রথম পাতায় লিখলেন, 'নীল খাতা, মনের কথা।' বললেন, রেখে দাও, এর খবর কেউ জানবে না। মাঝে মাঝে এনে দিয়ো সামনে, এতে মনের কথা ধরে রেখে দেব।

বারকয়েক মাত্র লেখা হয়েছিল নীল খাতায়।

প্রথমবার, রথীদার বাগানে ফুটেছে নাম-না-জানা এক ভিনদেশী ফুল, রূপে রঙে রঙিন রূপসী। প্রথম ফোটা ফুলটি রথীদা এনে দিলেন অবনীন্দ্রনাথকে। অবনীন্দ্রনাথ নীল খাতায় ফুলটি আঁকলেন, লিখলেন কবিতা—

'ছবির খাতা কবিতা লেখা
এত কালেও হল না শেখা।
মনে লাগে তবু ফাগুনের রেশ
রঙের আঁচড়ে সব হয় শেষ।'

দ্বিতীয়বার লিখলেন নববর্ষের দিনে। লিখলেন—

'যে বছর এসে ঘুরে গেল তাকে বললেম গতবর্ষ। যে বছর আজ এল অজানার রূপ ধরে তাকে বললেম নববর্ষ।

'যে যায় সে আসে না, নতুন আসে। এই নিয়ম এই ছন্দ নিয়ে জগৎ চলেছে। এর ব্যতিক্রম হবে, পুরোনো বছর সমস্ত পুরোনো দিন নিয়ে ফিরবে এমন তো হবে না আর। পুরোনো দিনের মানুষ যায় চলে, কালের পর্দা পড়ে যায়। মাঝখানে এখন তখনের— আজকের দিন কালকের দিনের মিলন কোথায়, না স্মৃতির কোঠায়। সেখানে সেই কালকের মানুষ ধরা থাকে, দিনগুলি ধরা থাকে। সেই মনের ঘর সাজানোর উৎসব হচ্ছে আজ। মনের মানুষদের মনে করে দিতে নমস্কার— চোখের জল ফেলতে ফেলতে।

এসে গেল তবু গেল না

উৎসবের বাঁশি এই কথাই বলে চলেছে।

দুঃখের বাঁশি সুখের বাঁশি শুনছি এখন বসে।'

তৃতীয়বার লিখলেন— 'সুখের দিন'।

'সুখের দিন চলে যায় বসন্তের দিন কেটে যায়। আনন্দে দোলা রঙের খেলা দেখি আর ঝিমোই নিজের কোণটিতে বসে বসে। যে-সব দিন কেটে গেছে, যে-সব ভোগ ভুগে ভুগে ভারবাহী সংসারের জীব জীবনান্ত হবার জোগাড় হয়েছে সে আর কী করবে, নিঃসঙ্গ নিরানন্দ বসে বসে অতীত স্বপ্নের জাবর কাটে, তাই ধরা পড়ে আছে লেখায় আর ছবিতে। দেখে লোকে বলে, বাহবা! রঙমহলের মধ্যে রঙ্গস্বামীর এ কেমন লীলা কে বোঝায় আমাকে। সবাই বলে, আঁকো, নাম সই করো !!!

'কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।'

চতুর্থবারে লিখলেন, 'পতঙ্গ'।

'ফুলবনে ছাড়া পেল মানস-সরোবরে স্বচ্ছ কাচের মতো জল তার। কী ঠাণ্ডা ছায়া তার। সব পেল পতঙ্গ তবু আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার দুরাশা তার মনে ধাক্কা দিল। হঠাৎ এক রাতে প্রদীপ জলছে মন্দিরে, দীপশিখা হাতছানি দিলে, পড়ল ঝাঁপিয়ে পতঙ্গ। ক্ষণিকের মতো দীপশিখা একটু মলিন হল, তার পর···।'

আর পঞ্চমবারে লিখলেন 'জন্মাষ্টমী'। বেলঘরিয়ায় ছিলেন এই জন্মাষ্টমীতে। এখন আর শান্তিনিকেতনে আসেন না, আসতে পারেন না; দেহ সায় দেয় না। জন্মাষ্টমী তাঁর জন্মদিন, আমরা গেলাম; এক ফাঁকে 'নীল খাতা' ধরলাম সামনে। তিনি লিখলেন—

'এই জন্মাষ্টমীতে বসে আছি তো বসেই আছি। ভাবতে আছি তো ভাবতেই আছি। কার জন্যে বসে বসে কার কথা ভেবে ভেবে আছি এই গুপ্তনিবাসে সে কথা প্রকাশ নিষেধ, লেখাও নিষেধ।

'তবে— কী করি?'

আর লেখা হয় নি। আর সময় পাওয়া যায় নি। ধীরে ধীরে নিজেকে তিনি গুটিয়ে নিলেন। ছবি বন্ধ, কুটুম-কাটাম বন্ধ, লেখাও বন্ধ। গুপ্তনিবাসের বারান্দায় আপন কৌচে চুপ করে বসে থাকেন। নিমীলিত চোখ, স্থির মূর্তি, নির্বিকল্প রূপ। যেন এক অতল সুধাসমুদ্রে ডুব দিয়ে আছেন!

এখন আর এখানে কোনো কথা না। কোনো গল্প না। কোনো হাসি না। কোনো গান না।

যাই আর নীরবে তাঁর পায়ের কাছে বসে থাকি। তার পর কখন্ একসময়ে নিঃশব্দে চলে আসি।

—

অশুদ্ধি-সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	আছে	হবে
২	৮	যেন,	দেহ।
৮	নীচে থেকে ৩	সময়	স্নেহ
৩৬	৭	মারে	মারেন
৫৪	৩	করছে	ঝরছে
৫৭	নীচে থেকে ২	আর	তার
৬৪	শেষ ছত্র	কলাভবনে-বাঁধা	কলাভবনের বাঁধা
৭১	১২	পেয়েছিলেকেন	পেয়েছিলেন
৭৯	১৭	ব্রাস্ট	ব্রাণ্ট
৮৩	১৮	পিরিয়ডে	পিরিয়ড
৯৬	২০	'টড্‌স্‌'-এব	'টড্‌'-এর
১০৯	৯	মনে	মন
১১৪	১৭	'ডেপথ'	'ডেপ্‌থ্‌'
১১৫	১২	এঁকেছিল	এঁকেছিলে
১৫৫	১৪	আলো	আরো
১৫৯	২৫	রইলেন দিকে	রইলেন তার দিকে
১৬০	১৫	মানুষ নয়।	মানুষ।
২০৯	৮	এখনি	এখন ওই

[illegible]